BL College Journal Vol-2, Issue-1, 2020 Subscription : BDT 300/- [$ 5 Outside Bangladesh]

Published by
Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna, Bangladesh

BL College Journal Volume-2, Issue-1, 2020 ISSN 2664-228X

Volume-2, Issue-1, 2020 ISSN 2664-228X

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume -2, Issue-1, 2020

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal

Half Yearly Publication of Government Brajalal College

Chief Patron

Professor K M Alamgir Hossain Principal, Government Brajalal College

Editor

Professor Sharif Atiquzzaman Vice Principal, Government Brajalal College

Review Committee

Professor Dr. Khandakar Hamidul Islam Head, Department of Islamic Histroy & Culture

Professor Dr. Khandakar Ahsanul Kabir Head, Department of Physics

Dr. Md. Mizanur Rahman Head, Associate Professor, Department of Social Work

Dr. Hosne Ara Associate Professor, Department of Zoology

Shankar Kumar Mallick Associate Professor, Department of Bangla

Roxana Khanam Associate Professor, Department of English

Dr. Emanul Haque Associate Professor, Department of Bangla
Vidyasagar College, Kolkata, India

Amal Kumar Gain Assistant Professor, Department of History

Rami Chakraborty Assistant Professor, Department of Bangla
Assam University, India

Dr. Md. Sarwar Hossain Lecturer, Department of Mathematics

Mailing Address :

Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh

Phone : 0088-041-762944, 0088-041-2852708 email : infoblcollege@gmail.com

Website : www.blcollege.edu.bd

Printed by : Rabi Printing Press

27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© **Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**

ISSN : 2664-228X

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020

Contents

বাংলা অংশ

- ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কস
  হারুন রশীদ ৭-১৪
- যাযাবর বাজিকরদের অস্তিত্বের সংগ্রামে ধর্মীয় পরিচয় সংকট : প্রসঙ্গ *রহুচণ্ডালের হাড়*
  শংকর কুমার মল্লিক ১৫-৩৮
- স্মৃতিকথায় প্রতিফলিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ
  আরমান হোসাইন আজম ৩৯-৫৮
- সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে প্রত্নস্থল ভরতভায়না
  খ. ম. রেজাউল করিম ৫৯-৬৭
- বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বিকাশ : খুলনা মহানগরীর অভিজ্ঞতা
  মহসিন মিঞা ৬৮-৮৫
- পূর্ববাংলার কবিতায় পাকিস্তান-চেতনা
  বিভূতিভূষণ মণ্ডল ৮৬-১১৬
- জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের গল্পে প্রান্তিক মানুষ
  সুনন্দা ঘোষ ১১৭-১২২
- প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের মতুয়াসংগীতের পূর্বাপর ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
  সুরঞ্জন রায় ১২৩-১৫৮

English Section

- Rabindranath's Painting : A Quest for Modernism in Art
  Sharif Atiquzzaman 161-166
- Substantiating the 'Female' Sexuality as well as Prostitution beyond the Mere Sexual 'Thing'
  Rupsa Mukherjee Banerjee 167-181
- Demystification of Islamic Fundamentalism and Patriarchy in Tahmima Anam's Novels from a South Asian Feminist Perspective
  Dr. Sabreen Ahmed 182-193
- Challenges of Mental Wellbeing of Digital Native Adolescent : Promotion of Mental Health
  Dr. Mrinal Mukherjee 194-213
- Study of Socioeconomic Status of Fishermen by the Riverside Areas of River Nabaganga and Kaliganga at Jhenidah of Bangladesh
  DR. Bidhan Chandra Biswas 214-219
- Usage of ICT in Medical Libraries of Bangladesh with Special Reference to icddr,b Library: An Investigation
  Md. Harun-Or-Rashid Khandaker, Md. Shafiur Rahman, Muhammad Hossam Haider Chowdhury, Farzana Sultana & Dr. Md. Nazim Uddin 220-246

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half Yearly Publication of Government Brajalal College
July 2020

Published by

Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh

Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

বাংলা অংশ

Contents

- ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কস
  হারুন রশীদ ৭-১৪
- যাযাবর বাজিকরদের অস্তিত্বের সংগ্রামে ধর্মীয় পরিচয় সংকট : প্রসঙ্গ *রহুচণ্ডালের হাড়*
  শংকর কুমার মল্লিক ১৫-৩৮
- স্মৃতিকথায় প্রতিফলিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ
  আরমান হোসাইন আজম ৩৯-৫৮
- সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে প্রত্নস্থল ভরতভায়না
  খ. ম. রেজাউল করিম ৫৯-৬৭
- বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বিকাশ : খুলনা মহানগরীর অভিজ্ঞতা
  মহসিন মিঞা ৬৮-৮৫
- পূর্ববাংলার কবিতায় পাকিস্তান-চেতনা
  বিভূতিভূষণ মণ্ডল ৮৬-১১৬
- জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের গল্পে প্রান্তিক মানুষ
  সুনন্দা ঘোষ ১১৭-১২২
- প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের মতুয়াসংগীতের পূর্বাপর ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
  সুরঞ্জন রায় ১২৩-১৫৮

Volume -2, Issue-1, 2020

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 7-14

ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কস

হারুন রশীদ

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল : haroonrashid57du@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ধর্ম সম্পর্কে কার্ল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের প্রচলিত ভাবনার আদলটি ভেঙে দিয়েছে, আধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। ধর্ম হল সে সব বহিঃশক্তি যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মনে সেগুলোর উদ্ভট প্রতিচ্ছবি তৈরি করে যে ছবিতে পার্থিব শক্তিগুলো অতিপ্রাকৃত শক্তির রূপ ধারণ করে। এটা প্রমাণ করে মাকর্সই প্রথম ধর্মের মর্ম বস্তুটিকে পুরোপুরি উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। দার্শনিকদের একটা বড় অংশই ধর্ম সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার সমর্থক। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ধর্ম চিরন্তন সত্য, যা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সত্যের এই ভাববাদী প্রভাববলয় থেকে মানুষের চিন্তা মুক্ত করে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে চিরন্তন সত্যের দাবিকে নাকচ করে দেন। সমাজ চেতনার একটা বড় রূপ হিসেবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উপরিকাঠামোর একটা উপাদান হিসেবে ধর্ম কিভাবে সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজের উপর নির্ভর করে তা উদ্‌ঘাটন করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যে ধর্ম হলো জনগণকে অন্ধ ও দমন করার একটা উপায়, শোষকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার মতাদর্শগত হাতিয়ার। শোষক শ্রেণি স্বার্থ রক্ষার জন্য ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে ইহকালে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলে পরকালে পুরস্কার হিসেবে স্বর্গীয় সুখ লাভ করা যায়। মাকর্সই প্রথম দেখিয়েছেন যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনী দরিদ্রের মাঝে বৈষম্যের দেয়াল নির্মাণে ধর্ম শুধু সহায়ক শক্তিই নয়, শোষণ জিইয়ে রাখার জন্য শক্ত মতাদর্শগত হাতিয়ারও বটে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমজীবীদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ বা ক্ষমতাহীনতার অনুভূতি তৈরি করে এবং ধর্ম সেই অনুভূতিকে তাদের অদৃষ্ট বলে মানতে শেখায়। এই গবেষণায় মার্কসের এই তাত্ত্বিক অবস্থানের দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

ধর্ম, পুঁজিবাদ, বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, ভাববাদ, রাষ্ট্র, সমাজ, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, দর্শনচিন্তা

বিশ্লেষণ

আজ থেকে দুইশ দুই বছর আগে (১৮১৮ সালে) মার্কস পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং একশ সাঁইত্রিশ বছর আগে (১৮৮৩ সালে) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। কিন্তু মানবজাতির জন্য রেখে গেছেন তাঁর পঁয়ষট্টি বছরের ঘটনাবহুল জীবন ও কর্মের দিকদর্শন, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তন পদ্ধতি। এ সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু মার্কসের চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক। শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা আবশ্যিক। মানুষ ও সমাজ বিশ্লেষণে, সামাজিক ঘটনাপ্রবাহসহ সামাজিক চেতনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মার্কসের চিন্তনপদ্ধতি, তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ধ্রুপদী বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষ করে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিজ্ঞানসম্মত তথা বস্তুবাদী চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম যতদিন টিকে থাকবে এ বিষয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গিও ততদিন প্রাসঙ্গিক থাকবে। মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিপাশে বক্তৃতায় এঙ্গেলস তাঁকে 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক'[১] হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কস যেসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন তাঁর মধ্যে দুটো আবিষ্কার তাঁকে অক্ষয় ও অমর করে রেখেছে। একটি হলো ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম-ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বের ইতিহাসের সমগ্র ধারণায় (চিন্তার জগতে) বিপ্লব এনেছেন। অন্যটি হলো পুঁজিবাদের গতির নিয়ম তথা উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্ব। এঙ্গেলস মন্তব্য করেন, 'একজনের জীবদ্দশার পক্ষে এরকম দুটো আবিষ্কারই যথেষ্ট'।[২] ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের চিন্তা তাঁর দর্শনচিন্তার অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাই হলো তাঁর দর্শনচিন্তা। কাজেই ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বুঝতে হবে।

মার্কসের প্রথম দিকের রচনাগুলো (১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত) দর্শনচিন্তায় সমৃদ্ধ। তাঁর দর্শনচিন্তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো তা একসঙ্গে এক জায়গায় নেই, তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। তাঁর ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কাজেই তাঁর ধর্মচিন্তা বুঝতে হলে তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। মার্কসের যেসব রচনায় ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, "Difference between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature (পিএইচডি থিসিস, ১৮৪১), Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843), On the Jewis Question (1843) The Holy Family (1845), The German Ideology (1846), The Communist Menifesto (1848), Contribution to the Critique of Political Economy (1848)। এসব রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলো থেকে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনাগুলো একত্রিত করে বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মার্কসের পারিবারিক অবস্থানেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তাঁর পরিবারটি ছিল সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবান।[৩] ফরাসি বিপ্লবের দর্শনচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাঁর বাবা হেনরিখ মার্কস। মার্কসের বাবা ছিলেন উদার ও যুক্তিবাদী। যার ফলে ইহুদি সমাজের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা মেনে নিতে পারেননি এবং মার্কসের জন্মের অল্পকাল আগে তিনি ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে মায়ের সাথে ধর্মীয়-আচার অনুষ্ঠানে গেলেও ধর্ম দ্বারা তিনি কখনো প্রভাবিত হননি। তাঁর স্কুল জীবনের রচনাগুলোতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ করা গেলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে আজীবন তিনি ছিলেন পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী।[৪]

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মার্কস র‍্যাডিকাল হেগেলপন্থীদের সাথে যুক্ত হন। র‍্যাডিকাল হেগেলপন্থীদের দর্শন বুঝতে তিনি গ্রিক বস্তুবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গ্রিক বস্তুবাদের দুই দিকপাল ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শন আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন। এর ফলাফল হিসেবে রচিত হলো মার্কসের থিসিস "Difference between the Democritean and Epicurean philosophy of Nature"। এই থিসিসে চেতনা ও বস্তুজগতের সম্পর্ক বিষয়ে মার্কস যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন সেটিই মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রধান কথা: 'মানুষ অন্যের বশ নয়, নিজের ইচ্ছায়ই সে চালিত। ঈশ্বর মানুষের ভাগ্য গড়ে না, মানুষ নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা।' জগতের সবকিছু পরমাণু থেকে সৃষ্টি ডেমোক্রিটাসের এই মত এপিকিউরাস মেনে নেন। কিন্তু পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছা নেই, প্রাকৃতিকভাবেই তা নিয়ন্ত্রিত একথা তিনি মানেননি। পরমাণু থেকে মানুষের সৃষ্টি, সুতরাং মানুষেরও স্বাধীন ইচ্ছা নেই ডেমোক্রিটাসের এই তত্ত্বকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এপিকিউরাস মনে করেন, মানুষ প্রকৃতির কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা নয়, সে স্বাধীন। মার্কস এপিকিউরাসের যুক্তি অনুসরণ করে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ঐশ্বরিক শক্তি এবং এর দ্বারা মানুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার ধারণাকে বাতিল করে দেন। এপিকিউরাসের দর্শন ধর্মের বন্ধন ও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তির পথ দেখায়, প্রকৃতির বাইরে ঈশ্বরের ভীতি থেকে মানুষকে উদ্ধার করে স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এ দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে মার্কস ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর বা ধর্ম নয়, দর্শনই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে, কারণ দর্শনেই আছে জগৎ সম্পর্কে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি।[৫] দর্শনের কাজ হলো মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করা, স্বাধীনতা সম্পর্কে তাকে সচেতন করা। প্রাকৃতিক দর্শন সম্পর্কিত এই থিসিসের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মার্কসের বস্তুবাদী দর্শন।

তরুণ হেগেলীয় পরিমণ্ডলেই রচিত হয় মার্কসের এই থিসিস, তাঁর বস্তুবাদের প্রাথমিক ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু মোজেস হেস মন্তব্য করেন, 'মধ্যযুগীয় ধর্ম আর রাজনীতির ওপর শেষ আঘাত হানছেন তিনি।'[৬] তবে মার্কসের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এখানে যে তরুণ হেগেলীয়দের মতো নিছক ধর্মের সমালোচনা করে তিনি তুষ্ট হননি। তিনি আরো এগিয়ে গেলেন; আবিষ্কার করতে চাইলেন সমাজ রূপান্তরের সূত্র, বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ধর্মের আধ্যাত্মিক নেশা থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাকে চিন্তা করার, কাজ

করার নেশায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন মার্কস। মানুষ যতদিন নিজেকে ও জগৎকে জানতে না পারবে ততদিন ধর্ম তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে বলে তিনি বোঝাতে চাইলেন। মার্কসের থিসিসটি হেগেলের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হলেও এতে ধর্ম ও ভাববাদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্ট। সবকিছুকে চেতনায় পর্যবসিত করার ভাববাদী প্রবণতাকে তিনি মেনে নেননি।

Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right-এ মার্কস আবির্ভূত হন একজন বস্তুবাদী হিসেবে। এক্ষেত্রে তিনি ফয়েরবাখের Essence of Christianity-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। ফয়েররাখ যুক্তি দেন যে, হেগেলের দর্শন সর্বতোভাবে বাতিল করা উচিত; দর্শনের যাত্রাবিন্দু হতে হবে মানুষ ও তার বস্তুগত পরিবেশ, ঈশ্বর বা তথাকথিত 'পরমভাব' নয়। মার্কস এর দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং এই উপলব্ধিতে পৌঁছান যে একমাত্র সমাজ বিপ্লবের দর্শনই (বস্তুবাদ) জার্মানিতে আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। Critique of Hegel's Philosophy-তে মার্কস ধর্ম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা আজও ধ্রুপদীর মর্যাদায় ভূষিত। তাঁর মতে :

> মানুষ ধর্ম তৈরি করে, ধর্ম মানুষকে তৈরি করে না। যে মানুষ এখনও নিজেকে খুঁজে পায়নি কিংবা নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে, ধর্ম হল তার আত্মচেতনা ও আত্মসম্মান। কিন্তু মানুষ তো জগতের বাইরে তাঁবু খাঁটিয়ে থাকা কোন বিমূর্ত সত্তা নয়। মানুষ হল মানুষের জগৎ, রাষ্ট্র, সমাজ। এই রাষ্ট্র, এই সমাজ পয়দা করে ধর্ম, একটা ওলটান জগৎ-চেতনা, কেননা সেগুলো হল একটা ওলটান জগৎ। ধর্ম হল সেই জগতের সাধারণ তত্ত্ব, এর সর্বব্যাপী সংক্ষিপ্তসার, জনবোধ্যরূপে এর যৌক্তিকতা...। এটা হল মানব সারমর্মের উদ্ভট বাস্তবায়ন, কেননা মানব সারমর্মের কোন যথাবিহিত বাস্তবতা নেই। তাই ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল ধর্ম যে জগতের আধ্যাত্মিক সৌরভ সেটার বিরুদ্ধে পরোক্ষ লড়াই।
>
> ধর্মীয় ক্লেশ হল একই বাস্তব ক্লেশের অভিব্যক্তি এবং বাস্তব ক্লেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হল আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হল জনগণের জন্য আফিম।[৭]

উপরিউক্ত মন্তব্য ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের সমগ্র চিন্তার সারকথা। দার্শনিক দিক থেকে বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ এই অর্থে যে এর মধ্য দিয়ে তাঁর দার্শনিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বস্তুবাদী চিন্তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে ধর্ম সৃষ্টি করেছে, বস্তুজগতের বাইরে এক কল্পিত জগৎ সৃষ্টি করেছে, প্রকৃতির বাইরে এক অতিপ্রাকৃতিক জগৎ সৃষ্টি করেছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে এক অতীন্দ্রিয় জগতের কল্পনা করেছে। ধর্ম হলো সেই কল্পিত জগৎ যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। একেই মার্কস ওলটান জগৎ বলেছেন। মানুষের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে সে বস্তুজগতের বিপরীতে এই কল্পনার জগতে আশ্রয় নিয়েছে। স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ধর্মের আশ্রয় নিলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এভাবে মানুষ বস্তুজগৎ থেকে তার দৃষ্টি ও চেতনা অন্য জগতের

দিকে পরিচালিত করে। বস্তুজগৎ সম্পর্কে সে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। ধর্মবোধ মানুষের মনকে এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে যে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান থেকে সে দূরে সরে যায়, অন্য জগতে চলে যায়। বাস্তব জীবনের বস্তুগত সমাধানের জন্যই মার্কস এই অন্য জগৎ বা ওলটান জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার কথা বলেছেন, মানুষের মনোজগৎকে ভাববাদী চিন্তা থেকে মুক্ত করে বস্তুবাদী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। 'ধর্ম হলো জনগণের জন্য আফিম'– ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের এ মন্তব্যটি বহু আলোচিত ও সমালোচিত। আফিম সেবনে মানুষ যেমন সচেতনতা বা প্রকৃত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, ধর্মের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হলে সে তেমন প্রকৃত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ আফিম-এর মতোই ধর্ম মানুষের চেতনাশক্তি হ্রাস করে ও যুক্তিবোধের বিলোপসাধন করে।

On the Jewis Question বিষয়ক রচনায় মার্কস প্রমাণ করতে চাইলেন যে, ইহুদিদের মুক্তির সমস্যার সমাধান ধর্মে নয়, কর্মে। ব্রুনো বাউয়েরের সমালোচনা করে মার্কস দেখালেন ইহুদিদের মুক্তি ধর্মের পথে নয়, মুক্তি আসবে বিপ্লবে। বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজের জন্ম হবে। এক্ষেত্রে তিনি বন্ধু মোজেস হেসের 'কর্মের দর্শন' (Philosophy of Action) দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং বোঝার চেষ্টা করেন ধর্ম কীভাবে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, চেতনা ও ঐক্যকে ধ্বংস করে। মনোজগতের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের যে ভাবনা হেস উপস্থাপন করেন, সমকালীন সমাজের ব্যাধির মূলে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হেসের এই উপলব্ধি মার্কসকে নাড়া দেয়। ধর্ম ও অর্থ উভয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত না হলে মানুষের মুক্তি নেই– হেসের এই চিন্তা দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হলেন।[৮]

দার্শনিকদের একটা বড় অংশই ধর্ম সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার সমর্থক। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ধর্ম চিরন্তন সত্য বা পরম সত্য। এ সত্য স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। ধর্ম সম্পর্কিত এ ধারণা ভাববাদী। দর্শনের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে (প্লেটো থেকে শুরু করে হেগেল পর্যন্ত) এ ধারণাই প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিলো। স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন সত্যের এই ভাববাদী প্রভাববলয় থেকে দর্শনকে মুক্ত করতে সক্ষম হলেন মার্কস। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার মাধ্যমে তিনি চিরন্তন সত্যের দাবিকে নাকচ করে দেন। এ ধারণা অনুযায়ী জগতে চূড়ান্ত বা পরম বলে কিছুই নেই। *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার* থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> কমিউনিজম চিরন্তন সত্যকে উড়িয়ে দেয়, ধর্ম ও নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করে তা সব ধর্ম আর সব নৈতিকতারই উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।[৯]

ভাববাদীরা বাস্তবতা বিছিন্ন এক চিরন্তন সত্য বা পরম সত্যের অনুসন্ধান করে থাকেন। সত্যের এ ধারণা অনুযায়ী তারা পরম আদর্শনির্ভর এমন এক বিশুদ্ধ সমাজের কথা ভাবেন যা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। পরম সত্যের ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই বলে তা কাল্পনিক। এ ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করে হেগেলের দর্শনে। হেগেল এ সত্যকে আখ্যায়িত করেন, 'পরম ভাবসত্তা' বা 'পরম চেতনা'

হিসেবে। 'পরম ভাবসত্তা'র ধারণার মধ্য দিয়ে প্রচলিত দর্শনের পরম সত্যের ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করে। হেগেলের পরবর্তীকালে তাঁর ভাববাদী দর্শনকে নাকচ করে দিয়ে এর বিপরীতে বস্তুবাদী দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেন ফয়েরবাখ। ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মর্মকথা হলো : মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি এবং বেড়ে ওঠে প্রকৃতির এই ভিত্তির ওপরেই; প্রকৃতি ও মানুষের বাইরে কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত্ব নেই। মার্কস ফয়েরবাখের এ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরম সত্যনির্ভর ইতিহাসের ভাববাদী ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা।

German Ideology গ্রন্থে মার্কস প্রথম তাঁর দর্শনকে সূত্রবদ্ধ করেন ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা হিসেবে। ইতিহাসকে তিনি বস্তুবাদী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ভিত্তি হলো বৈষয়িক উৎপাদন তথা অর্থনীতি। বৈষয়িক উৎপাদন দিয়েই মানব ইতিহাসের শুরু। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য এসব বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার আগে মানুষের প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি বৈষয়িক প্রয়োজন মেটানো। বৈষয়িক প্রয়োজন থেকেই মানুষ কাজ করে, সম্পদ উৎপাদন করে। কাজেই বৈষয়িক উৎপাদনই হলো মানব ইতিহাসের ভিত্তি এবং এ থেকেই উদ্ভূত হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়, নৈতিক ও আইনী ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ ইত্যাদি উপরিকাঠামোগত দিক। মার্কস এই সহজ-সরল সত্যটি আবিষ্কার করে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার গোড়াপত্তন করেন। বিষয়টি তিনি এভাবে উপস্থাপন করেন :

> ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, চেতনা হলো বাস্তব জীবনের ভাবপ্রকাশ পদ্ধতি – এগুলোর উৎপত্তি প্রথমে সরাসরি বিজড়িত মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ এবং বৈষয়িক সংসর্গের সঙ্গে। কল্পন, চিন্তন, মানুষে মানুষে মানসিক আদান-প্রদান এই পর্বে তাদের বৈষয়িক আচরণ থেকে সরাসরি নিঃসরণ বলে প্রতীয়মাণ হয়। কোনো জাতির রাজনীতির ভাষা, আইন-কানুন, নৈতিকতা, ধর্ম, অধিবিদ্যা ইত্যাদি হিসেবে অভিব্যক্ত মানসিক উৎপাদন সম্পর্কেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।[১০]

মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাকে সূত্রবদ্ধ করেন এভাবে– 'সামাজিক সত্তা সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ করে'। সামাজিক সত্তা হলো অর্থনৈতিক বাস্তবতা (বৈষয়িক উৎপাদন) এবং সামাজিক চেতনা হলো চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ ইত্যাদি। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী, প্রতিটি সমাজের একটা ভিত্তি এবং তার অনুরূপ একটা উপরিকাঠামো থাকে। অর্থনীতি হলো ভিত্তি এবং ধর্মসহ অন্যান্য সব মতাদর্শ হলো উপরিকাঠামো। কাজেই কোনো সমাজের ধর্ম সেই সমাজের বস্তুগত ভিত্তি (অর্থনৈতিক বাস্তবতা) থেকে উদ্ভূত।

মার্কস তাঁর বিভিন্ন রচনায় দেখানোর চেষ্টা করেন যে, ধর্ম হলো সমাজ চেতনার একটা রূপ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উপরিকাঠামোর একটা উপাদান। অর্থাৎ ধর্ম নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্ক বিকাশের ওপর, সমাজের শ্রেণিগত গড়নের উপর। ধর্মকে দেখতে হবে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। কারণ শ্রেণিবিভক্ত

সমাজে ধর্ম শ্রেণিনিরপেক্ষ হতে পারে না। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধর্ম হলো শ্রেণি শোষণের হাতিয়ার, জনগণের ওপর শাসক শ্রেণির সামাজিক উৎপীড়নের মতাদর্শগত হাতিয়ার। সব যুগে শাসক শ্রেণির ধারণাই আধিপত্যকারী ধারণা। জনগণের ওপর শাসক শ্রেণির বস্তুগত তথা অর্থনৈতিক আধিপত্যই যথেষ্ট নয়, দমন-পীড়ন ও শাসন-শোষণ চিরস্থায়ী করার জন্য শাসক শ্রেণির প্রয়োজন জনগণের আত্মগত তথা মনোজাগতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য। ধর্ম শাসক শ্রেণির এমনি এক মনোজাগতিক আধিপত্য বিস্তারের মতাদর্শগত হাতিয়ার।

ধর্ম পারলৌকিক সত্তায় বিশ্বাস। এ বিশ্বাস ব্যক্তিগত এবং এর ভিত্তি হলো পারলৌকিক প্রজ্ঞা। অন্যদিকে রাষ্ট্র একটি ইহজাগতিক প্রতিষ্ঠান এবং এর ভিত্তি হলো ইহলৌকিক প্রজ্ঞা। পারলৌকিক সত্তায় বিশ্বাসের পেছনে কোনো স্বাধীন বিচারশক্তি নেই। অন্যদিকে রাষ্ট্রের পেছনে মানুষের স্বাধীন বিচারশক্তি কাজ করে। কাজেই ধর্ম রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি যদি হয় ধর্ম বা ধর্মকে যদি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানুষের স্বাধীন বিচারশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ব্যাহত হয়। মানুষের স্বাধীন বিচারশক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে মার্কস ধর্মীয় পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে বলেন :

> তোমরা হৃদয়বৃত্তিতে নাড়া দাও, দর্শন নাড়া দেয় বিচারশক্তিতে; তোমরা দাও অভিশাপ, দর্শন শেখায়; তোমরা স্বর্গ-মর্ত্যের প্রতিশ্রুতি দাও, দর্শন সত্য ছাড়া কিছু প্রতিশ্রুতি দেয় না; তোমরা ... বিশ্বাস দাবি কর, দর্শন দাবি করে বিশ্বাস নয়, পরখ করার; তোমরা আতংকিত কর, দর্শন শান্ত করে।[১১]

মার্কসীয় বস্তুবাদ মানুষের স্বাধীন বিচারশক্তিতে বিশ্বাসী, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আগ্রহী। সে-কারণেই তা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের বিরোধী। রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের আইনগত, নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রের ভিত্তি ধর্ম হলে তা সম্ভব নয়। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে ঈশ্বর তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মগুরুরাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, রাষ্ট্র ও জনগণের কোনো সার্বভৌমত্ব থাকে না। মার্কস বলেন, 'ধর্মীয় রাষ্ট্র হলো ঈশ্বরতন্ত্র; এমন সব রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া চাই ধর্মের দেবতা স্বয়ং জিহোবা, যেমটা ইহুদী রাষ্ট্রে, নইলে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, যেমন তিব্বতের দালাইলামা।'[১২] ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র বাস্তব জীবনের সাথে অসংগতিপূর্ণ। রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক প্রতারিত হলে সে আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের কাছে নয়। কিন্তু ধর্মীয় বিধানে বলা হয়েছে ঈশ্বরের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে, কারণ ইহকালে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলে পরকালে পরম সুখ লাভ করা যাবে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা পরস্পরবিরোধী, কারণ ধর্ম পারলৌকিক আর রাষ্ট্র ইহলৌকিক। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় পারলৌকিক বিধি-বিধান দ্বারা এবং এই রাষ্ট্রে বৈষয়িক অধিকারের জন্য মানুষকে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করতে বলা হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে বৈষয়িক অধিকারের জন্য মানুষ আবেদন করে মানবাধিকারের কাছে। মার্কসীয় বস্তুবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র হবে যুক্তিভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক নয়। রাষ্ট্র মানবিক সৎ সম্পর্কের যুক্তিসম্মত প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত, ধর্মের থেকে তা উদ্ভূত হতে পারে

না। ধর্মের ভিত্তিতে কোনো মানবিক রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। মানবিক রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে মানুষের স্বাধীন বিচারশক্তির ভিত্তিতে। রাষ্ট্রকে দেখতে হবে মানুষের চোখ দিয়ে (মানুষের বিচারশক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে), ঈশ্বরের চোখ দিয়ে নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, "কার্ল মার্কসের সমাধিপাশে বক্তৃতা", মার্কস-এঙ্গেলস, *রচনা-সংকলন*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ১৬৪

২. *প্রাগুক্ত*

৩. *মার্কস-এঙ্গেলস*, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, *ভূমিকা*, পৃ.৮

৪. প্রাগুক্ত, Kolnische Zeitung -এর ১৭৯ নং সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, পৃ.৩৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

৬. ভ. বুজুয়েভ, ভ. গরোদনভ, *মার্কসবাদ-লেনিনবাদ*, বাংলা অনুবাদ ননী ভৌমিক, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮, পৃ. ২১-২২

৭. কার্ল মার্কস, "হেগেলের আইনের দর্শনের পর্যালোচনায় প্রদত্ত রচনা", ভূমিকা, মার্কস-এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, বাংলা অনুবাদ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮১, পৃ. ৩৯-৪০

৮. দেবাশিস চক্রবর্তী, *রাষ্ট্রচিন্তার ধারা*, পৃ. ৩৬৭

৯. মার্কস-এঙ্গেলস, "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার", *রচনা সংকলন*, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ. ৪৪

১০. মার্কস-এঙ্গেলস, "দ্য জার্মান আইডিওলজি", *ধর্ম প্রসঙ্গে*, পৃ. ৭২

১১. মার্কস, "Kolnische Zeitung-এর ১৭৯ নং সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ", *ধর্ম প্রসঙ্গে*, পৃ. ৩২

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 15-38

যাযাবর বাজিকরদের অস্তিত্বের সংগ্রামে ধর্মীয় পরিচয় সংকট
প্রসঙ্গ *রহুচণ্ডালের হাড়*

শংকর কুমার মল্লিক

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail : mallickkhluna@gmail.com

সারসংক্ষেপ

যাযাবর বাজিকর সম্প্রদায় সমাজের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য প্রান্তজনগোষ্ঠী। সুদীর্ঘকাল ধরে তারা সমাজের বুকে ভাসমান শেওলার মতো ভেসে বেড়ায়। এই চলমান জীবনে তারা নির্যাতিত, অত্যাচারিত, অপমানিত, নিঃগৃহীত হয় নির্বিচারে। জমিদার, মহাজন, সমাজপতি, সরকারের প্রশাসনের লোক যে যেরকম পারে তাদেরকে শোষণ করে, বিভ্রান্তির জালে আটকে ফেলে। সেই শোষণ বঞ্চনার জটাজাল থেকে মুক্তির জন্যে এবং পুরুষানুক্রমে এই ভাসমান জীবনে থিতু হওয়ার লক্ষ্যে তারা নতুন সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু সমাজের মূলধারার মানুষেরা তাদের অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে নতুন সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। বাজিকররা মনে করে তাদের কোনো দেবতা নেই, নেই কোনো ঈশ্বর, ভগবান বা আল্লাহ। তাদের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই। অথচ থিতু হওয়ার সেই সংগ্রামের কালে তাদের সামনে দেয়া হয় ধর্মান্তর গ্রহণের টোপ। তখনই তাদের গোষ্ঠীগত জীবনের মূলে লাগে কঠিন আঘাত। হৃদয়ের গভীরে হয় রক্তক্ষরণ। কিন্তু অসহায় উন্মূল মানুষগুলোর সামনে থাকে না স্বস্তির বা শান্তির পথ।

মূলশব্দ

বাজিকর, যাযাবর, ধর্ম, হিন্দু, মুসলমান, অস্তিত্ব সংকট

ভূমিকা

একটি বিশেষ সময়ের ইতিহাস, যাযাবর বাজিকরদের কল্পপৌরাণিক কাহিনী, তাদের ভাষা, জীবনচর্চা ও জীবনচর্যা–এক কথায় তাদের সাংস্কৃতিক শিল্পভাষ্য এই 'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাস। তাদের পূর্বপুরুষের সেই পূর্বাগমনের পূর্ববাণী–'তুমু পচ্ছিমেৎ লয়, পুবে যাবা' শিরোধার্য করে শত শত বছর ধরে পুবের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক পুবের দেশ থেকে আর এক পুবের দেশে তারা যেতে থাকে, কিন্তু পুবের অরুণোদয়ের আলো তাদের ঘরে তথা জীবনে প্রবেশ করে না। বরং কালো অন্ধকার ঘিরে থাকে তাদের চতুর্পার্শ্ব। বাজিকরের দল বসত গড়ে থিতু হওয়ার স্বপ্ন দেখে, চিরকালের চলনের

সমাপ্তি টানার আশায়। থানাদারের কাছে থেকে জায়গা পাট্টা নেয়, বন কেটে, জল সরিয়ে জমি তৈরি করে। সে জমিতে ঘর তোলে, বীজ বোনে-স্বপ্ন বোনে। নানা প্রতিকূলতায় আবার হারায় সে স্বপ্ন, বসতি-জমি। জমিদার, মহাজন, সমাজপতিদের শোষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মৃত্যু, সরকারি সিদ্ধান্ত তাদের মাটিছাড়া করে। ঠিকানা হয় অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। এক ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে যাদের জীবিকা, সেই প্রতারক বাজিকর নিজেই প্রতারণা হতে হতে উপন্যাসের শেষে দেখা যায় তার গৃহবাসী হওয়ার, সমাজের কাছে ঠাঁই পাবার ক্ষেত্রে এক চরম শর্ত মেনে নিতে হয়। তাকে বার বার শুনতে হয় তারা হিন্দু না মুসলমান? অথচ এই প্রশ্নের কোনো সরল উত্তর তাদের জানা নেই। তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তেবাসী নমঃশূদ্রদের ভেতরও তাদের ঠাঁই হয়না। অবশেষে বেশিরভাগ বাজিকর এক জুম্মাবারে মুসলমান সমাজপতির নেতৃত্বে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়। বাজিকররা ভাবে তাদের চলমান জীবনের স্থিরতা এলো, আর তাদের গ্রহণকারী মুসলমান সমাজের অন্য হিসেব। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষে দেখিয়েছেন তাদের সংখ্যা বাড়লো, সমাজে টিকে থাকার, শক্তি প্রদর্শনের এমনকি ভোটের রাজনীতিতেও তারা লাভবান হবে। তার বিপরীতে বাজিকরদের মানব পরিচয়ের বাইরে গিয়ে গ্রহণ করতে হয়- বিশেষ ধর্মীয় পরিচয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

মানুষের প্রথম ও প্রধান পরিচয় সে মানুষ। এই মানবিক পরিচয়ের মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ। যাযাবর বাজিকরদের প্রবহমান জীবনধারায় বার বার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তারা হিন্দু না মুসলিম? ধর্মীয় পরিচয়টিকে মুখ্য করে তোলার চেষ্টা করেছে সমাজের মানুষ। বাজিকরদের ভাসমান জীবনের স্থিতি পাবার লক্ষ্যে বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিচয় গ্রহণে বাধ্য হতে হয়েছে এবং তার ফলে তাদের সুদীর্ঘকালের গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিচ্ছিন্নতা। এই সংকটের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাস নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা, সমালোচনামূলক লেখা হয়েছে। সেখানে ঔপন্যাসিকের-ইতিহাস, সমাজ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী, একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, তাদের কর্মপ্রবাহ, জীবনাচার লড়াই-সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রঞ্জনা বিশ্বাস, রাহেল রাজিবসহ আরো অনেকে তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

বিশ্লেষণ

বিচিত্র সংস্কারাচ্ছন্ন আদি কৌম গোষ্ঠীগুলোর একটি হলো বেদে বা বাদিয়া জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর উৎস বা উৎপত্তি সন্ধান করতে গিয়ে গবেষকগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। এদের গোত্রসংখ্যা বা উপ-গোষ্ঠীর সংখ্যা নিয়েও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গবেষকের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আমরা সে আলোচনায় যাব না এবং আমাদের আলোচনার উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুও সেটি নয়। তবে বেদে জনগোষ্ঠীর প্রধান তিনটি গোত্র হলো– মাল বেদে গোত্র, শান্দার বেদে গোত্র এবং বাজিকর বেদে গোত্র।[১]

ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন (১৯৪৫) তাঁর 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন যাযাবর বাজিকর সম্প্রদায়ের জীবন-আখ্যান। উপন্যাসে উল্লিখিত দনু থেকে শুরু করে অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ শারিবা পর্যন্ত তারা সবাই নিজেদের 'বাজিকর' বলে পরিচয় দিয়েছে। আবার কখনো বলেছে 'বাউদিয়া' 'বাদিয়া' এবং 'বেদে' বাজিকর। অর্থাৎ তাদের নিজেদের আত্মপরিচয়ের মধ্যেই বেদে এবং বাজিকর দুটোই উচ্চারিত হয়েছে।

উপন্যাসে শারিবার নানি লুবিনি তার নাতিকে বলেছে, "হাঁ শারিবা, তোর নানার নানা পীতেম, তার বাপ দনু, তো সি কহিল, পীতেম, তুমু পচ্ছিমেৎ লয়, পুবেৎ যাবা। কেন কি, পুবেৎ তরক উঠে আর পচ্ছিমেৎ ডুবে যায়। বাউদিয়া বাজিকর যতদিন দিশাহারা, ততদিন তারা তরক্‌কে পাছুতে রাখে, ততদিন তারা খালি পচ্ছিমেৎ যায়। তয় দনু কলেন, পীতেম হে, পীতেম, তুমু পুবেৎ যাও, বাপ। রহু তোমার সহায় হবেন।"[২] থানার দারোগা যখন পীতেমকে শারীরিক নির্যাতন করতে উদ্যত হয়, তখন দারোগার মুখের কাছে সালমা হাত নাড়িয়ে বলে, "কি করবে একে? মারবে? মারো, তোমার ক্ষমতা দেখি? দেখো, দারোগাবাবু, আমরা বাদিয়া জাত, আসমানের দেবতা আমাদের সহায় থাকে। অন্যায় কিছু করবে, প্রতিফল মিলে যাবে হাতে হাতে।"[৩] আমাদের দেশে বেদে সম্প্রদায় বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি যারা যাযাবর জীবন যাপন করে এবং সাপ ধরে, সাপখেলা দেখায়, শিকড়-বাকড় ও তাবিজ বিক্রি করে এবং তাদের নারীরা বিভিন্ন জরিবুটি বিক্রি করে জীবন ধারণ করে। কিন্তু বাজিকররা সাপ ধরে না এবং সাপ খেলা দেখায় না। উপন্যাসে বর্ণিত বাজিকরদের আদি বাসস্থান গোরখপুর। ভারতের উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই গোরখপুর। কোনো এক শনিবারে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো জনপদ। রেহাই পায় না বাজিকরদের জীর্ণ ঘরবাড়ি। সেখান থেকে বেরিয়ে বাজিকররা নতুন জায়গায় বসতি শুরু করে। লেখকের বর্ণনায়–

> "সে এক অপরিচিত দেশ। যেখানে ঘর্ঘরা নামে এক পবিত্র নদী বয়ে যায়। সেখানে নাকি কবে এক শনিবারের ভূমিকম্পে সব ধূলিসাৎ হয়েছিল। ঘর্ঘরার বিশাল এক তীরভূমি ভূ-ত্বকে বসে গিয়ে নদীগর্ভের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর তাতে মিশে গিয়েছিল গোরখপুরের বাজিকরদের জীর্ণ বাড়িঘর। ধ্বংস হয়েছিল বাজিকরদের প্রধান অবলম্বন অসংখ্য জানোয়ার। তারপর যাযাবর বাজিকরের দল ঘর্ঘরার উত্তর তীরে আরো উত্তরে সরে গিয়ে নতুন বসতি তৈরি করে।"[৪]

সেখানে বাজিকর খেলার আসর বসালে থানা থেকে তাদের ডাক পড়ে। থানায় যাওয়ার পর দারোগা-পুলিশের বউ বাচ্চাদের কৌতূহল কী খেলা দেখায় তারা? তারা জানতে চায়, "কী খেলা আছে তোমাদের?

বান্দর আছে, ভাল্লু আছে, দড়ির খেলা আছে, ভান্‌মতি আছে, বহুতকিসিমের খেলা আছে।

সাপ নেই, সাপ?

নেহি মালকিন, বাজিকর সাপ ধরা জানে না।"[৫]

বাজিকররা নানারকম খেলা দেখিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে। লুবিনি শারিবাকে বলে–" মুলুক মুলুক ঘুর‍্যে বান্দর লাচানো, ভাল্লু লাচানো, পিচ্‌লু বুঢ়া, পিচ্‌লু বুঢ়ির কাঠের পুতলা লাচানো, ভান্‌মতির খেলা, বাঁশবাজি, দড়িবাজি, নররাক্ষস হয়া কাঁচা হাস, কাঁচা মুরগা কড়মড় কর‍্যে খাওয়া, নাচনা, গাহানা– এসব বাজিকরের কাম।"[৬]

পবিত্র ঘর্ঘরা নদীর তীরে বাজিকরদের বসতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গ্রামের গোয়ালারা এসে বললো, এখানে থাকা যাবে না। দলের সর্দার পীতেম দু'চারদিন থাকার জন্য অনুরোধ করলেও তা ফিরিয়ে দেয় গ্রামবাসী। রাতে পীতেমের পিতা দনু তাকে স্বপ্নে বলে– 'পীতেম হে, পীতেম, পুবের দেশে যাও, বাপ। সিথায় তোমার নসিব।'[৭] যাযাবর বাজিকর এভাবে তাড়া খেতে খেতে পালায় সূর্য ওঠার দিকে, পালাতে থাকে সদলে। পুবের দেশে যেতে থাকে অনবরত। তাদের পূর্বপুরুষের এই পূর্বগমনের পূর্ববাণী তারা শিরোধার্য করেছিলো। কিন্তু বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, পুরুষানুক্রমে সূর্যোদয়ের দিকে এতো প্রাণপণে ছুটেও তাদের ঘরে আলো আসে না। শত শত বছরেও সেখানে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। বাজিকরদের ক্রমাগত পুবের দিকে চলার সাথে ইতিহাসের প্রসঙ্গ আছে– ইংরেজের শাসন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, জমিদারের শোষণ, দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি। সেই নিরন্তর চলা এবং স্থানে স্থানে বসত নির্মাণের বর্ণনার মধ্যে একটি ভৌগোলিক পরিচয় আমাদের সামনে উঠে আসে। লুবিনি বলে–

> "এইভাবে, শারিবা, গোরখপুর থিকা ডেহ্‌রিঘাট, সিথায় ক-বছর, তা-বাদে সিওয়ান, সিথায় ক-বছর, তা-বাদে দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের, কত দেশে তোর নানার নানা বসত করার চেষ্টা করল, হল না। তারপর এই পুবের দেশ। তা এখানেও কি স্বস্তি আছে? মানুষ চায়, বাউদিয়া বাউদিয়াই থাকুক, বাজিকর বাজিকরই থাকুক। তার আবার ঘর-গেরস্থালি কি? রাজমহল, মালদা, নমনকুড়ি, রাজশাহী, আমুনাড়া, পাঁচবিবি। সব শেষে এই পাঁচবিবি। আরো কত দ্যাশ ঘুরলো সি বাজিকরের দল, তোক্ আর কি ক'মো। সব কি কারো স্মরণ আছে।"[৮]

এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ক্লান্ত শ্রান্ত বাজিকররা। লুবিনির বক্তব্য-

> "পার্শ্ববর্তী সমাজের কোনো বৃদ্ধার সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তার কাছে নেই এমন একখানা আধার যার নাম ঈশ্বর, যার উপরে সে তার অভিজ্ঞতা, বোধবুদ্ধি সঁপে দিয়ে নিজেকে নিমিত্ত মাত্র মনে করতে পারে।
>
> তাই শারিবা, সি বাজিকর রাজমহল ছড়ি আবার রাস্তাৎ ঘুরবা বারালো। পথে পথে ফিরা বাজিকরের কুত্তা ভুকে, জানোয়ার চিল্লায়। পুরনিয়া, কাটিহার, কিশনগঞ্জ, দিনাজপুর, রঙপুর, ফির মালদা, রহুর ঘোড়ার অক্তের দাগ, ঘুর, ঘুর, ঘুররে বাজিকর, দেখ, খুঁজি দেখ, কুথায় তোর থিতু, কুথায় তুর সোয়াস্তি। আর মাথার উপর তর্‌ক জ্বলে, শীতের হিম, বর্ষার জল। বাজিকরের গেঁহুর পারা অঙ তামার বন্ন হোই গিল।"[৯]

পথ চলতে চলতে আর বিভিন্ন জনপদে বাস করে বিচিত্র মানুষের সাথে মিশে তারা হারিয়েছে অনেক কিছু। ঘরবাড়ি, নিজস্ব সম্পদ-মহিষ, ঘোড়া আর প্রিয় আত্মীয় স্বজন। হারিয়েছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। লুবিনি শারিবাকে বলেছে–

"তখন রমনীরা পরত ঘাঘরা আর কামিজ, পুরুষেরা পরত নুগরু আর কুর্তি। এখন দেখ সব মেয়ে শাড়ি পরে, পুরুষেরা পরে ধুতি আর লুঙ্গি। সেসব ছেড়ে দিল, তার নিজের ভাষা, নিজের পোশাক, নিজের আচার-আচরণ, নিজের ক্রিয়াকর্ম, সব। কেন রে শারিবা কেন? তোর নানা বলত, আমি মজুর খেটে খাবো আর ভিখ মাঙ্গব না, লোক ঠকাব না। মুখে বলত, আমি মজুর খেটে খাব মনে ছিল গেরস্ত হব।"[১০]

বাজিকররা তাদের সব কিছু ত্যাগ করেও তার বিনিময়ে একান্ত প্রত্যাশা ছিল থিতু হওয়া। কারণ এই যাযাবর জীবনে নতুন কোনো গ্রামে বা গঞ্জে এলে তাদের উপর নানারকম বিধি নিষেধ, অত্যাচার-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা শুরু হয়। কখনো বিগতযৌবন পেটমোটা ব্যবসাদার বাজিকরের হাত-দেখা রমণীর কাছে নিদান খোঁজে বাজিকরণের, সুলুকসন্ধান চায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির। ক্ষমতাধর থানার দারোগা, কখনো তার ছেলে, কখনো পত্তনিদার, জমিদার কখনো অন্যজাতের সমাজপতি তাদের কাছে টাকা চায়, পশু চায়, নারী চায়। শুধু চেয়েই শেষ নয়, তাদেরকে দিতে হয় অথবা তারা জোর করে নিয়ে যায়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তারা স্থিতি চেয়েছে। সমাজের অন্য মানুষের মতো ক্ষেতে খামারে কাজ করে, নানারকম কাজ শিখে তারা জীবনধারণ করতে চায়। শ্রম ও উৎপাদনের সাথে বিযুক্ত এই যাযাবর বাজিকর শ্রম দিতে এবং উৎপাদনের সাথে যুক্ত হয়ে গৃহী হতে চায়। উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি দেড়শ বছর ধরে দনু থেকে শারিবা পর্যন্ত পাঁচ পুরুষের পায়ের নিচে মাটি পাওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন তাদের কল্পিত আদিপুরুষ রহুর কালেও যেমন ভেঙে গিয়েছিল, শারিবার কালেও ভেঙে গেছে। চলতে চলতে তারা অন্য জনগোষ্ঠীর পাশে এসেও নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারেনি। অনুপ্রবেশ করেছে অন্যবর্ণের ভ্রষ্টাচার, উচ্চবর্ণের রাজনীতি আর ক্ষমতার প্রভাব। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের সংকট। নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে তাদের প্রশ্ন আছে অনেক, উত্তর কম। কিন্তু সে প্রশ্ন যখন বাইরের অন্যকোনো সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে আসে, তখন তা আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। শারিবা তার নানির কাছে প্রশ্ন করেছে– "হিন্দুর ভগবান আছে, মোছলমানের আছে আল্লা, খ্রিস্টানের যেশু। তো হামরার বাজিকরের রহুই সি ভগবান, কি আল্লা, কি যেশু। লয়?"[১১] এই ক্ষুদ্র অথচ ব্যাপক গভীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর শারিবার বৃদ্ধা নানির কাছে নেই। ছিল না তার পূর্বপুরুষের কাছেও। তাই বৃদ্ধ লুবিনি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না। লেখক বলেছেন–

"প্রশ্নটা তার নিজের কাছেই। চতুষ্পার্শ্বের সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে এটা কোনো সমস্যাই নয়। সর্বশক্তিমান এক বা একাধিক অস্তিত্বের উপস্থিতি যেখানে জন্মের পরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো সাধারণ বিষয়, সেখানে বাজিকর নামক সম্প্রদায়ের এ ধরনের কোনো আশ্রয় নেই– একথা অন্য কারো বোধগম্য নয়। অন্য কারো সমস্যাও নয়। সমস্যা ছিল পীতেমের, সমস্যা ছিল জামিরের, সমস্যা লুবিনির, শারিবার, সমস্যা কিছু বাজিকরের। রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। সে এক প্রাচীন দলপতি। সে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণ করত তার জীবদ্দশায়। কিন্তু লুবিনি কিংবা কোনো বাজিকর তাকে ভগবান, আল্লা ইত্যাদির সমগোত্রীয় ভাবতে পারে না। এই অমোঘ শক্তিধরদের যে পরিচয় বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে সে পায়, রহুকে তার সমগোত্রীয় ভাবতে তার শুধু ভয় নয়, অনিচ্ছাও বটে। কাজেই তার বোধের মধ্যেও রহু বেঁচে থাকে এক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দলপতির মতো। তার উপরে সে দেবত্ব আরোপ করতে পারে না, কারণ দেবত্ব আরোপ করতে পারার সামাজিক স্থিতি তার নেই। সে সমাজচ্যুত। সে ভ্রাম্যমাণও। পথই তার যাবতীয় নীতিনির্ধারক।"[১২]

'বাজিকরের আপন কুনো ধরম নাই' এই সরল স্বীকারোক্তি একসময় বাজিকররা করতে পেরেছে। কিন্তু এই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তাদের না থাকার কারণে বাজিকর জামিরের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাজশাহী শহরের বাইরে পদ্মানদীর তীরে যখন জামিরের দল তাবু ফেলে তখন তার অল্প কিছুদিনের মধ্যে রমজানের সাথে জামিরের বন্ধুত্ব হয়। সেই রমজানের ছেলে গোলাম খুন হলে রমজান শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কিন্তু জীবনের বাস্তবতায় ধীরে ধীরে শোক কাটিয়ে উঠে আবার গঞ্জের ঘাটে স্টিমারের ভোঁ শুনে তাদের কাজে যেতে হয়। কিন্তু অবসরে ছেলের কথা মনে পড়লে রমজান আর জামিরের মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা বিনিময় হয়। রমজান বলে, "দ্যাখেক বাজিকরের পো, খোদাতালার কাছে মোর কিছু নালিশ নাই, তবু যে মনটা পোড়ে ক্যান!"[১৩] এর উত্তরে জামির বলেছে– 'হা, সিটা ভারী আচ্চয্যের কথা বটে' কিন্তু আল্লা, খোদাতায়ালা কিংবা ঈশ্বর সম্বন্ধে তার ধারণা পরিষ্কার না থাকলেও একটা বোধ তার ভেতরে কাজ করে। এখানে লেখকের বর্ণনা খুবই গভীর অর্থজ্ঞাপক–

> "সত্যিই আশ্চর্যের কথা এবং জামির ভেবে দেখে সে ঠিকই বলেছে। কেননা, একজন আছে, যার কাছে সব নালিশ অভিযোগ রোষ দুঃখ ইত্যাদি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করা যায়, এসব সে অভিজ্ঞতায় জানে না, জানে বুদ্ধিতে। সে জানে রমজানদের এই একজন আছে, তাই কখনো কখনো একটা বিরাট আশ্রয়ের মতো তা কাজ করে। এ আশ্রয় শুধু সমর্পণের জন্য নয়, এ এমন একটা আধার, যেখানে তুমি তোমার যাবতীয় ক্লেদ, ক্রোধ এবং ঘৃণাও নিক্ষেপ করতে পার। এই আশ্চর্য ঈশ্বর কিংবা খোদাতালা রমজান কিংবা তার সগোত্রীয় সামাজিক জীবদের এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যেখানে চাই না তোমাকে, মানি না তোমাকে, বললেও সেই নিরীশ্বর ঘোষণা আসলে এক পরম আস্তিক্যের অভিমানে আবদ্ধ থাকে। কাজেই গোলামের মা স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারে, নাথি মারি তুমার মসজিদ আর জুম্মা আর নেমাজেৎ, খোদাতালা নাই, খোদাতালা নাই। থাকলি মোর কপালেৎ এমুন হয়! আল্লা রসুল! আল্লা রহমানের রহিম! দুনিয়ার বেবাকে হাসির ধামার মতো প্যাটটা দেখবা পালো, আর সি পালো না!
>
> আর তখনি রমজান বলে, না, তার কোনো নালিশ নেই।...
>
> তাই সে আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে, যদি নালিশই না থাকে তবে রমজানের বুক পোড়ে কেন? নমনকুড়ির বানের মতো সর্বনাশ বাজিকরের আর কী হয়েছে? কিন্তু সে একটা লোকসান। তার সঙ্গে আছে নিতান্তই নিরুপায় দুর্ভাগ্য। কোনো বাজিকর রমণী আকাশের দিকে তাকিয়ে গোলামের মায়ের মতো কাউকে গাল পাড়েনি। কোনো বাজিকর এমন কথাও বলেনি, 'না আমার কোনো নালিশ নেই' তারা জেনেছিল যে, ক্ষতি যা হয়েছে, তার আর আসান নেই। তাই এমন কারো কাছে আশ্রয় চায়নি যার কোনো জৈব অস্তিত্ব নেই। যে আছে তার নাম রহু। কিন্তু সে কি এমন অমোঘ? পীতেমের মতো জামিরেরও মনে হয়, না, তা কখনোই নয়। আসলে রহু, দনু, পীতেম কিংবা জামির মূলত প্রায় একই। আর বিগামাই, কালীমাই, কি ওলামাই? সেও তো শুধু পথের সংগ্রহ, তার বেশি কিছু নয়।"[১৪]

রমজান কিংবা তার মতো আরো অনেক ভিন্ন সমাজ-সম্প্রদায়ের মানুষের সংগে মিশে বাজিকরদের নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। চলতি পথে যুক্ত হয়েছে সাঁওতালদের লড়াই-সংগ্রামে। সেখানে লক্ষণ সোরেন তাদেরকে সম্মান দিয়েছে, গ্রহণ করেছে তাদের আতিথ্য। আবার সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় পরিচয় সম্পন্ন মানুষের কাছে বাজিকররা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতি। তাদের নিজস্ব কোনো সমাজ

নেই, বিশ্বাস নেই, ধর্ম নেই, কার্যকারণ, স্থান-কাল-পাত্র কাণ্ডজ্ঞানের খুবই অভাব। মানবসমাজের প্রয়োজনীয় কোনো মৌলিক কাজ তাদের জানা নেই। তারা ভীরু, লোভী ও একরোখা। অর্থাৎ মূলধারার সমাজবদ্ধ মানুষের চোখে তারা ধর্মহীন, নীতিহীন, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অপরিণামদর্শী মানুষের দল। তাদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণিপেশার মানুষের। সমাজের মূলধারার পাশাপাশি বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ধর্ম, আদর্শ, সমাজিক রীতিনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-জাতি ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব থাকলেও বাজিকরদের ব্যাপারে তাদের মনোভাবের ঐক্য আছে।

সেই বাজিকররা তাদের শতশত বছরের যাযাবরী জীবনযাপন, তাদের ভাষা-সংস্কৃতি, পেশা, পেটের দায়ে লোকঠকানো সবকিছুকে পরিত্যাগ করে তারা চাষাবাদ করে নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে নতুনভাবে বাঁচতে শুরু করেছে। পাঁচ বিবিতে তাদের নতুন স্বপ্ন, নতুন জীবন, নতুন কাজের সাথে যুক্ত হওয়া। উপন্যাসে আমরা দেখি পাঁচবিবিতে বাজিকরেরা নতুন জমিতে পরীক্ষামূলক চাষাবাদ শুরু করেছে। প্রথমে ফসল অল্প ফললেও তাদের আনন্দের কমতি নেই। এর আগেও তারা নমনকুরি এবং অন্য দু'এক জায়গায় চাষাবাদ করেছে কিন্তু তাদের ঠিকানা স্থায়ী হয়নি। সেসব স্মৃতি তাদের মনের ভেতরে দারুণ বেদনা জাগায়। কিন্তু পাঁচবিবিতে এসে ধীরে ধীরে তারা চাষের কাজ পুরোপুরি শিখে নিয়েছে। জীবনের নতুন স্বাদে এবং উচ্চতায় তারা পূর্ব স্মৃতি মনে রেখে ভয়ে ভয়ে সবকিছুকে অধিকার হিসেবে গ্রহণ করতে শিখছে। লেখক বলেছেন–

> "যাবতীয় অনাস্বাদিত সুখের খোলা দরজার সামনে তারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এইবারে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি মিলে গেছে। গৃহস্থের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিকতার অধিকার যেন আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। যাযাবরের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে শক্ত খুঁটোর ঘর বাঁধা। তারপর জীবন বয়ে যাবে স্বাভাবিক স্রোতের মতো। অনির্দিষ্টের মধ্যে আর ঘুরতে হবে না। জমি হচ্ছে স্থিতি–দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক। লুবিনি বলত, শারিবা, তুই বুঝবি না, বাজিকরের জুয়া রেজা-রেজানিওর বিয়ে দেওয়া বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই গোষ্ঠীর মধ্যে এই ছয় পুরুষ ধরে ক্রমাগত রক্তের সম্বন্ধ হচ্ছে। এলা ঠিক কাম লয়। এতে মানুষের সাথ কুৎরিওঁ বা ওয়াদঁরুর, কুকুর বা বাঁদরের তফাত থাকে না। হিন্দু তোমাক্ সামাজে লিচ্ছে না, মুসলমান তোমাক্ একসাথ ওঠবস করায় না। এংকা কথা তোর নানা ভাবিছিলো। কিন্তু শেষ দিশা করবা পারে নাই। তবি ভাবিছিল। জমিন হল্যে থিতু হবে, থিতু হল্যে সব হবে।"[১৫]

সেই থিতু হওয়া যখন শুধুই সময়ের ব্যাপার, সবকিছু তাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে অথবা যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে বাজিকরদের সামনে আসে সেই মোক্ষম প্রশ্ন। যে প্রশ্ন তাদের নিজেদের মধ্যেও করতে দেখা যায়। শারিবা তার নানি লুবিনিকে করেছে। অন্য বাজিকরদের মুখের তা দু'একবার সামান্য হলেও উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তার উত্তর বাজিকরদের কাছে যেমন নেই, তেমনি বিশেষভাবে কখনো সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার খুব বেশি প্রয়োজন বোধ করেনি। সেই মোক্ষম প্রশ্নটি একইসঙ্গে এসেছিল পাঁচবিবির হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের দুই জমিদার মহিমবাবু ও লালমিয়ার কাছে থেকে। লেখকের ভাষায়– "অথচ বেশ কয়েক বছর মহিমবাবু ও লালমিয়ার সেবা করার পরও প্রশ্নে উঠেছিল, তুমরা হিঁদু না মোছলমান? এর আগে দীর্ঘ একশো বছরের মধ্যে এ প্রশ্ন কারোই ওঠাবার দরকার হয়নি। অথচ পাঁচবিবির মহিমবাবু কিংবা লালমিয়ার কাছে তখন এ প্রশ্ন জরুরী ঠেকেছিল।"[১৬]

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক এক ক্রান্তিকালে পাঁচবিবির মতো মফস্বল জনপদে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের দুই জমিদার এই একই প্রশ্ন একত্রে তুলেছিল বাজিকরদের কাছে। দীর্ঘ প্রায় দু'শো বছর শাসন-শোষণের পর বৃটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভারত-পাকিস্তান আলাদা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছুকাল আগে শুরু হয়েছে তেভাগা আন্দোলন।[১৭] কৃষকদের সেই লড়াইয়ে বহু কৃষক যেমন মরেছে, তেমনি অনেক জোতদারেরও প্রাণ গিয়েছে। ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব রয়ে গেছে সর্বত্র।[১৮] যুদ্ধের বাজারে বাঁশ ও কাঠের দাম খুব চড়া। বাজিকরদের দিয়ে মহিমবাবু ও লালমিয়া জঙ্গল ও বাঁশবন পরিষ্কার করিয়েছে। তাদের মতো এতো কম দামে অন্যকোনো মজুর পাওয়া যাবে না। তাই বাজিকরদের মানসিকভাবে দুর্বল করে রাখার জন্যে অহেতুক অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় দুই জমিদার ধর্ম পরিচয়ে পৃথক হলেও স্বার্থের জায়গায় তারা একাট্টা। লালমিয়া প্রশ্ন করেছে–"তুরা হিঁদু না মোছলমান, অ্যাঁ?" আর মহিমবাবু বলেছে– "হাই বাপু, তোরা গরুও খাস, শুয়ারও খাস, ই কেম্‌কা জাত রে বাবা!"[১৯]

বাজিকরদের সর্দার তখন ইয়াসিন। বয়সের কারণে সে সর্দার। তবে ইয়াসিন খুব সহজ সরল মানুষ। দনু, পীতেম প্রভৃতির মতো সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা তার নেই। লালমিয়া সেই সর্দার ইয়াসিনকে ডেকে নিয়ে সাংবাদিকের মতো প্রশ্ন করে–

নাম তোর ইয়াসিন, আর তুমু মুছলমান লও?
জী মালিক, হামি বাজিকর।
জুম্মা জিয়াপৎ কারো না?
ওলা জানি না, হুজুর।
ধম্মোকম্মো কি কর?
অভিজ্ঞ ব্যক্তিটি দলের মানুষের কাছে বেকুব হয়ে যায়, এদিক ওদিক তাকায়।
ঠাকুর দেবতা কিছু আছে?
ওলামাই, কালীমাই, বিগামাই, এলা সব আছে।
তবি তো তুমাদের হিন্দুর সঙ্গ?
কিন্তু মহিমবাবু বলে, ক্যারে, ওলামাই, কালীমাই তো বোঝ্‌নো, কিন্তু বিগামাইটা কি বস্তু?
অংকা ঠিক জানো না, মালিক।
পূজা আচ্চা হয়?
থানে সিঁদুর, ধুপ দেবা হয় হুজুর। আর গান হয়।
আবার গরুও খাস?
মৌনতা।
আবার শুয়ারও খাস?
নিরবচ্ছিন্ন মৌনতা।
কি বেজাত রে বাবা, ভাবা পারি না?[২০]

তারপরও পাঁচবিবিতে বাজিকররা স্থায়ী হতে পারেনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে জঙ্গল আর বাঁশবন পরিষ্কার করে তারা জমি খালাস করেছিল, তার আধি জমিতে তারা আবাস ও চাষাবাদ শুরু করেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মহিমবাবুর কাছ থেকে রূপা ও ইয়াসিন বাজিকরের আধি জমিগুলো কিনে নেয় অবস্থাপন্ন জোতদার দিগিন মণ্ডল। সে জমিতে ভাদুই ধান কেবল পাক ধরেছে। দিগিন মণ্ডল তিনদিনের মধ্যে কেবল-পাক-ধরা ধান কেটে নিয়ে জমি পরিষ্কার করার নির্দেশ দিল। ইয়াসিন ও রূপা অনেক অনুনয় বিনয় করে সাতদিন সময় চেয়েছিল। কিন্তু তিনদিন পরে মাঠে হাল মই দিয়ে সেই ধানক্ষেত সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। সহ্য করতে না পেরে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রুদ্ধ রূপা বাজিকর। একজন খুন হয়। তারপর শতশত বছর ধরে ভয়ার্ত মারখাওয়া বেদে বাজিকরের জীবনে যা ঘটে এসেছে তারই অনুরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। পালাতে থাকে বাজিকরের দল। পিছনে পড়ে থাকে তাদের দুই পুরুষের অর্জিত অধিকার সহায়-সম্পদ, প্রিয়জন, স্বপ্নের অতৃপ্ত ঘর-গেরস্থালি। তাদের উৎখাতের পেছনে পাঁচবিবির দুই জমিদার মহিমবাবু ও লালমিয়ার প্রত্যক্ষ সহাবস্থান। দুই জমিদারের হাতি এসে ভেঙে দিয়ে যায় বাজিকরদের তিলে তিলে গড়ে তোলা স্বপ্নসৌধ। ঔপন্যাসিকের ভাষায়–

> "দুই কুঠিবাড়ির দুই হাতি বাজিকরের ঘর ভাঙে। ভাদুই ফসলের জমিগুলোকে দাপিয়ে কাদা করে। ঘরে আগুন লাগে। বাজিকর রমণীরা বয়স নির্বিশেষে ধর্ষিতা হয়। ইয়াসিনের মেয়ে পলবি নিখোঁজ হয়। তারপর এই ছিন্নমূল মানুষগুলোকে তাড়িয়ে অনেকদূর পার করে দেয় মহিমবাবু, লালমিয়া ও দিগিন মণ্ডলের লোকেরা। এসব উপভোগ করার মতো দৃশ্য তখন হামেশাই হতো। বাচ্চা-কাচ্চা, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে মানুষ ছুটছে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে, পিছনে তাড়া করে যাচ্ছে আরেকদল ক্ষিপ্ত মানুষ, ছুঁড়ছে ঢিল।
>
> তখন বর্ষার দিন। মানুষগুলো নদীর পাড় ধরে এগোয়, কেননা নদীর পাড়ে কাদা কিছু কম, পলি অঞ্চল। তারা এগোয় পুবের দিকে। রাস্তায় আট-দশটি শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মরে। মরে দু'জন আসন্নপ্রসবা রমণী। এইভাবে তারা পুবে চল্লিশ মাইল সরে এসে পাতালু নদীর ধারে মোহর হাটখোলায় তাদের বোঝা নামায়।[২১]

প্রায় ছ'মাস বাজিকররা মোহরের হাটখোলায় খালি আকাশের নিচে বসবাস করে। ঠিক এই সময়ে দেশভাগ হয়।[২২] পাঁচবিবি পড়ে পাকিস্তানে এবং মোহর ঢুকে যায় ভারতের মধ্যে। পাঁচবিবি আর মোহরের মধ্যে চল্লিশ মাইলের যে ব্যবধান তার মাঝখান দিয়ে নতুন দুই দেশের সীমানা চিহ্নিত হয়। "মোহর গ্রামে নতুন মানুষের চাপ বেড়ে যায়। জমি বদল হয়, জমি দখল হয়। জমির দাম বাড়ে, মানুষের দাম কমে। দেশের মানচিত্রে ও শাসনযন্ত্রে নানারকম পরিবর্তন হয়।"[২৩] দেশের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত চাকুরীজীবীসহ নানা পেশাজীবী, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী-এমনকি গৃহী শ্রমজীবী মানুষের জীবনে দেশভাগ অবস্থা ও অবস্থানভেদে অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। কেউ সংকটে পড়েছে, কেউ সেই সংকটকে পুঁজি করেছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার কারণে অসংখ্য মানুষকে তার সাতপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে দেশান্তরী হতে হয়েছে। এই চরম বিপর্যয় নেমে আসে উভয় দেশের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনে। শতশত বছরের গৃহস্থ সম্পন্ন মানুষ অসহায় উন্মূল জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। এই উন্মূল জীবনের কষ্ট-বেদনা বেদে যাযাবররা একমাত্র উপলব্ধি করতে পারে। দেশভাগ প্রত্যক্ষভাবে বাজিকরদের জীবনে তেমন কোনো প্রভাব না ফেললেও একটি বিপর্যয় তাদের

জীবনেও এসেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে তাদের জীবনযাপনে যে পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ করে পাঁচবিবিতে বসবাসকালে তাদের যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে তার থেকে আর রেহাই পায় না বাজিকররা। মোহরে এসে একপ্রকার ভাসমান জীবনেও তারা আর পুরোপুরি বাদিয়া বাজিকর হতে পারে না। আবার স্থায়ী বসবাস এবং চাষাবাদ করার মতো জমিও সংগ্রহ করতে পারেনি। তাই আবার তারা খেলা দেখায়, ভিখ মাঙ্গে। ধীরে ধীরে মোহর গ্রামের মানুষের সাথে পরিচয় ঘটে। থানার দারোগা, দারোগার ছেলে, বদিউল, মহিমবাবু, লালমিয়া, দিগিন মণ্ডল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বাজিকর-নারীদের নিয়ে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করেছে। বাজিকর সর্দারসহ অন্যরা তা জেনেও সবসময় প্রতিকার এবং প্রতিরোধ করতে পারেনি। কখনো কখনো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তা মনে না নিলেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। মোহর গ্রামে এসে মুখোমুখি হয়েছে আজুরা মণ্ডলের। আজুরা মণ্ডল মোহর গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন মানুষ। সে সরাসরি বাজিকরদের জীর্ণ পাতার ঘরে আসে, তাদের সাথে গল্প জমায়, প্রস্তাব দেয় এবং লেনদেন করে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন–

> "হাটখোলায় হাটুরে রসিকরা আসে, আজুরা আসে, কেরোসিনের লম্ফ জ্বলে, নেভে। পুরুষেরা কেউ এ নিয়ে কথা তোলে না, মেয়েরা এ নিয়ে পাতালুর নদীর ঘাটে গিয়েও আলোচনা করে না। কোনো আলোচনা না করেও সবাই ধরে নেয় পথচলতি রাস্তায় একটা অত্যন্ত আবর্জনাভরা বাঁক। এ বাঁকটা পেরোলেই ভালো পরিষ্কার রাস্তা পাওয়া যাবে। কেউ এ আশ্বাস দেয়নি, তবুও।"[২৪]

মাস ছয়েক পর আজুরা মণ্ডলের সমর্থনে ও সহায়তায় মোহর হাটখোলার ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার পাশে বাজিকররা নতুন বসত শুরু করে। পাঁচবিবির মহিমবাবুর মতো অলিখিত শর্তে জঙ্গল পরিষ্কার করে পতিত জমি উদ্ধার করে আধি পাওয়ার নতুন স্বপ্ন দেখে। মোহর হিন্দু প্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য ও কৈবর্ত ছাড়া এই বাজিকরের দল সেখানকার বাসিন্দা। মোহরের পাশেই বাদা-কিসমৎ গ্রাম নমোশূদ্র ও মুসলমান অধ্যুষিত। বাদা কিসমৎ সংযুক্ত গ্রাম। বাদা অংশে নমোশূদ্র এবং কিসমৎ অংশে মুসলমানদের প্রাধান্য। নমোশূদ্র সমাজের বাইশ দিগরের প্রধান ভায়রো। এই নমোশূদ্র পাড়ার মালতী নামের একটি মেয়ের সাথে বাজিকর দলের ওমরের গোপনে প্রেমের সম্পর্ক হয়। এক পর্যায়ে সেই প্রেমিক-প্রেমিকা পালিয়ে যায়। এর ফলে নমোশূদ্র পাড়ার লোকেরা বাজিকরের ঘরবাড়ি তছনছ করে দেয় এবং বাজিকর সর্দার ইয়াসিনকে ধরে আনে সেই ভায়রোর কাছে। নমোশূদ্র সমাজপতি ভায়রো পাঁচবিবির জমিদারদ্বয় মহিমবাবু ও লালমিয়ার মতোই ইয়াসিনের কাছে জানতে চায় তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের কথা। বাদা-কিসমতের ভায়রো জানে না পাঁচবিবির জমিদারদের সেই প্রশ্ন তোলার প্রসঙ্গ। তবে কি অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার মহিমবাবু, লালমিয়ার মতো ভায়রোর জিজ্ঞাসা একই–

> "তোমরা হিঁদু না মুছলমান। সেই পুরনো প্রশ্ন। সেই প্রশ্ন, যাকে বাজিকর সিঁদুরে মেঘের মতো ভয় পায়। ভায়রো আবার বলে, তুমার ঘরের এটা ছেড়া হামার ঘরের এটা ছেড়িক্ নিয়া পালাবা পারে, ইকে বয়সের দোষ, কি, বয়সের গুণই কবা পার। কেন্তু সিটা কথা লয়, বড় কথাটা হল, তুমরা হিঁদু না মুসলমান? এই প্রশ্নের উত্তর বাজিকর দশ বছর আগেও দিতে পারেনি, এখনো পারে না। ইয়াসিন চুপ করে থাকে।"[২৫]

মোহরে এসে শারিবার পরিচয় হয় রাস্তায় রোলার চালক হানিফের সাথে। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। একদিন হানিফ নেশা করার জন্য শারিবার ঘরে আসে। তাড়ি খেতে খেতে তাদের অন্তরঙ্গতা আরও বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে শারিবার পরিচয় জানতে গিয়ে হানিফও সেই প্রশ্ন তোলে–

> "হানিফ তাকে ধমকে ওঠে। বলে, ধেত্, সাহেব সাহেব করছ কেন বল তো? বয়সে তুমার থিকা পাঁচ-সাত বছর বড়ই হব। ভাই বলে ডাক। তুমার নামটা জানা হয় নাই।
>
> আমার নাম শারিবা।
> শারিবা কি?
> শারিবা বাজিকর।
> কোন জাত?
> শারিবা চুপ করে থাকে। সেই প্রাচীন প্রশ্ন হানিফও করে।
> হিন্দু, না মোছলমান?
> হামরা বাজিকর, হানিফ ভাই।
> বাজিকর কোনো জাত নয়।
> তবে হামারদের জাত নাই।
> জাত নাই এমন মানুষ নাই। হয় হিন্দু, নয়, মোছলমান, নয় খৃস্টান–
> ইয়ার এটাও মোরা লই।
> আধশোয়া অবস্থা থেকে হানিফ উঠে বসে। তার মাথায় তখন নেশা ধরে এসেছে। সে বলে, তাজ্জব! এমন কদাপি শুনি নাই। গরু খাও?
> খাই।
> হারাম-শুয়োর?
> খাই-
> তাজ্জব! তুমি হামার নিশা কাটাই দিলা হে![২৬]

এই অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত সংকট থেকে মুক্তি পাবার উপায় কী? ভেবেই পায় না ইয়াসিন এবং অন্য বাজিকররা। ওমরের অপরাধের শাস্তি কি গোটা বাজিকর গোষ্ঠীকে পেতে হবে? আবার কি তাদের এখান থেকে উৎখাত হতে হবে? শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে ভাসমান শেওলার মতো আর কত ভেসে বেড়াতে হবে? এই উদ্বাস্তু উন্মূল জীবনের শেষ কোথায়? এরকম হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খায় বৃদ্ধ সর্দার ইয়াসিনের মাথায়। তার পূর্বপুরুষদের স্থিতি হওয়ার সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করা বোধহয় তার জীবনে সম্ভবপর হবে না। এসব ভাবতে ভাবতে ইয়াসিন ভায়রোর কাছে একটা নিবেদন করে বসে। শত শত বছর ধরে যাযাবর বেদে বাজিকরের সেই পশ্চিমে তাদের আদি পুরুষের স্থান গোরখপুর থেকে পুরের দিকে ছুটে চলেছে। এখনো স্থির হয়ে কোথাও আবাস গড়তে পারেনি। কিন্তু হারিয়েছে বহু বহু কিছু। রহুর অস্থির উপর গভীর আস্থাশীল ইয়াসিনের পূর্বপুরুষরা শত অত্যাচার-নির্যাতন আর অস্তিত্ব সংকটের মুখেও যে কথা কখনো ভাবেনি, ইয়াসিন ভায়রোর কাছে তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। ইয়াসিন আগে থেকেই জানে হিন্দু সমাজে নমোশূদ্র উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কাছে

বেজাত, অস্পৃশ্য। তাই সে ধর্মান্তরিত হয়ে নমোশূদ্র সমাজের সাথে মিশে যেতে চায়। ইয়াসিন ভায়রোকে বলে–

> "হামরাদের আপনার জাতে তুল্যে লেন, মালিক। শুন্যাছি আপুনি দিগরের মালিক। সমাজ আপনার কথা শোনবে।
>
> ভায়রো প্রচুর হাসে। বলে, বাইশ দিগর হামাক্ নমোশুদদুর বানাবার হক্ দেয় নাই বাজিকর। হিন্দুধর্মে এমুন হক্ কেরো নাই। তুমু ব্রাহ্মণ, কায়েৎ, মাহিষ্য, সদ্গোপ, নমোশুদদুর কেছুই হবা হারবা না। তুমু ইসব জাতের হয়া জম্মাবা পার, হবা পারো না।[২৭]

ভায়রো অন্ত্যজ নমোশূদ্র হলেও হিন্দু সমাজের কঠোর নিয়মকে উপেক্ষা করতে পারে না। ফলে ইয়াসিনের প্রস্তাব বিফলে যায়। বেদে বাজিকররা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। অথচ তারা এই দুই সম্প্রদায়ের কিছু কিছু ধর্মাচার ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড প্রতিপালন করে। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেদেনী' ছোটগল্পে লিখেছেন–

> "বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু; মনসা পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করে। হিন্দু পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। বিবাহ আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না কবর দেয়।"[২৮]

শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয় তাদের খাদ্যাভ্যাসেও হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাথে অংশত মিল আছে। এমনকি তাদের নারী-পুরুষ উভয়ের নামের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কিছু নাম হিন্দুদের মতো আর কিছু নাম শুনলে মনে হয় তারা মুসলমান। তবে কিছু নাম এমনও আছে যা এই দুই সম্প্রদায়ের নামের মতো নয়। 'রুহ চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বাজিকরদের নামগুলো হলো– দনু, পীতেম, জামির, ইয়াসিন, রূপা, সালমা, লুবিনি, শারিবা, ওমর, ধন্দু, পেমা, পরতাম, জিল্লু, বালি, শা-জাদী, চেতা, তারা, সোজন, খোদাবাসো, শিউ, লছমন, পলবি, নসিবন, জুম্মন, মতিন প্রভৃতি।

ইয়াসিন ভায়রোর কাছে প্রত্যাখ্যাত হলেও তার অন্য দরজা খোলা ছিল। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সে দরজা আরো প্রসারিত হয়েছিল। দেশভাগের অভিঘাত বাজিকরদের জীবনে তেমনভাবে না পড়লেও বাদা-কিসমৎ গ্রামের বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় কিছুটা হলেও পড়েছে। দেশভাগের ফলে বেশ কয়েক ঘর গেরস্থ মুসলমান বাদা-কিসমৎ গ্রাম থেকে পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে গেছে। এর পাশপাশি কিছু হিন্দু পরিবার জমি বদল করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগের মধ্যে তাদের স্মৃতিতে রয়েছে সান্তাহার রেলস্টেশনের দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র।[২৯] তবে দেশ ভাগের পর সমষ্টিগতভাবে ভারতে মুসলমানরা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।[৩০] সেই চিত্র বাদা-কিসমৎ গ্রামেও লক্ষ করা যায়। কিসমৎ অংশে মুসলমানদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে কমে গেছে। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হাজী খেসের বিষয়টি লক্ষ করেছেন। তাছাড়া মুসলমান পাড়ার সমাজ প্রধান হিসেবে তার মনে সর্বদা একটা আতঙ্ক বিরাজ করে। একধরনের নিরাপত্তাহীনতা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে থাকেন হাজী সাহেব। এমনই সময় শারিবার সাথে

পরিচয় হয় তার। হাজী সাহেব জানেন বাজিকররা হিন্দু-মুসলমান কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ না। এখানে যে বাজিকররা বাস করে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম না। তাদেরকে যদি মুসলমান সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে স্বজন না বাড়লেও স্বধর্মী বাড়বে। এক সময় বাজিকর সর্দার ইয়াসিন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ভায়রোর কাছে শত অনুরোধ করেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এর অল্প কিছুকাল পরে দেশভাগের ফলে কিসমতের হাজী খেসের শারিবা বাজিকরের কাছে তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন। ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন লিখেছেন–

> "শারিবাকে সে বোঝায়, ইসলামে জাতপাতের বালাই নেই। কাজেই বাজিকর মুসলমান হলে ধর্ম পাবে, সমাজ পাবে, স্বজন পাবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কিবা অর্থ হয়। তুমার বাপকে বল, ইয়াসিন সর্দারকে বল, সব বুঝ করি রাজি হওতো মৌলভী বুলা করাই, কলমা পড়ার ব্যবস্থা করি।
>
> একজন বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করলে হজ্জের সমান পুণ্য। কিন্তু হাজি খেসের-এর নজর সেদিকে নয়। স্বজন কমে গেছে, বাড়বে না, কিন্তু স্বধর্মী বাড়বে।[৩১]

হাজী সাহেবের এই প্রস্তাবের পেছনে তার ব্যক্তিগত এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ বেশি কাজ করেছে। বাজিকরদের প্রতিষ্ঠা দেয়া, যাযাবর জীবন থেকে মুক্তিদান, সামাজিক নিরাপত্তা, বিবাহ কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মে তাদের সংযুক্ত করা মুখ্য নয়। শুধু স্বধর্মের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করে নিজেদের নিরাপত্তার দেয়াল শক্ত করা অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন শারিবা ওমরের সদ্য গোপনে বিয়ে করা স্ত্রী মালতীকে কলমা পড়াবার কথা বলে তখন হাজী সাহেব বিপন্ন বোধ করেন। কারণ মালতী নমোশূদ্র সম্প্রদায়ের মেয়ে, তাকে কলমা পড়ালে সামাজিক সংঘাত লাগার সমূহ সম্ভাবনা আছে। অথচ মালতীকে তাদের সাথে মুসলমান বানাতে পারলে হয়তো বাজিকররা একধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেত। হাজী সাহেব তাতে রাজি হয় না। বাজিকররা জানে তারা হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান হোক কোনো তাদের সম্পূর্ণ মুক্তি নেই। তাদেরকে কেউ আপন ভাবে না, কখনো ভাবেনি। লুবিনি-জামিরের কথোপকথনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক সেই সত্য তুলে ধরেছেন–

> "লুবিনি বলে, কেন্তু দেখেক, মানুষ হেথায় দু'রকম আছে। আছে হিন্দু, আছে মোছলমান। সিতো সব্বত্তই আছে।
>
> হাঁ সিটা ঠিকোই। তবি দেখো, ইয়ার সাথ উয়ার মিল নাই, আবার উয়ার সাথ ইয়ার মিল নাই। এ দু'জাতের কেরো সাথ বাজিকরের মিল নাই।
>
> এসব কি জানে না জামির? খুবই জানে। তবুও লুবিনির সাথে অলস সংলাপ হিসেবে এই প্রিয় বিষয়টাই সে বেছে নিয়েছিল। আর এখন দেখে কী নির্দয় যুক্তিতে লুবিনি তার ইচ্ছাগুলোকে ভাঙে। তবুও সে কথা চালিয়ে যায়, এ যেন তার নিজের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব, হয়ত ভাবে এভাবে একটা সমাধানের রাস্তা নিজের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসবে।
>
> সে বলে, মিল নাই? দেখ না ক্যান্ রমজান মিয়াঁ মোক্ কত খাতির করে, তার বেটাবিটিরা মোক্ চাচা কয়, তোক্ কয় চাচি। তবি?
>
> ইস্টিমারে যকুন দুফরের ভোঁ পড়ে রমজান মিয়াঁ নদীৎ নাইমে অজু করে, তুমারে ডাকে তখুন?

মোক্ ডাকপে ক্যান? মুই কি নেমাজ পড়মো?

লুবিনি যুক্তি দিয়ে বোঝায় যে বাজিকর নমাজও পড়বে না আবার হিন্দুদের মতো পুজো-আচ্চাও করবে না। যেসব মালোরা দুর্দিনে গঞ্জের ঘাটে এসে কুলিগিরি করে সুযোগ আসা মাত্র নৌকা পাড়ে টেনে তুলে উপুর করে গাব আর আলকাতরা লাগায়, নিজেরা গায়ে মাথায় তেল মেখে চকচকে হয়। তারপর একদিন গলুইয়ের উপর ফুল পাতা সিঁদুর ধূপ দিয়ে 'জয় মা গঙ্গা' বলে নদীতে ভেসে পড়ে। আবার বড় বড় সাঁইদারদের দেখ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত এনে পুজো করে, সাঁই সাজায়, কত তার অনুষ্ঠান। সেসব ব্যাপারে কেউ কি বাজিকরকে ডাকে?"[৩২]

শারিবা হাজী সাহেবের প্রস্তাব ইয়াসিনকে জানাতে চায়। ওমর-মালতির সমস্যা নিয়ে সন্ধ্যায় রূপার উঠোনে সবাই বসেছে আলোচনা করে সমাধানের পথ সন্ধানের লক্ষ্যে। ইয়াসিন উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বলে যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন আচার-আচরণ সংযত করতে। ওমরের কার্যকলাপ টেনে এনে বলে যে, আমাদের বেটারা এখন সেই রকম আচরণ করছে না, তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। এই সময় এক বাজিকর তরুণ এর প্রতিবাদ করে। তার প্রতিবাদের মধ্যে সেই হিন্দু-মুসলমানের প্রতি ক্ষোভ আছে, সেই ক্ষোভের মধ্যে সত্য আছে, আছে যুক্তি। সেই তরুণ বলে–

"ক্যান্? বাজিকরের ধরম নাই! এতোবড় দুনিয়ার বেবাক মানষিকে হয় ভগবান, লয় আল্লা, লয়তো যিশু বানাইছে। তো ই বাজিকরগুলো কি এংকা আসমান ফুড়া বারাইচে? আরেকজন বলে, বাজিকরের বিটিক্ পাট খ্যাতে চিৎ করা চলে, বাজিকরের বিটিক্ লুঠ করা চলে, ঢেমনি বানাবার চলে, আর বাজিকরের ব্যাটাক্ জামাই করা চলে না।"[৩৩]

এরপর আলাপ-আলোচনার এক ফাঁকে শারিবা ইয়াসিন সর্দারের কাছে খেসের হাজীর সেই প্রস্তাবের প্রসঙ্গ তোলে। শারিবা বলে–

"মামা, খেসের হাজি এ্যটা কথা কলেন। কথাটা ভাবা লাগে।

কি কথা, বেটা?

হিঁদু সমাজ হামরাদের নেবে না, কেন্তু মুছলমান সমাজ নেবার পারে।

কেম্কা?

কল্মা পড়ে মুছলমান হল্যে–"[৩৪]

একথা শুনে প্রথমেই তীব্র প্রতিবাদ জানায় শারিবার বাবা রূপা বাজিকর। মুসলমান হওয়ার কথা শুনে সে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে প্রচণ্ড ক্ষোভের সাথে তার প্রতিক্রিয়া জানায়–

"খবরদার, শারিবা, ওলা কথা মুখেৎ আনবুনা। হামি হিঁদু, হামার ঘরোৎ বিষহরির ঘট আছে, হামার বেটা হয়্যে তুইও হিঁদু।

রূপা ফুঁসে ওঠে। তার অজ্ঞাতবাসের জীবনে সে হিন্দুসঙ্গ করেছে, হিন্দু মেয়েকে নিয়ে এখন ঘর করছে। তার সংস্কারের মধ্যে হিন্দুত্ব ঢুকে গেছে। সে বিষহরির গান গায়, ঘটপূজা করে, রাজবংশীদের কালীপূজা এবং গম্ভীরার উৎসবে যোগদান করে। শারিবা চুপ করে থাকে।[৩৫]

রূপার ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পর শারিবাসহ অন্যরা কিছুক্ষণ চুপ থাকে। এরপর ইয়াসিন বলে–

> "ক্যান্ মুছলমান হল্যে দোষ কি। তমো, এ্যাটা কোট ধরা থাকা। 'শালো বাজিকর, শালো বেজাত' আর শোনবা হবু না। বেটাবোটিগুলা বিহার ঘর পাবু, হামরা পামো সমাজ।
>
> এতো সস্তা লয়, এতো সস্তা লয়।
>
> লয় সস্তা তো, আক্রাই হয়লো। কেরমে কেরমে হোবে। মুছলমানের ঘরে ঝামেলা কম, বাছবিচার কম। হামারদের পড়তা হোবে।"[৩৬]

একপর্যায়ে আলাপ-আলোচনা শেষ হয়। সবাই যার যার ঘরে চলে যায়। অন্ধকারের মধ্যে রূপা তার সন্তান শারিবার কাছে এসে বসে। রূপা শুকনো গলায় এক গভীর বিস্ময় নিয়ে শারিবাকে জিজ্ঞাসা করে–

> "তুই মোছলমান হবি?
> কেছু ভাবি নাই।
> ভাবার দোরকার নাই।
> ভাবার দোরকার আছে, বাপ।
> না!
> বাপ, আর কুন্ঠি পালাবু?" [৩৭]

পিতা-পুত্রের এই কথোপকথনের ভেতর দিয়ে আমরা একটা গভীর বেদনা অনুভব করি। রূপার ঔরসজাত সন্তান শারিবা। তারা উভয়ই বাজিকর। বাজিকরের রক্ত তাদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। এক বিশেষ ঘটনায় দেশান্তরী হয় রূপা। এরমধ্যে রূপার স্ত্রী এবং শারিবার মা শা-জাদী তার স্বামীর ফেরার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে ইয়াসিনের সাথে ঘর করা শুরু করে। বহুদিন পর ফিরে আসে রূপা সস্ত্রীক। তার নতুন স্ত্রী শরমী। হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়ে। রূপা-শরমী সাপ খেলা দেখায় বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে। সাপের ঔষধ আর তাবিজ বিক্রি করে। আর সে কারণে রূপা বাজিকর হলেও তার ঘরে বিষহরির ঘট আছে। সে এবং শরমী স্বামী স্ত্রী হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করে। তাই নিজের সন্তানকে মুসলমান না হওয়ার জন্য তার এমন অনুরোধ। শত শত বছরের দুঃখে-কষ্টে, হতাশা-বেদনায়, আনন্দে-বিষাদে, বহু অত্যাচার নির্যাতন, হত্যা-ধর্ষণ সব কিছু সহ্য করে প্রতিকূলতার মধ্যে অনিশ্চিত উন্মুল জীবনে বাজিকররা গোষ্ঠীবদ্ধ থেকেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জমিদার জোতদার অন্যসম্প্রদায়ের সমাজপতিদের শোষণ বঞ্চনা, ক্ষমতাধরদের নানাবিধ অত্যাচার তাদের চলমান জীবনে অপরিসীম ক্ষতি করেছে, বাসস্থান ভেঙে গিয়ে বসতি থেকে উৎখাত করেছে বারবার। আবার তারা ফিনিক্স পাখির মতো সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, দাঁড়িয়েছে। মানুষের জীবনে, বিশেষ করে অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য শিকড়হীন মানুষের জীবনের এ এক অনিবার্য পরিণতি। এত কিছুর পরও বাজিকররা তাদের ঐতিহ্য যুথবদ্ধ জীবনকে টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এখন তাদের সেই

যুথবদ্ধ জীবনের মূলে লেগেছে ভয়ঙ্কর এক ঝড়ের আঘাত। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় হীন বাজিকররা আত্মপরিচয়ের কারণে ধর্মান্তরিত হতে চলেছে। আর তখনই তাদের মধ্যে ভাঙনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে ভাঙন বাজিকর সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে। তার চেয়ে আরো বেশি মর্মস্পর্শী- ভাঙনের বেদনার করুণ সুর বেজে উঠেছে রূপা-শারিবা, পিতা-পুত্রের বিভাজনের মধ্যে।

রূপা নানা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে ইয়াসিনকে মুসলমান না হওয়ার জন্য। কিন্তু ইয়াসিনের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। সে হাজি সাহেবের সাথে পাকাপাকি কথা দিয়েছে। রূপাও বুঝতে পারে ইয়াসিন সর্দারের সামনে বিকল্প কোনো পথ নেই। আবার সেও তাদের সাথে যেতে পারে না। এই কষ্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রূপা মেনে নেয় ইয়াসিনের কথা, কিন্তু সে আন্তরিকভাবে নিষেধ করে তাকে এবং শারিবাকে বাদ দিতে। অতঃপর ইয়াসিন বলেছে–

> "এখুন আসল কথা শোন। হাজিসাহেব হামরার মুরুব্বি হইছেন। বাজিকরের ধরম নাই, জাত নাই। কালীমাই, বিগামাই, ধরতিমাইয়ের কথা মান্‌ষে ভুলি গেছে। এখুন হামার পরামশ্‌শ হয়লো এটা কোট ধইরে লওয়া। হাজিসাহেব শক্ত মানুষ। মোছলমান সমাজে উঁচা-নিচার বাচ-বিচার নাই, ছোঁওয়া-ছানির বিচার নাই। একে আরেকের সাথ একসাথ ওঠবস করে, খানাপিনা করে, বিহা সাদি করে, সব থিকা বড় কথা হামরার জমি হবে। হাজিসাহেব ইসব বাত করিছেন হামার সাথ। হামার বিশ্বাস, তুমার বাপ বাঁচে থাকলে ইতে সায় দিতেন। তুমু না করেন না, উপা বাজিকর।
>
> রূপা দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকে। অনেক আগেই সে এসব চিন্তা করে রেখেছে। হিন্দু ঘরের মেয়েকে সে ঘরে এনেছে। শরমীর ভিতরে হিন্দু সংস্কার প্রবল। সেই সংস্কার রূপার ভিতরে শিকড় গেড়ে বসেছে। শরমীর হাতে শাঁখা তার চোখে নতুন অভিজ্ঞতার পবিত্রতা আনে। তার ঘরে আছে মা মনসার ঘট। তারা আবেগে বিষহরির পালা গায়। এখন আর তার পক্ষে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। এবং শারিবাকেও সে পৃথক হতে দিতে পারে না। ধর্মের বিরোধ সে জানে। রূপা বলে, সর্দার রূপায় যখন আর কেছু নাই, বাঁধা হামি দিমো না। তবি হামাক্ জোরাজোরি করেন না। হামার ঘরণী হিঁদু। হামার ঘর বাদ দেন, শারিবাক্ বাদ দেন।
>
> ইয়াসিন আশ্বস্ত হয়। তবুও গভীর বিষাদ দু'জনকেই আচ্ছন্ন করে। সারাজীবনের জন্য পৃথক হওয়ার প্রস্তুতি নেয় তারা।"৩৮

তারপরও রূপা ইয়াসিনকে বলেছে বাদিয়া, দাই, পাখমারা এরা সবাই বাজিকরের মতো জাত। এরাও মুসলমান হয়েছে, কিন্তু তারা মুসলমান সমাজে সম্পূর্ণ ওঠবস করতে পারে না, বিয়েসাদি হয় না। তার উত্তরে ইয়াসিন বলেছে–

> "ওলা খোঁজখবর করিছি হামি। ইয়ারা শুন্যা মোছলমান। কোরানশরীফ ছুঁয়া, কাল্‌মা পড়্যা মোছলমান হয় নাই। মোছলমান সামাজের সাথ সাথ থাকতে থাকতে মোছলমান হয়াছে। জাতপাতের বিচার নাই, কিরাকাম করে না, নামাজ-রোজা, জুম্মা-জিয়াপৎ কেছুই মানে না। হামরা সিভাবে মোছলমান হচ্ছি না। ষোলই কার্তিক মহরমের দিনেৎ হামরা কলমা পড়ব, মোছলমান হব। তা-বাদে একসাথ নামাজ পড়া হবে, একসাথ খানাপিনা হবে। হাজীসাহেব হামরাদের সাথ পাত পাড়বে, আর আর মোছলমান ইমানদার মানুষ হামরাদের সাথ পাত পাড়বে। হামরা উঁচা হব, হামরাদের জাত হবে।"৩৯

পাশাপাশি বসে থাকা রূপা আর ইয়াসিন দু'জন দুরকম যুক্তিতে আস্থাশীল। রূপা স্বগোক্তির মতো বিড় বিড় করে বলে–

> "হামরাদের জাত হবে! কি হবে তা মাও বিষহরিই জানে। হামি হিঁদু হলাম, তুমু মোছলমান হলেন। হিঁদু হামাক্ জাতে লেয় না, মোছলমান তুমায় জাতে লিবে, সি বিশ্বাস হামার নাই। বহুৎ দেশ দেখা আছে মোর। তবু রূপায় যখুন নাই, যান তুমরা, হন মোছলমান। এখন তো বাঁচেন, দলকে বাঁচান। তা-বাদে মাও বিষহরির মোনৎ যা আছে, তাই হবে। কেবা জানে, হয়ত একদিন তুমার বেটা হামার মাথাৎ ডাং মারবে 'শালো হিঁদু' বলে, আর হামার বেটা তুমার বুকেৎ ফাল্লা বিঁধাবে 'শালো মোছলমান' বলে। জয়, মাও বিষহরি। সন্তানরে দেখেন, মাও।"[৪০]

রূপা বাজিকরের এই কথা শুনতে শুনতে মনে পড়ে যায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের– 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতার সেই বিখ্যাত চরণগুলি–

> "অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
> কাণ্ডারী, আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
> "হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
> কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!"[৪১]

রূপার এই অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ বক্তব্যের মধ্যে বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য আছে। কারণ তাদের অভিজ্ঞতায় আছে হিন্দু মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি। দেশভাগের পূর্বে ১৯৪৬ সালে কলকাতাসহ বিহার, পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে নির্মম দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছে। বাজিকরদের জীবনে তার আঘাত না এলেও শহরে, গ্রামে-গঞ্জে তারা এসব সংঘটিত হতে দেখেছে। সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসকারী এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে পশুর মতো ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করেছে। কোনো ধর্ম, দেবতা, ফেরেশতা তাদের থামাতে পারেনি। সেজন্যে শারিবার কাছে বাজিকরদের মুসলমান হওয়ার কথা শুনে হানিফ কোনো উচ্ছ্বাস দেখায় না। বরং কথাটা শুনে কিছু সময় নিশ্চুপ থেকে শান্ত হয়ে এ বিষয়ে শারিবার সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলে। তাদের বক্তব্য–

> "কিন্তু শারিবা, আমি তোমাদের মোছলমান হবার কথাডা ভাবতেছি। এতে কিবা লাভ হবে? কার লাভ হবে? হিঁদুরই বা কী লাভ? মোছলমানেরই বা কী লাভ? আর বাজিকরেরই বা কী লাভ?
>
> মোছলমানের লাভ হাজিসাহেব জানে। হিঁদুর লাভ জানি না। কেন্তু বাজিকরের লাভ আছে।
>
> আছে?
>
> নাই! বাজিকর যবে থিকা থিতু হাওয়ার বাস্না করল, তবে থিকাই সে সামাজের মানুষের কাছেৎ আপন হবার চায়। কেউ তাক্ আপন করে না। আজ যদি হাজিসাহেব তাক্ আপন করবা চায় তো সি যাবে না?
>
> তুমি ঠিক জানো, হাজিসাহেব তোমাদের আপন করবা চায়?

মোছলমান তো করবা চায়।

মোছলমান করলে তোমরা থিতু হবার পারবা?

হামার নানি বুড়ি বলত, শারিবা, পিত্তিপুরুষের পাপে বেবাক বাজিকর ঘরছাড়া। অভ্যাসে ঘর তারে আর টানে না। কারণ কী, পথেই তার সব, জনম মরণ হাসি কাঁদা। শয় শয় বছর এংকাই চলি গেল। তা-বাদে, দুনিয়ার রাস্তা এক দিন শ্যাষ হয়া গেল। রাস্তাৎ আর সুখ নাই, স্বস্তি নাই। পথে বিপদ আগেও আছিল্, বাদে তা হোল সীমাছাড়া। সামাজের মান্ষে নানাকারণে বাজিকর বাদিয়াকে ছিড়া খায়। তাই আজ তিন-চার পুরুষ ধরা হামরা থিতু হবার চাছি। কেন্তু থিতু হবার চালেই বাজিকর থিতু হবার পারে না। কারণ কী, তার যি ধরম নাই।

ধরম থাকলিই তুমরা থিতু হবার পারবা?

বাজিকরের কাছেৎ হানিফ ভাই, আইজের দিনটা সব থিকা বড় কথা এখুন পয্যন্ত। আইজকার দিনেৎ হামি মোছলমান হয়া বাঁচব। ইয়ার বেশি কেছু জানা নাই।

বাঁচার রাস্তা ইটাও লয়, শারিবা।"[৪২]

হানিফের একথা বলার কারণ তার ব্যক্তিগত জীবনে দাঙ্গার ভয়াবহ অভিঘাতের অভিজ্ঞতা। হিন্দু-মুসলমানের এই দাঙ্গায় খুন হয়েছে তার আপনজন-মা ও ভাই। নিখোঁজ হয়েছে নিজের বোন। ধর্মীয় পরিচয়ের মানুষের পাশবিক আচরণের চিত্র সে ভুলে যায়নি, কখনোই ভুলতে পারবে না। তাই শারিবাদের সমাজের মানুষের মুসলমান হওয়ার খবর তাকে কোনোরকম আশান্বিত করে না। বরং আরেক উদ্বেগের জন্ম দেয় তার ভেতরে। তাই বাজিকরদের ঘরে বসে তাড়ি খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে হানিফ তার অন্তর্গত যন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করে–

> "তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, জাত থাকলে বেজাতও আছে। যার জাত নাই, বেজাতও নাই। তুমরাই ভালো আছেন গো। তুমাদের জাতও নাই, বেজাতও নাই। এই মনে করেন, হামি হলাম মুসলমান জাত, হামার চোখে হিঁদু হলেন বেজাত। হামি বলব, মার শালা হিঁদুকে। ফির হিঁদুর চোখে হামি হলাম বেজাত। মার শালা বেজাত মোছ্লাকে। তাই, মনে করেন তুমরা, হামার মা আর ভাই খুন হয় আর বুন লোপাট হয়া যায়। আর হামি তখন রোলার গড়ায়ে রাস্তা বানাই। আর সি রাস্তায় বেবাক জাত হাঁটে যায়। তুমরাই ভালো আছেন, তুমাদের জাত নাই, তুমাদের বেজাতও নাই।[৪৩]

বাজিকরদের কলমা পড়ে মুসলমান হওয়ার দিন ধার্য হয়েছে, স্থান নির্ধারণ হয়ে গেছে। ধর্মান্তারিত হওয়া নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। পরস্পরের মধ্যে লাভ-ক্ষতির হিসাব আছে। বাজিকর সমাজের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হবে, সে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করার পর বাজিকরদের আদৌ সেরকম কোনো উপকার হবে কিনা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় আছে। তবে এসবকে ছাড়িয়ে বাজিকরদের মুসলমান হওয়ার খবরে মোহর গ্রাম ও বাদা কিসমতের হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। হাজি খেসের যে লক্ষ্যে বাজিকরদের মুসলমান বানাতে চায়, ঠিক সেই কারণেই হিন্দু সমাজের লোকদের মধ্যে আশঙ্কা। ব্রাহ্মণ-কায়স্থসহ সকল বর্ণের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারা নমোশূদ্র সমাজের দিগর প্রধান ভায়রোকে অনুরোধ করে এর বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে। শুধু মোহর ও বাদা-কিসমৎ গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ

নেই এখবর। শহরেও পৌঁছে গেছে। শহরের রাজনৈতিক দলের নেতারা এ বিষয়টিকে নিয়ে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলছে। কারণ সামনে বিধান সভার নির্বাচন। এজন্যে মুসলমান সমাজকে কোনো রকম ক্ষুব্ধ করা যাবে না। আবার হিন্দু নেতারা বিষয়টি মেনে নিতে পারছে না। অর্থাৎ বাজিকরদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি তাদের সমাজ থেকে শহরের রাজনীতি, অর্থনীতি, নির্বাচন সবকিছুকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। উপন্যাসে লেখক এ বিষয়টিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করেছেন–

> "ইয়াসিনের নমোশূদ্র সমাজে অন্তর্ভুক্তির আবদারে যদিও ভায়রোর কিছু করার ছিল না, তবুও বাজিকরদের সদলে মুসলমান হওয়ার পরিকল্পনায় আর দশজন হিন্দুর মতোই সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বামুন-কায়েতরা এ বিষয়ে পরামর্শ করতে তার কাছেই আসে। কিন্তু শক্তিশালী ভায়রোও একেবারে দরজার সামনে দাঁড়ানো বিপদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থার বিধান দিতে পারছে না। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভারসাম্য আছে, বাজিকরদের সদলে মুসলমান হওয়ার ঘটনায় তা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হবে। এতে সবাই চিন্তিত। সবচেয়ে বড় কথা, রেশারেশিতে হাজিসাহেবের দলবল জিতে যাচ্ছে, এর থেকে অপমানকর উত্তেজনা ভায়রোদের কাছে আর কি আছে?
>
> খবরটা শেষপর্যন্ত শহরে গিয়েও পৌঁছায়। সাতষট্টির নির্বাচনের ডামাডোল তখন শুরু হয়ে গেছে। সর্বত্র চরম অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। সামগ্রিক বিচারে থানায় এই মুহূর্তে কোন্ সম্প্রদায় অধিক, তা বলা কঠিন। কিন্তু বিধানসভার আসনটি তপশীল জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। কাজেই শহরের রাজনৈতিক নেতারা এই মুহূর্তে মুসলমান সমাজকে চটাতে কোনোরকমেই রাজি নয়। কিন্তু সঙ্কট উভয়ত। সরকারি হিসাবে যেহেতু এককভাবে তপশীল জাতি ও উপজাতির স্থান এ থানায় প্রথম, রাজনৈতিক নেতারা তাদের তুষ্ট করার জন্য সবচেয়ে বেশি ভাবেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কারণে ভোটের যে ভাগাভাগি হয়, তাতে মুসলমান সমাজকে উপেক্ষা করলে ভরাডুবি হবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। কেননা মুসলমানের সংখ্যা এ থানায় তপশীল জাতির পরেই এবং জয়-পরাজয়ের নির্ধারক বিন্দুটি তাদের ভোটেই স্থিরীকৃত হয়। ভীষণ অস্বস্থিকর পরিস্থিতি। বিষয়টির সমর্থন কিংবা বিরোধিতা উভয় ঘটনাই যে এবার নির্বাচনে ব্যাপক ভূমিক্ষয় ঘটাবে এ বিষয়ে কারো কোনো সংশয় থাকে না।
>
> অথচ এ ঘটনা নিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না। ভায়রো তার সদরের উকিলবাবুকে দিয়ে বয়ান লিখিয়ে স্থানীয় অবস্থাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দুদের দিয়ে সই করায় ও প্রশাসনের কাছে প্রতিকার দাবি করে। তাদের অভিযোগ, জোর করে ও লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ সনাতন ধর্মের প্রতি অবমাননা।
>
> এর পাল্টা হাজিসাহেবের ভাগ্নে মালদা জেলা কোর্টের অত্যন্ত প্রভাবশালী জনৈক আমিনুল হক ছুটি নিয়ে এসে বাদা-কিসমতের আসর জমিয়ে বসে। ফলে এস. ডি. ও-কে একদিন তদন্তে আসতে হয়। ভোটের আগে, বিশেষ করে সাতষট্টির ভোটের আগে প্রশাসন যেমন চতুর নিরপেক্ষতা নেয়, তদন্ত রিপোর্টও তেমনি হয়।"[৪৪]

সামাজিক-রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা, গ্রাম-শহরের হিন্দু নেতাদের নানামাত্রিক শলা-পরামর্শ, প্রশাসনের লোকজনের সতর্কাবস্থান, মুসলমান হতে ইচ্ছুক এবং অনিচ্ছুক বাজিকরদের নানা হিসাব-

নিকাশ, উদ্বেগ-সংশয় এসব কিছুর মধ্য দিয়ে অতঃপর মহর্‌রমের দিন উপস্থিত। তার আগে থেকেই খেসের হাজির নেতৃত্বে সবকিছুর যোগাড় আয়োজন চলছে। মুসলমান পাড়ায় সাজ সাজ রব, উৎসবের আমেজ চারিদিকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। বিশাল ভোজের আয়োজন, তার জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ অন্যান্য জিনিসপত্র আনা হয়েছে। খুবই জাঁকজমক পূর্ণভাবে এ অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে। লেখকের বর্ণনাও খুব নিখুঁত–

> "মহরমের দিন বাদা-কিসমতের মসজিদে ব্যান্ড-পার্টি আসে শহর থেকে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের গণ্যমান্য মুসলমানেরা হাজিসাহেবের অতিথি হয়। প্রায় দুশোজন শিশু, যুবা, বৃদ্ধ নরনারী মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয় কলমা পড়ে। একসাথে নামাজ হয়। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাজিকর মুসলমানদের সঙ্গে পান তামাক বিনিময় করে। প্রত্যেকের নামের মধ্যে কিছু নতুনত্ব আসে। যাদের আগে থেকেই মুসলমানি নাম ছিল, তাদের পদবি বাজিকরের বদলে মণ্ডল হয়। যাদের নামে হিন্দুয়ানির ছোঁওয়া ছিল তাদের নতুন নামকরণ হয়। নতুন লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরা নতুন মুসলমানদের কিরকম বিহ্বল আর নির্বোধ দেখায়। তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু উপহার পায়। ভোজের প্রস্তুতি চলে। বেশ কয়েকটি গরু কাটা হয়েছে। মসজিদের প্রাঙ্গণ লাল নীল কাগজের পতাকায় সাজানো। চতুর্দিকে মুসলমানি উৎসবের হুল্লোড়। তার মধ্যে ম্রিয়মান লাজুক তিনজন মানুষ, যারা এই মুহূর্তে পুরানো অভ্যাস, পুরানো জীবন, পুরানো স্বজনদের ছেড়ে চলে এসেছে। কেননা ছয় ঘর বাজিকর এখনো আগের জীবনকেই শ্রেয় মনে করছে। তারা চোখের জলে বিদায় দিয়েছে স্বজনদের। এরাও চোখের জল মুছেই এখানে এসছে।"[৪৫]

বিপুল আয়োজনের মধ্যদিয়ে উৎসবের মেজাজে বাজিকরদের কলমা পড়ার অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। গ্রাম-শহরের নানা শ্রেণি পেশার মানুষের আলাপ আলোচনার অবসান ঘটেছে, অথবা নতুন কোনো হিসাব-নিকাশ হয়তো শুরু হয়েছে। কিন্তু সে সবের চেয়ে বেশি আলোড়ন চলেছে বাজিকরদের মনের গভীরে। তাদের এই যুথবদ্ধ জীবনে বিভাজনের ভেদরেখা বেয়ে যুগপৎ গড়িয়ে চলেছে অশ্রু আর হৃদয় থেকে ক্ষরিত অদৃশ্য রক্ত। শারিবার মা শা-জাদী হয়েছে মুসলমান আর বাবা রূপা হিন্দু ধর্মাচার পালন করছে। তারা অন্যদিনের মতো বাজিকরদের সমাজে বাস করলেও তাদের মাঝখানে ধর্ম পরিচয় এক অনতিক্রম্য দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছে। শারিবা মহর্‌রমের দিন অন্য বাজিকরদের সাথে কলমা পড়েনি। কারণ সে তখন মারাত্মক আহত হয়ে শহরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। মহরমের দিন অনুষ্ঠানের শেষে সন্ধ্যার দিকে শা-জাদী রূপার ঘরে যায়। অন্ধকার ঘরে দুজনে দাওয়ায় বসে থাকে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে তার একসময়ের স্বামী রূপাকে বলে–

> "জেবনে চাই নাই কেছু, বাজিকর। খালি পর করি দিলা হামাক্! বার বার হামাক্ পর করি দিলা।
>
> শা-জাদি ডুকরে কেঁদে ওঠে। রুপা বলে, শারিবার মাও, বাজিকরের জেবনে দেওয়ার কেছুই নাই। বেবাক ছাড়ি যাবার হয়। বাপ-দাদা-নানা হামরাদের থিতু করবার চালো, থিতু হবার পারি কই হামরা? এক দেশ থিকা আন্ দেশেৎ, এক সামাজ থিকা আন্ সামাজে হামরা যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। হামি ভাবি হামি হিঁদু, তুই ভাবো তুই মোছলমান। আসলে হামরা বেবাকেই সিই বাদিয়া বাজিকরই আছি। দুঃখ করিস না শারিবার মাও, ই হামরাদের পাপের ফল।"[৪৬]

উপন্যাসের শুরুতে শারিবার নানি লুবিনি শারিবাকে যাযাবর বাজিকরদের অতীত ইতিহাসের কথা শোনাচ্ছিল। রহুর হাড়ের মাহাত্ম্য, তার প্রতি বাজিকরদের আস্থা ও বিশ্বাসের কথা, সেই গোরখপুর, শনিবারের ভূমিকম্প, পবিত্র ঘর্ঘরা নদী, তারপর সেখান থেকে বাজিকরদের ক্রমাগত পুবের দিকে চলার ইতিহাস শুনিয়েছিল। আর এখন একান্ত নির্জনে একাকী বসে সে তার মৃত নানির কথা স্মরণ করে, স্মরণ করে তার পূর্বপুরুষদের কথা। সে ভীষণ দ্বিধান্বিত চিত্তে ভাবে– "মুসলমানি ও হিন্দুয়ানিতে বিভক্ত বাজিকরেরা রহুকে বিস্মৃত হয়ে গেছে, একথা এবার সে গভীরভাবে ভেবেছে। হতাশার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে আর রহু চণ্ডালের হাড় খুঁজবে না, একথা বোঝে শারিবা। অনেক চিন্তা করেও সে বুঝতে পারে না, এতে বাজিকরের ভালো হল কি খারাপ হল।"[৪৭]

এই নতুন ধর্ম গ্রহণ বাজিকরদের জীবনে ভালো হলো না খারাপ হলো তা বলতে পারবে একমাত্র ভবিষ্যৎ সময়। কিন্তু শারিবা সুদীর্ঘকালের যাযাবর বাজিকর জীবনের ঐতিহ্য থেকে মুখ ফেরাতে পারছে না। যত হতাশা, গ্লানি, অত্যাচার, অমোচনীয় পাপবোধ, অন্যসমাজের মানুষের কাছে ধর্মহীনতার কটাক্ষ তার সবকিছুকে সে দূরে সরিয়ে রেখে বাজিকর থাকতে চেয়েছে। উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে আমরা দেখি, হানিফের সহায়তায় শারিবা সরকারি বাসের ক্লিনারের চাকরির দরখাস্তের যে জায়গায় ধর্মের কথা লেখা আছে, সেখানে কী লিখবে এ নিয়ে সমস্যায় পড়লে– "হানিফ পরামর্শ দিয়েছিল, যাহোক একটা লিখে দিতে, হয় হিন্দু, নয় মুসলমান। কেন যেন শারিবা রাজি হয়নি। বলেছিল, লিখেন-বাজিকর। বাজিকর!"[৪৮] শারিবা কি হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে আত্মপরিচয়হীন হয়ে অন্য স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো? নাকি রহুর প্রবহমান রক্তের ধারা বেয়ে তার পিতৃ পুরুষের অস্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে সঠিক কাজ করেছে? গভীর আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত শারিবার রক্তাক্ত হৃদয়ের কথা লিখেছেন লেখক পরম মমতায়–

> "রহুকে যারা রক্তের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেই দনু, পীতেম, জামির, এরা কি বাজিকরের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করতে চেয়েছিল, না চেয়েছিল বাজিকর সবার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাক? রুপা কিংবা ইয়াসিন ঠিক কাজ করেছে, না পৃথক অস্তিত্বের দম্ভ নিয়ে শারিবা ঠিক কাজ করছে? এইসব সমস্যার সমাধান এখন খুবই জরুরি। তার বয়স এখন বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। এখনো পর্যন্ত সে বিয়ে করেনি, ঘরসংসার করেনি, যা তার সমাজে এবং পুরো গ্রামসমাজেই আশ্চর্যের বটে। লুবিনি তাকে বলত 'বুঢ়া', বলত সে নাকি পীতেমের থেকেও বৃদ্ধ। অথচ এই বার্ধক্য লুবিনিই সঞ্চারিত করেছে তার মধ্যে। শারিবা শুধু বৃদ্ধ নয়, শারিবা প্রাচীন। তাই শারিবা আলোছায়ায় সঞ্চরমাণ রুহুর মতো বিষণ্ন।"[৪৯]

উপসংহার :

ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন তাঁর 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে একটি বিরাট পটভূমিতে যাযাবর বাজিকরদের জীবন প্রবাহের নিখুঁত বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিকের যুগপৎ দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপন্যাসের আখ্যান বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করা হয়েছে। একটি বিরাট সময়কে এর মধ্যে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক। পাশাপাশি সুবিস্তৃত ভৌগোলিক অবস্থান এখানে উঠে এসেছে। উপন্যাসের আখ্যানভাগে ভারতের উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশে গোরখপুর থেকে শুরু করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব এবং বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সীমান্ত পর্যন্ত বর্ণিত ভৌগোলিক

অবস্থান। এই বিস্তীর্ণ জনপদে প্রায় শতবছরের বেশি সময় ধরে ক্রমাগত পূর্বদিকে চলেছে যাযাবর বাজিকররা। এসময়ে তারা গোরখপুর, ডেহ্‌রিঘাট, সিওয়ান, দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের; সেখান থেকে আরও পূর্বদিকে রাজমহল, মালদা, নমনকুড়ি, রাজশাহী, আমুনাড়া, পাঁচবিবি এবং সর্বশেষে মোহর গ্রামে বসবাস করেছে। কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, কখনো স্থানীয় অন্যসমাজের ক্ষমতাধর মানুষের অত্যাচার-নির্যাতন এবং স্বার্থের কারণে তাদের বসতি থেকে চলে যেতে হয়েছে অন্য কোনো খানে। লেখক খুব চমৎকার বলেছেন, "বাউদিয়া-বাজিকর-পিছনে যা ফেলে যায় তা জানোয়ারের বিষ্ঠা, কে তার কথা স্মরণ করে? যা পরিত্যাজ্য তাই পিছনে ফেলে যেতে হয়। তার কথা মনে রাখার কোনো কারণ নেই।"[৫০] কিন্তু অন্যসমাজের মানুষের চোখে ঘৃণ্য, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, লোভী যাযাবর এই মানুষদের জীবনের কথা, প্রাণের কথা, তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা হতাশা-বেদনা মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাসের কথা লেখক তাঁর বয়ানে উপস্থাপন করেছেন অপরিসীম ভালবাসায়। সুদীর্ঘকাল ধরে ভাসমান উদ্বাস্তু উন্মুল যাযাবর বাজিকররা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে শুধু একটু থিতু হওয়ার চেষ্টা করেছে। তাদের আদি পুরুষ রহুর অস্তিত্বের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে প্রজন্মান্তরে দনু, পীতেম, জামির, ইয়াসিন তারা সকলেই সেই স্বপ্ন দেখেছে আর সেজন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানের জমিদার, জোতদার, সমাজপতিসহ ক্ষমতাধর ভূস্বামীদের শরণ নিয়েছে, কৃপা প্রার্থনা করেছে। একমাত্র লক্ষ্য এক টুকরো জমিতে ছেঁড়া-ফুটো তাবু পরিত্যাগ করে স্থায়ী খুটি পুঁতে বসতি স্থাপন করে সেখানে থিতু হওয়া। কিন্তু বিপুল এই পৃথিবীর বুকে তাদের স্থির বসবাসের জন্য সামান্যতম স্থান নির্ধারিত হয় না। লেখক তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, জীবনের সুদীর্ঘ পথে পূর্বপুরুষের নির্দেশিত পূর্বদিকে চলতে চলতে ভারত এবং পাকিস্তানের (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ) এক সীমান্তবর্তী এলাকা মোহর গ্রামে এসে তারা থিতু হওয়ার আশ্বাস পায়। এরকম আশ্বাস তারা এর পূর্বেও পেয়েছিল বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু তা স্থায়ী রূপ পায়নি। কিন্তু এবারও তারা মোহর ও তৎসংলগ্ন বাদা-কিসমৎ গ্রামে স্থায়ী বসবাসের আশ্বাস পায় এবং মোহর ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার পাশের জমি বাজিকরদের নামে দলিল হয়। তার বিনিময়ে তাদের নতুন ধর্ম পরিচয় গ্রহণ করতে হয়। সুদূর অতীতকাল থেকে যাযাবর বাজিকররা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় পারিচয়ে আবদ্ধ ছিল না। অথচ তারা যে সব অঞ্চলে বা জনপদে বিভিন্ন সময়ে বসবাস করেছে সেখানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের আধিপত্য ছিল। বাজিকররা সবসময়ই এই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য থেকেছে। বার বার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাদেরকে প্রশ্ন করেছে তারা হিন্দু না মুসলমান। এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলে বাজিকররা বরবারই নীরব থেকেছে, কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। অথচ তাদের খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ এমনকি তাদের নামের মধ্যেও উভয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে তারা দুঃখ করে বলেছে হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের আল্লাহ এবং খ্রিস্টানের যিশুর মতো সর্বব্যাপী আশ্রয়দাতা তাদের কেউ নেই। রহুর হাড়ের অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিক শক্তির উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। শতশত বছর ধরে পুরুষানুক্রমে বাজিকররা সেই বিশ্বাসের উপর ভর করে তারা এই পৃথিবীর বুকে থিতু হতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের রহুর সেই হাড় আর পথের দেবতা 'কালামাই' 'বিগামাইকে' ত্যাগ করে কলেমা পড়ে মুসলমান হতে হয়। তাই যাযাবর বাজিকরদের মানব পরিচয়কে পেছনে ফেলে গ্রহণ করতে হয় বিশেষ ধর্মীয় পরিচয়।

তথ্যসূত্র :

১. রঞ্জনা বিশ্বাস, বাংলাদেশের বেদে জনগোষ্ঠীর পরিচয়, চিন্তাসূত্র (ওয়েবম্যাগ) মার্চ-২০, ২০১৬
২. অভিজিত সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩-১৪৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
১৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ -এর দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরবর্তী ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষক সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই তেভাগা আন্দোলন। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের গোড়াতেই তেভাগা আন্দোলনের বিষয়ে কৃষকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে এ আন্দোলন শুরু হয় মধ্য চল্লিশের দশকে। প্রথমদিকে বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি, মুসলিম লীগ-কংগ্রেসের বিরোধিতা, হিন্দু-মুসলিম চাষীদের মধ্যে অনৈক্য প্রভৃতি কারণে আন্দোলন গতি না পেলেও পরবর্তীকালে সমগ্র বঙ্গদেশে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকদের মূল দাবী ছিল উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুইভাগ বর্গাচাষীর এবং একভাগ পাবে জোতদার। '৪৭ এর দেশভাগ, ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতা এবং মানুষের দেশত্যাগের কারণে সংঘটিত এই আন্দোলন সফল হতে পারেনি। তারপরও তেভাগা আন্দোলন শোষিত-নির্যাতিত কৃষকসমাজ তথা শ্রমজীবী সমাজকে জাগিয়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তেভাগা আন্দোলন এক মাইলফলক।
১৮. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর এবং শেষ হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর। যুদ্ধ চলে ৬ বছর ১ দিন। এই যুদ্ধে ভারত মিত্রশক্তির সহযোগী শক্তি হিসেবে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধকালে বৃটিশ সেনা ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যবাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুদ করা হয় ভারতে। তার কারণে ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। একারণে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ এবং তারপরেও ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত থেকে যায়।
১৯. অভিজিত সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০
২২. দেশভাগ হলো ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক বিভাজন। ১৯৪৭ সালে ১৯০ বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের পর অখণ্ড ভারতবর্ষ ভেঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ অনুসারে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। মূলত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে

এই দেশভাগ সংঘটিত হয়। ধর্মের উপর নির্ভর করে এই বিভক্তির কারণে বাংলা ভাষাভাষীর এই বৃহৎ জনপদ অখণ্ড বঙ্গদেশের বিভাজন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এবং পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এরফলে পশ্চিমবঙ্গের বহু বাঙালি মুসলমান তাদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু একইভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য প্রদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়।

২৩. অভিজিৎ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
২৮. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী' ছোটগল্প দেখুন
২৯. সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশত্যাগের সময় বিভিন্ন স্থানে হিন্দু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র বাহিনী পূর্বপাকিস্তানের আনসার বাহিনী, স্থানীয় মুসলিম লীগের লোকজন। পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু রেল স্টেশনে এই দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তার মধ্যে সান্তাহার স্টেশন অন্যতম গণহত্যা ও দাঙ্গা সংঘটিত হয়। অবাঙালি বিহারীরা সান্তাহার রেলস্টেশন দাঙ্গায় অংশ নেয়।
৩০. দেশভাগের পর ভারতে মুসলমানদের সমষ্টিগত শক্তি দুর্বল হয়েছে। সংখ্যা কমেছে। স্থানে স্থানে সংখ্যা বেশি থাকলেও সামগ্রিকভাবে কমে গিয়েছে। বাদা-কিসমৎ গ্রামের কিসমৎ অংশে মুসলমানদের সংখ্যাগত প্রাধান্য থাকলেও দেশভাগের পরে অনেক মুসলমান পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে যায়। ফলে তাদের সংখ্যাগত প্রাধান্য কমে যায়।
৩১. অভিজিৎ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৫
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
৪১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.-২৮৮
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৪৩
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬-২৪৭
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮-২৬৯
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 39-58

স্মৃতিকথায় প্রতিফলিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ

আরমান হোসাইন আজম

পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপক, বাংলা (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা)।

ই-মেইল : ahazam01@gmail.com

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস ব্যাপী পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগী সদস্যরা এ দেশে পরিকল্পিতভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটায়। তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এ জাতির পতন ঘটানোর জন্য যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে নারীদের ওপর শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন চালায়। হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতনের এসব চিত্র যুদ্ধকালীন বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিকথায় প্রতিফলিত হয়। হানাদার বাহিনী তাদের অভিযানের সময়ে ঘটনাস্থলে সকলের সামনে অথবা পুরুষ সদস্যদের হত্যা করে নারীদের ধর্ষণ করে, এরপর তাঁদের অনেককে হত্যা করে। সেনারা নারীদের জোরপূর্বক তুলে নিয়ে সেনা ক্যাম্পে, বাংকারে মাসের পর মাস আটক রেখে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের সময়ে তাঁদেরকে শারীরিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে। যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে সেজন্য তাঁদেরকে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাখে। তাঁরা কেউ অসুস্থ হলে বা গর্ভবতী হলে তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করে। এসব বিষয় স্মৃতিকথার বহু জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। বিহারিরা খুন ও লুটপাটের পাশাপাশি অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করে। রাজাকার আলবদর বাহিনীর সদস্য নিজেরা ধর্ষণে অংশ নেয় এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য নারীকে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেয়। হানাদর বাহিনীর দীর্ঘ সময়ের যৌন নির্যাতনে অসংখ্য নারী গর্ভবতী হয়, অনেকের গর্ভপাত হয় এবং অনেকে যুদ্ধশিশুর জন্ম দেয়। অনেক নারী তাঁদের দুঃসহ জীবনের ভার বহন করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। দেশ ছেড়ে যাবার আগে সেনারা অসংখ্য নারীকে হত্যা করে। হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতনের এসব বিষয় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় কিভাবে রয়েছে তা এ গবেষণা নিবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মূলশব্দ

স্মৃতিকথা, মুক্তিযুদ্ধ, নির্যাতন, ধর্ষণ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, বিহারি, রাজাকার, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র, যুদ্ধশিশু

গবেষণার উদ্দেশ্য

একাত্তরে যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, বিহারি এবং রাজাকার আলবদর বাহিনী এদেশের নারীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। এসব নির্যাতনের চিত্র স্মৃতিকথায় কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থের পাঠবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শিকাগো শৈলী মানা হয়েছে।

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথায় হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতনের চিত্র প্রকাশিত হয়। স্মৃতিকথার তথ্যমতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও তার সহযোগিরা যুদ্ধের নয়মাস পরিকল্পিতভাবে এদেশের নারীদের ওপর নানাভাবে শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন চালায়। তারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে পরিবারের সদস্যদের সামনে অথবা পুরুষ সদস্যদের হত্যা করে ঘটনাস্থলেই নারীদের ধর্ষণ করে, এরপর তাঁদের অনেককে হত্যা করে। নারীদের জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ক্যাম্পে ও বাংকারে মাসের পর মাস আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। সেখানে নারীদেরকে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাখে যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে। ধর্ষণের সময়ে তাঁদেরকে শারীরিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে। ক্যাম্পে বা বাংকারে নারীরা অসুস্থ হলে বা গর্ভবতী হলে তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করে। এসব বিষয় স্মৃতিকথার বহু জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। অনেক স্মৃতিকথায় সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় বিহারিদের খুন, লুটপাট ইত্যাদির পাশপাশি তাদের যৌন নির্যাতনের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ স্মৃতিকথায় রাজাকার আলবদর বাহিনীর সদস্যদের নির্যাতনে অংশ নেওয়া এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য নারীকে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেওয়ার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। স্মৃতিকথার অনেক জায়গায় নারীদের গর্ভধারণ, গর্ভপাত এবং যুদ্ধশিশু জন্মদানের বিবরণ রয়েছে। অনেক স্মৃতিকথায় নির্যাতিত নারীদের আত্মহননের চিত্র রয়েছে। যাঁদের স্মৃতিচারণে একাত্তরে হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতনের চিত্র রয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবু জাফর শামসুদ্দীন, জাহানারা ইমাম, সুফিয়া কামাল, রাবেয়া খাতুন, ফকির আলমগীর, আহমদ রফিক, হাসান আজিজুল হক, নাজিম মাহমুদ, মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, কাজী ফজলুর রহমান, সিরাজ উদ্দিন সাথী, নাসির উদ্দিন, তাদামাসা হুকিউরা, নীলিমা ইব্রাহিম, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, ফতেহ আক্তার, মুস্তফা চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়া কিছু সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে, যেমন: বেগম নূর জাহান সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া,' রশীদ হায়দার সম্পাদিত '১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' এবং 'স্মৃতি: ১৯৭১,' হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র' ইত্যাদি।

একাত্তরের স্মৃতিকথায় নারী নির্যাতন

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর 'জার্নাল ৭১' গ্রন্থে হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতনের স্মৃতিচারণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ কালে গেরিলা যোদ্ধাদের উজ্জীবিত করা, বাংলাদেশের মানুষকে যুদ্ধপরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা ইত্যাদির জন্য তাঁরা ঢাকা থেকে 'স্বাধীনতা' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। পত্রিকার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। একাত্তরের চৌদ্দই আগস্টের পর তাঁদের 'স্বাধীনতা'র দ্বিতীয় সংখ্যা বের হয়। তিনি তখনকার সেই রিপোর্টগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কুতুবের সঙ্গে আলাপ হলো নানা প্রসঙ্গ নিয়ে। নরসিংদী ভৈরব ইউনিটের একটি রিপোর্ট আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। আশুগঞ্জ সাইলোতে হানাদার বাহিনী আড্ডা গেড়েছে। সেখানে আটকে রাখা হয়েছে ৮০-৯০ জন মেয়েকে। অত্যাচার হচ্ছে।' বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর স্মৃতিচারণে সেই মেয়েদের সংগৃহীত কিছু নাম ও আনুমানিক বয়স দিয়েছেন। তালিকাটি হলো –

নাম	বয়স	নাম	বয়স	নাম	বয়স	নাম	বয়স
আফরোজা	১৮	ফিরোজা	১৪	ফরিদা	১৩	ফরহাদ বিবি	২৩
দেলোয়ারা	১৩	নুরজাহান	২০	ফজিলুতেন্নসা	১৪	খুরশিদা	২৩
নজিবন	২১	শাহানা	১৯	পারুল	১৬	নাসিমা	২০
কাওসারী	১৭	লক্ষ্মী	১৮	শাহীদা	২৩	হামিদা	১৭
আসেমা	১৪	ফাতেমা	১৫	মনোয়ারা	২০	মালা	১৭
আয়েসা	১৭	রওশন	১২	বিজয়া	১৭	মিনু	১৬
রাবিয়া	২৭	ফুলচান্দ বানু	১১	কুলসুম	২৪	জায়েদা	১৪
মাহবুবা	১৫	লিলি	১৮	কেয়া	১৬	মিলন	২১
রহিমা	১৭	হেনা	১৮	মুনিরা	২০	রত্না	১৩
রাজিয়া	২৪	গুলজার	২৩	ছাবিরা	১৭	হাফিজা	১৮
অমর্ত্যবিবি	২১	আমিরুতুন্নেসা	২৩	হফজা	১৭		
খাতুন	২০	রোকেয়া	২০	লিনা	১৪		
বীণা	১৬	মিনু	১৭	মাহফুজা	২৩		

তিনি লিখেছেন এসব মেয়েকে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছিলো। তাদের অনেকেই গর্ভবতী।[১]

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর যাত্রাপুরের একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। যাত্রাপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাঁর মেয়েকে ২৫০০ টাকা ঘুষ দিয়ে ছাড়িয়ে আনেন। ঘটনাটি তার মুখ থেকে শোনা। সেখানে দুইজন হানাদার সৈনিক দশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়েকে শ্লীলতা হানির জন্য ছিনিয়ে আনে। মেয়েটিকে উলঙ্গ করার পর দেখে তার যোনিদার খুব ছোটো। তাতে তাদের আশা চরিতার্থ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সৈনিকেরা ভাবনায় পড়ে। চট করে একজন বুদ্ধি দেয় যোনিদ্বার কেটে বড়ো করে নেওয়া যেতে পারে। ভাবনার সাথে সাথে কাজ। একজন বেয়োনেট দিয়ে যোনিদ্বার কেটে নেয়। এরপর মেয়েটির ওপর চলে পাশবিক নির্যাতন। অবশেষে মেয়েটি মারা যায়। মেয়েটির লাশ তারা মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়।[২]

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিচারণে আরেকটি ঘটনা তুলে ধরেছেন– হানাদার বাহিনী বিশ্বগুদামের একটি ঘরে দশ/বারো জন বন্দীকে এনে দাঁড় করায়। কিছুক্ষণ পর তারা নামের একজন উলঙ্গ যুবতীকে নিয়ে আসে। কলেজের শফি নামক একজন বন্দী ছাত্রকে সকলের সামনে উক্ত নারীকে পাশবিক নির্যাতন করতে বাধ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নারীর ওপর বলাৎকারের অপরাধে সকলের সামনে শফির বিচার করে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় শফিকে প্রাণদণ্ড দেয়। ঐ ঘরেই একটি পাথরের ওপর শফির পুরুষাঙ্গ রেখে আরেকটি পাথর দিয়ে ছেচে তাকে হত্যা করে। এরপর শুরু হয় মেয়েটির বিচার। তার যোনিদ্বার দিয়ে আস্ত কচু ঢুকিয়ে দেয়। এরপর লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে তাঁকে হত্যা করে।[৩]

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তাঁর সহকর্মী মীরার ওপর হানাদার বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের স্মৃতিচারণ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মীরা ছিলো নিবেদিত প্রাণ। ঢাকায় লিফলেট প্রচার করা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য টাকা তোলা, ওষুধ সংগ্রহ করা, পত্রিকা বিলি করা ইত্যাদি কাজে সব সময় সে ছুটে বেড়িয়েছে। একসময় মীরা গ্রামের বাড়ি যায়। সেখানে হানাদার বাহিনী তাকে নির্যাতন করে। সে অন্তঃসত্ত্বা হয়। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লিখেছেন –

> "মীরা এসেছে বাড়ি থেকে। ধ্বংসের দাগ লাগা চেহারা। জিজ্ঞেস করলাম গ্রামের অবস্থা। বলল, আমার মতন। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। প্রথমে এসেই ফরিদাদের পরিবারের সঙ্গে; ফরিদা রাজনৈতিক কর্মী, ফরিদার স্বামী নুরুর রহমান কৃষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত। পরে রীনা মিনুদের সঙ্গে কাজ করছে, কাগজ বিলি করছে, টাকা তুলছে, কাপড় যোগাড় করছে। কাজ সেরে বাসায় চুপ করে বসে থাকে। কী হয়েছে মীরার?"[৪]

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর মীরা প্রায়ই অসুস্থ থেকেছে, বিছানায় শুয়ে কেঁদেছে। তিনি সমস্যার কথা জানতে চেয়েছেন। সে বলেনি, কেবল বিষণ্ন হাসি হেসেছে। বিষণ্নতার মধ্যেও মীরা দেশের জন্য, মুক্তিযুদ্ধের জন্য কাজ করেছে। কিন্তু হানাদার বাহিনীর পাশবিকতা তার জীবনের মোহ, বেঁচে থাকার মোহ শেষ করে দেয়। ভোরে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আজুদের বাসায় মীরাকে দেখতে যান। জিজ্ঞেস করেন, 'মীরা কেমন?' আজু তাকে বলে, 'মীরা নেই। ... মারা গেছে। ... মীরা অন্তঃসত্ত্বা ছিলো। জন্তুরা বাড়িতে ওর ওপর অত্যাচার করেছে।' মীরার মৃত্যুকে তিনি সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। তার স্মৃতিচারণ করে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লিখেছেন –

> "যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, যতোদিন আমার লেখা বেঁচে থাকবে, ততোদিন উদ্যত থাকবে আমার অভিশাপ – জাহান্নামে তোমাদের স্থান। বাইরে বৃষ্টি, মীরার চোখে মশাল জ্বলছে, অনির্বাণ, শাদা শিখা জ্বলছে পুড়ে যাচ্ছে পাপ আর অসম্মান। মীরা আমরা পরাজিত হবো না, মীরা আমরা বেঁচে থাকবো, মীরা আমরা প্রতিষ্ঠা করবো – স্বাধীনতা।"[৫]

একাত্তরের ৮ই নভেম্বর সামরিক বাহিনীর লোকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে ঢুকে নির্যাতন, লুটপাট এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়। অনেকে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। যেমন– আবু জাফর শামসুদ্দীন, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, জহুরুল হক প্রমুখ। আবু জাফর শামসুদ্দীন 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে ১৬.১১.৭১ তারিখে ঘটনার স্মৃতিচারণে লিখেছেন–

> "বিগত সোমবার (৮.১১.১৯৭১) রাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে সামরিক বাহিনীর লোকজন ঢুকে হলের ৩০ জন মেয়ে , হাউস টিউটর, প্রভোস্ট মিসেস আখতার ইমাম এবং তাঁর দুই কন্যার ওপর নির্যাতন চালায় এবং তাঁদের জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এ অত্যাচার চলে। মেয়েদের চিৎকার সত্ত্বেও, দেয়াল সংলগ্ন ভাইস চ্যান্সেলের গৃহ প্রহরারত সামরিক বাহিনীর লোক এবং টহলদার বাহিনী ওদেরকে উদ্ধার করেনি।"[৬]

এই ঘটনাকে পরের দিন "রোকেয়া হলে ডাকাতি" নাম দিয়ে সংবাদপত্রে ছাপা হয়।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর একই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি ইংরেজি বিভাগের একজন ছাত্রী পারভিনের কাছ থেকে শোনা ঘটনার বর্ণনা থেকে লিখেছেন–

> "মনে পড়ছে রোকেয়া হলের বীভৎস কাণ্ড। মধ্যরাত্রে দখলদার সৈন্য, রাজাকার, পশ্চিমা পুলিশ আর অবাঙালি গুন্ডারা মিলে হলের ভিতর ঢোকে মিলিটারি ট্রাক নিয়ে। ইলেক্ট্রিক তার কেটে দেয়; দোতলায় গিয়ে ওঠে; আর সেই ঘটনার বিবরণ শোনা গেছে পারভিনের কাছ থেকে। ইংরেজির ছাত্রী। কুড়াল দিয়ে দরজা ভেঙে পারভিনদের কামরায় ঢোকে প্রথম, সবকিছু কেড়ে নেয়, পরে পারভিনদের গলা টিপে ধরে, পারভিনকে দিয়ে প্রতিটি কামরা খোলায়, দুই ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চলে। মেয়েরা চেঁচিয়েছে, রাতে ধ্বনিত হয়েছে চিৎকার, কেউ আসেনি। উপাচার্য ভবনে পুলিশ প্রহরা, একটু দূরে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি, রাস্তায় টহলদার সৈন্য, কেউ নাকি শোনেনি ঐ আর্ত চিৎকার! সবটাই পরিকল্পিত, বাঙালি মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করার কৌশল, অধিকৃত বাংলাদেশে মেয়েদের নসীব।"[৭]

জাহানারা ইমাম 'একাত্তরের দিনগুলি' গ্রন্থে বাংলাদেশের নারীদের ওপর হানাদার বাহিনীর নির্বিচার নির্যাতনের স্মৃতিচারণ করেছেন। রাজশাহী থেকে যাওয়া ডাক্তারদের কাছে তিনি রাজশাহী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা ধর্ষিতা নারীদের বিবরণ শুনেছেন। ২রা জুলাইয়ের ডায়েরিতে তিনি সেগুলো লিখেছেন। ডাক্তাররা তাঁকে বলেছেন, 'সাধারণ কোনো রোগী বহুদিন হাসপাতালে কেউ আনেনি, এনেছে গুলি খাওয়া, বেয়নেট খোচানো, হাত পা উড়ে যাওয়া রুগী। আরো একরকম রুগী হাসপাতালে লোক আনতো, তারা আমাদের জীবনের ব্যথা হয়ে আছে।' জাহানারা ইমাম লিখেছেন–

> "তারা ধর্ষিতা মহিলা। অল্প বয়সী মেয়ে থেকে শুরু করে প্রৌঢ়া, মা, নানী, দাদী। তাঁরা অনেক বুড়ি মহিলা বাড়ি বাড়ি থেকে পালাননি, ভেবেছেন কিছুই হবে না। অল্পবয়সী মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরা থেকেছেন, এসব বুড়ি মহিলাদেরকেই পাকিস্তানি পাষণ্ডরা ধর্ষণ করেছে। এমন একজন মহিলা রোগী গিয়েছিলেন হাসপাতালে যিনি নামাজ পড়ছিলেন। সেখানেই তাঁকে টেনে হিচড়ে ধর্ষণ করে। আরেক মহিলা কুরআন শরীফ পড়ছিলেন, শয়তানরা কুরআন শরীফ টান দিয়ে ফেলে দিয়ে তাঁকেও সেখানেই ধর্ষণ করে।"[৮]

রাবেয়া খাতুন 'একাত্তরের নয় মাস' গ্রন্থে এপ্রিল মাসে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতনের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> "জ্বলন্ত জনহীন গ্রামের এক বাড়ির আঙিনায় এক অসহায় তরুণী দাঁড়িয়ে। কাছে একদল শকুনী । না, এক দল নয়, দু'দল। এক দলের সর্বাঙ্গে খাকি পোশাক। কাঠে ঝিলিক দিচ্ছে হিংস্র বেয়নেটের কিরিচ। আর এক দলের শক্ত ঠোঁট থেকে ঝরছে লালা, কতোক্ষণে মেয়েটি মরবে...। ... নালার ঘোলা পানি ও পাংশুটে কাদায় আধ-গোঁজা হয়ে আছে স্ত্রী অঙ্গের বিভিন্ন অংশ . . . পাছা কাটা, বুক কাটা, মরা, আধমরা কয়েকজন তরুণী পড়ে আছে শিমুল তলায়। ঝরা ফুল আর নারী দেহের নিঃসৃত রুধির একাকার"...[৯]

নাজিম মাহমুদ 'যখন ক্রীতদাস: স্মৃতি ৭১' গ্রন্থে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ধর্ষণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিক্ষকদের স্ত্রীদের সমর্থনের একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সমর্থক শিক্ষকদের চোখে সেনাবাহিনীর সবরকম দুষ্কর্ম 'সময়োচিত সঠিক কাজ' বলে বিবেচিত হয়েছে। এসব মানুষের কাছে গণহত্যা ছিলো জিহাদ, পাকিস্তান তথা ইসলাম রক্ষার জন্য অপরিহার্য। আইন বিভাগের জনৈক অধ্যাপক বেশ জোরেশোরেই বলতেন, জিহাদ শুরু হয়ে গেছে, অতএব নরহত্যা জায়েজ। হিন্দু, হিন্দু ভাবাপন্ন, নাস্তিক কম্যুনিস্ট এবং ভারতের আগ্রাসন ঠেকাতে হবে– এই ছিলো তাদের স্লোগান। মে মাসের শেষে দুই জন দালাল শিক্ষক বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে সাফাই সাক্ষ্য দেন। তাদের অনেকের স্ত্রীরাও তখন পাকিস্তান প্রেমে অন্ধ। নাজিম মাহমুদ শুনতে পান পাকিস্তান সমর্থক এমন একজন স্ত্রী পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর ধর্ষণকর্মে সমর্থন দিয়ে বলেন, 'উপায় কি, হাজার মাইল দূরে স্ত্রীদের ফেলে তারা দেশের জন্য লড়ছে।'[১০]

হাসান আজিজুল হক 'একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা' গ্রন্থে খুলনার কোনো বাড়িতে নারীদের ধরে এনে তাঁদের নির্যাতনের স্মৃতিচারণ করেছেন। সে বাড়িটি ছিলো একটি নরক। সেখানে ছিলো অসংখ্য মেয়ে। গ্রাম থেকে ধরে আনা গৃহবধূ, কুমারী। নানা ধরনের মেয়ে। নিষিদ্ধ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে বেশ কিছু কলেজের ছাত্রীকেও ধরে এনে সে বাড়িতে রাখা হয়। মেয়েদের মধ্যে একজন ছিলো ফুলতলার শান্তি দাস। হানাদার বাহিনী তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। হাসান আজিজুল হক লিখেছেন, 'আমি শুনেছি এই মেয়েটি চব্বিশ ঘণ্টা একটি সেমিজ আর ব্রেসিয়ার পরে থাকতো।'

হাসান আজিজুল হক লিখেছেন শান্তিকে হানাদার বাহিনী শেষ পর্যন্ত হত্যা করে। কিন্তু হত্যার পূর্বে সামরিক বাহিনী তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে বেতারে প্রচার করে, 'শান্তি সুখে আছে।'[১১]

কাজী ফজলুর রহমান 'দিনলিপি একাত্তর' গ্রন্থে হানাদার বাহিনীর লাঞ্ছনার হাত থেকে সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য একজনের নিজের মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করার ঘটনার স্মৃতি চারণ করেছেন। তিনি ১৮ই অক্টোবর চট্টগ্রামে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে তাঁর গ্রামের এ ঘটনার বিবরণ শোনেন। ঐ গ্রামে এক বিধবার দুই যুবতী মেয়ে ছিলো। রাজাকারেরা পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে সে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে হামলার সময় তাদের দেখে। দেখেই হায়েনাদের লোভ হয়। তারা ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সেই গ্রামেরই

দুই জন রাজাকার পাঠিয়ে দেয় মেয়ে দুটি ধরে আনার জন্য। সেখানে বিধবার সকল আকুতি ব্যর্থ হয়। এরপর বিধবা মহিলা একটি ধারালো দা নিয়ে বের হয়ে আসেন। রাজাকাররা তাকে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু তার আগেই বিধবা মেয়ে দুটিকে দা দিয়ে কুপিয়ে মেরে নিজে মরতে আসে। রাজাকাররা তিনটি মৃতদেহই চট্টগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যায়।[১২]

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ কাজী ফজলুর রহমান চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারে নারী নির্যাতনের কথা লিখেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফেরার চেষ্টা করেন। তখন তিনি ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন। ভারতীয় অফিসাররা তাঁকে বিষয়গুলো জানান। সেখানে পাকিস্তানি সেনারা বাংকারে বাংকারে বাঙালি নারীদের নির্মমভাবে নির্যাতন করে। পাকিস্তানি সেনারা চলে যাবার পর তাদের প্রতিটি বাংকারে, ঘাঁটিতে মেয়েদের মৃত দেহ পড়েছিলো। জীবিত অবস্থায় এসব মেয়েরা নানা বিকৃত কামনার শিকার হন। আত্মসমর্পণ করে পালিয়ে যাওয়ার আগে সেনারা তাদেরকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। ভারতীয় একজন অফিসার কাজী ফজলুর রহমানকে বলেন, 'একটা বাংকারে সে তিনটি মহিলাকে পেয়েছে যাদের গায়ে এক টুকরো কাপড় ছিল না এবং বেঁধে রাখা হয়েছিলো। হয়তো পালানোর আগে হত্যা করার সময় পায়নি।'[১৩]

জহুরুল ইসলাম বিশু 'পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা' গ্রন্থে পাবনায় সিঙ্গা বাজারের মন্দিরের পিছনে পালপাড়ায় ৮ই মে'র গণধর্ষণের স্মৃতিচারণ করেছেন। সেখানে দালালরা কাফের হত্যার কথা বলে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে নিয়ে পালপাড়ায় প্রবেশ করে। তারা পালপাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর ১০-১২ জনকে হাত পা বেঁধে নির্মম অত্যাচার করতে থাকে। বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে হানাদার বাহিনীর সদস্যরা সেই পরিবারের তিন-চারটি মেয়েকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণ করে। তাদের গগনবিদারী চিৎকারে পাষণ্ডদের মনে সাধারণ কোনো অনুকম্পা জাগাতে পারেনি। তারপর তাদেরকে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে চলে যায়। ভয়ংকর অবস্থা দেখে এলাকার মানুষ পালিয়ে যায়। কয়েকদিন ধরে শিয়াল, কুকুর, শকুন মিলে পচা গলা লাশগুলো খেয়ে ফেলে।[১৪]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে তাদের দোসর দালালদের মেয়েরাও অনেক সময় রেহাই পায়নি। জহুরুল ইসলাম বিশু এরকম একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পাবনায় প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করে। সন্ধ্যার পর দালালদের সঙ্গে নিয়ে যেসব বাড়িতে সুন্দরী মেয়ে আছে সেসব মেয়েকে ক্যাম্পে ধরে আনে। ক্যাম্পে আটকে রেখে দিনের পর দিন তাদের ওপর নির্যাতন করে। একদিন পাবনার দিলালপুর এলাকার এক দালালের বাড়িতে পাবনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার দাওয়াত খেতে আসে। তখন তার সুন্দরী মেয়ের ওপর আর্মি অফিসারের নজর পড়ে। এরপর থেকে আর্মি অফিসার প্রায় রাতে চলে আসতো ওই বাড়িতে। কোনো আর্মি সিপাই বা অন্য কারো ঐ বাড়িতে যাওয়া নিষেধ ছিলো। এ আইন জারি করার পর দালালরা নাকি বলেছে, 'ওই আর্মি অফিসার খুব ভালো লোক, তিনি শরীয়ত মোতাবেক কাজ করছেন।'[১৫]

নাসির উদ্দিন 'যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা' গ্রন্থে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি সেনারা ৩ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের স্ত্রী-কন্যাদের নির্যাতনের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২৭শে মার্চ পাকিস্তান আর্মির রাতভর উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে ক্ষতবিক্ষত ক্যাপ্টেন আনোয়ার সকাল ১০টার দিকে তাঁর অসম বাহিনী নিয়ে সৈয়দপুর সেনানিবাস ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। আর তখনই পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি সেনাদের পরিবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নাসির উদ্দিন লিখেছেন–

> "সৈয়দপুরে ভোর থেকেই আক্রমণের পর আক্রমণ চললো ৩ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্ষুদ্র দলটির ওপর। সেই সাথে হত্যা করা হলো সেনানিবাসে বিভিন্ন ইউনিটের বাঙালি সেনা সদস্যদের। ধর্ষণ থেকে কোনো বাঙালি মহিলাই রেহাই পেলো না। এমনকি বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের স্ত্রী কন্যারাও না। ৩ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার তরুণ বাঙালি ক্যাপ্টেন আশরাফের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিকেরা তাদের অফিসারদের উপস্থিতিতেই লাঞ্ছিত করে। একইভাবে ধর্ষিতা হলেন ২৩ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট সালামের স্ত্রী। মানবতা, ধর্মানুরাগ কিংবা ন্যূনতম রুচিবোধ– কোনো সুকুমার উপলব্ধিই তাদেরকে এই জঘন্যতম পাপাচার থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।"[১৬]

আহমদ রফিক 'একাত্তরের পাকবর্বরতার সংবাদভাষ্য' গ্রন্থে একাত্তরের দেশীবিদেশী বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন, গণহত্যা ও অবৈধ যৌনাচারের স্মৃতিচারণ করেছেন। ২রা আগস্ট, ১৯৭১ -রের 'নিউজউইক' পত্রিকার রিপোর্ট থেকে তিনি বলেছেন–

> "গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল ঐ হতভাগ্যদের একজন যে শরণার্থীদের প্রতি ইয়াহিয়া ক্ষমা ঘোষণার কথা শুনে তক্ষুনি পায়ে হেঁটে তার গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সঙ্গে দুই কিশোরী কন্যা। দীর্ঘপথের যাত্রায় পরিশ্রান্ত গোবিন্দ মণ্ডল জলাভূমি, আগুনে পোড়া গ্রাম পার হয়ে তার বাড়ির কাছে পৌঁছতেই পাকসেনারা তাকে বাধা দেয়। এরপর অসহায় হতাশা নিয়ে তাকে দেখতে হয়, 'পাকসেনারা তার কিশোরী কন্যাদের ধর্ষণ করছে, ধর্ষণ করছে, ধর্ষণ করেই চলেছে।"[১৭]

বীরাঙ্গনাদের স্মৃতিচারণ

তাদামাসা হুকিউরা 'রক্ত ও কাদা ১৯৭১' গ্রন্থে কুমিল্লার চারজন বীরাঙ্গনার সঙ্গে কথোপকথনের স্মৃতিচারণ করেছেন।[১৮] ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ হুকিউরা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফিরছিলেন। হাতিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন কুমিল্লার বাড়ি থেকে আহমেদের বড়ো বোন আর ভাগনেকে তাদের গাড়িতে করে ঢাকায় নিয়ে যেতে। এজন্য হুকিউরা আহমেদের বাড়িতে যান এবং এক সময়ে আহমেদের বোনকে জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধ চলাকালে কুমিল্লায় এক হাজার জনের মতো মহিলাকে পাকিস্তানি সেনারা অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার গুজবটি সত্যি কি না। উত্তরে আহমেদের বোন বলেন, 'সঠিক সংখ্যা বলতে পারি না, তবে ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিলো। আমাদের এ বাড়িতে দুদিন ধরে চারজন মহিলা আছেন, তাঁরাও সেভাবে আটক ছিলেন।' হুকিউরা এই চারজন মহিলার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি সেই কথোপকথনের স্মৃতিচারণ করেছেন। মি. আহমেদের বোন সেই চারজন

মহিলাকে দোতলা থেকে নিয়ে আসেন। তাঁদের চারজনই আপাদমস্তক কালো বোরকা দিয়ে ঢাকা। হুকিউরা দেখে বুঝতে পারেন তাঁরা চারজনই অন্তঃসত্ত্বা। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন তাঁদের বয়স যথাক্রমে ২৬, ২২, ২১, ১৯। সবাই বিবাহিতা। ২৬ বছর বয়সী মহিলা এক কলেজে পড়ান। বাকি তিনজন গৃহবধূ এবং প্রত্যেকে তিনজন বা তারও বেশি সন্তানের মা। পাকিস্তানি সেনারা এপ্রিল মাসে খুলনা, রাজশাহী, সৈয়দপুর ও বগুড়া থেকে তাঁদেরকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আনে। কাপড় ছিড়ে গলায় ফাঁস দিয়ে যাতে মরতে না পারে সেজন্য সেনারা মেয়েদেরকে পরার জন্য কোনো কাপড় দিত না। দিনের বেলা একটা তোয়ালে এবং রাতে কম্বল দিত। গোসলের সময় তিনজনকে এক দড়ি দিয়ে বেঁধে পাকিস্তানি সেনারা দড়ির অপর প্রান্তে ধরে পুকুরে নামিয়ে গোসল করাতো। আটককৃত চারজনের দু'জন তাঁকে জানায়, পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আটককৃত মহিলাদের মধ্যে কেউ আত্মহত্যা না করলেও যাঁরা সেনাদের কথা শোনেনি তাঁদের কয়েকজনকে সেনারা হত্যা করে। আর এটা করেছে– পাকিস্তানি সেনাদের ইচ্ছে মতো না চললে একইরকম পরিণতি হবে তা দেখানোর জন্য।

তাদামাসা হুকিউরা লিখেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদের বাড়িতে দেখা চারজনের সবাই বলেছেন, ''এতো অপমানকর ও লজ্জাজনক ভাগ্যের শিকার হয়ে স্বামী ও পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়া তাঁদের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। তাঁরা চান ভারত বা দূরবর্তী অন্য কোনো দেশে গিয়ে বাকি জীবন কাটাতে।''[১৯]

আবু বকর সিদ্দিক 'একটি স্বস্তিকর মৃত্যুসংবাদ ও অবরুদ্ধ যুদ্ধদশা' শিরোনামে *শৈলী*, ১৯৯৮, ঈদ সংখ্যায় বাগেরহাটে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ষিতা একজন নারীর স্মৃতিচারণ করেছেন। গোটাপাড়া এলাকায় নকশাল বাহিনীর আমিনকে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন যাতে হিন্দুপাড়ার মেয়েদের ওপর কোনো অত্যাচার না হয়। কিন্তু সে তার দলবল নিয়ে সারারাত ধরে মেয়েদের ওপর নির্যাতন করে আর লুটপাট করে। তিনি লিখেছেন, ১১ই মে বেলা বারোটার মতো। তখন তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির বড়োকামরায় বসে আলোচনা করছিলেন কিভাবে লুট ঠেকানো যায়। সেখানে নকশালের আমিন উপস্থিত ছিলো। তাকে তিনি বলেন, 'অমূল্যদাসের মাইয়ে কৃষ্ণা বাগেরহাটের নামকরা ডাক্তার অরুণ নাগের পুতির বৌ আমাদের আশিষের বৌ। আবার অনিল মল্লিক তার ফ্যামিলি লয়ে আ'সে উঠিছে ওই বাড়ি। এরা কিন্তু গোরাইদার লোক। কাজেই অবশ্যই এট্টু লক্ষ্য রাহিস। তোর তো বিরাট দলবল।' কিন্তু ১২ তারিখ অমূল্যদাসের বাড়ি যেয়ে কৃষ্ণার মুখে শুনতে পান আমিন তার দলবল নিয়ে সারারাত তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। আবুবকর সিদ্দিক লিখেছেন–

> "চাপা আবেগের মুক্তি দিয়ে ফেটে পড়ে কৃষ্ণা, 'স্যার দোহাই আপনার। আমারে আজই এহনই আমার স্বামীর ধারে নিয়ে যান। আর একরাতও এহানে থাকপো না আমি।' আমি কঠিন দৃষ্টিতে তাকাই ওর দিকে। চাবুকের মতো প্রশ্ন করি, 'কেন? রাতে কি কোনো ক্ষতি হয়েছে আপনার?' অবুঝ বালিকার মতো ও শুধু কেঁদে চলে। আমি পেশাদার ইন্টারোগেটরের মতো প্রশ্ন করে চলি, 'বলুন?'। কৃষ্ণা ডুকরে কেঁদে ওঠে, "আমার যথাসরবোনাশ হয়ে গেছে রাত্তিরে।"[২০]

আবুবকর সিদ্দিক বিষয়টি আরো পরিষ্কার হন কৃষ্ণার কাকা সুনীলবাবুর কাছে। তিনি জানান, রাতে বৃষ্টির মধ্যে আমিন হাজির বাহিনী নিয়ে আসে। সে আবুবকর সিদ্দিকের বরাত দিয়ে বাড়িতে ঢোকে। তারা এদিক ওদিক তাকিয়ে শুরু করে লুট আর ধর্ষণ। সুনীলবাবু আবুবকর সিদ্দিককে বলেন, 'তারপরে হঠাৎ পড়ল রে ঝাঁপায়েসব দাও লাঠি লয়ে। ছিদেম লুট! আর সেই সাথে ফ্রি স্টাইল রেপ। ছুড়ীথে বুড়ী– বাদ রাখিচ্ছে এ্যাটটারেও?'[২১]

নীলিমা ইব্রাহিম 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থে একাত্তরে বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে ও বাংকারে হানাদার বাহিনীর নির্যাতিত কয়েকজন বীরাঙ্গনার স্মৃতিচারণ প্রকাশ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি বন্দীরা যখন ভারতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে নীলিমা ইব্রাহিম তখন জানতে পারেন প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ধর্ষিত নারী বন্দীদের সঙ্গে দেশ ত্যাগ করছেন। তিনি অবিলম্বে ভারতীয় দূতাবাসের সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার অশোক ডোরা এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত নুরুল মোমেন খান মিহিরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেসব নারীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তৈরি করেন। তাঁদের নির্মম অভিজ্ঞতাগুলো তিনি সংগ্রহ করেন। পরে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে হানাদার বাহিনীর নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের আরো বিস্তৃত চিত্র পান। ধর্ষিত নারীরা তাঁদের ওপর নির্যাতন এবং নির্যাতন পরবর্তী সামাজিকভাবে তাঁদের অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ দেন। সে অভিজ্ঞতাগুলো নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

রাজশাহীর মেয়ে তারা। তারা বর্ণনা করেছেন, ২৬শে মার্চ রাজশাহীতে কারফিউ ছিলো। এর মধ্যেই তাঁদের বাড়ির চারদিকে কিছু লোককে ঘুর ঘুর করতে দেখেন। সামান্য হাতব্যাগ নিয়ে তাঁরা গ্রামের বাড়ির দিকে রওনা দেন। রাস্তায় গাড়ি রিকশা কিছুই নেই। হঠাৎ স্থানীয় চেয়ারম্যানের জিপ এসে থামে তাঁদের সামনে। তাঁর বাবাকে সম্বোধন করে বলেন, 'ডাক্তার বাবু আসেন আমার সঙ্গে। কোথায় যাবেন নামিয়ে দেবো।' তাঁর বাবা আপত্তি করায় চার-পাঁচ জনে ধরে তারাকে টেনে জিপে তুলে নিয়ে যায়। তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে দেখেন তিনি থানায়। সামনে বসা আর্মি অফিসার। দেখেন সেখানে আরো ২-৩টি মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সন্ধ্যার কিছু আগে চেয়ারম্যান সাহেব আসেন। সবকিছু জেনেও তারা চেয়ারম্যান সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে বলেন, 'কাকাবাবু, আমাকে বাবার কাছে রেখে আসুন। ছোট্টবেলা থেকে আপনি আমাকে চেনেন। আপনার মেয়ে সুলতানার সঙ্গে আমি খেলাধূলা করেছি, স্কুলে পড়েছি। আমাকে দয়া করুন।' চেয়ারম্যান তাঁকে ঝাড়া দিয়ে দূরে সরিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। তারা উৎসর্গিত হয় মানুষ নামের পশুদের খাচায়। ১৬ই ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত সে আর মানুষ দেখেনি। তারা বর্ণনা করেন–

> "প্রথম আমার ওপর পাশবিক নির্যাতন করে একজন বাঙালি। আমি বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। অসুস্থ দুর্বল দেহ, যুদ্ধ করতে পারলাম না। লালাসিক্ত পশুর শিকার হলাম। ওই রাতে কতোজন আমার ওপর অত্যাচার করেছিলো বলতে পারবো না, তবে ছয় সাত জনের মতো হবে। সকালে অফিসারটি এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখলো, তারপর চরম উত্তেজনা, কিছু মারধরও হলো। ... মনে হয়েছিলো আমি কেনো তার চরণে

প্রথম অর্ঘ্য হলাম না, এটাই তার ক্ষোভ, কিন্তু সে তো তার অক্ষমতা। আমি তো জড় পদার্থ, অনুভূতি প্রায় শূন্য। কয়েকদিন পর্যন্ত আমার মস্তিষ্ক মনে হয় কাজ করেনি। যন্ত্রের মতো যা দিয়েছে খেয়েছি, যে যেখানে টেনে নিয়ে অত্যাচার করেছে সয়ে গেছি। সামর্থ্য হলে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করেছি 'জয় বাংলা।' যদি কারও বোধগম্য হয়েছে তাহলে কিছু থুতু, কিছু লাথি উপহার পেয়েছি। ... এবার আমি যেখানে আছি ওখানে প্রায় আটদশ জন মেয়ে ছিলো। বয়স তেরো থেকে ত্রিশ অথবা আরও বেশি। তবে এরা সবাই গ্রামের। একটা শহরের শিক্ষিতা মেয়ে দেখেছিলাম, সামান্য কথা বলার সুযোগও পেয়েছিলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়ো, সুন্দরী। উনি নাকি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী। ওর দুই ভাই সামরিক বাহিনীতে আছে। তাঁরা নিশ্চয়ই এতো দিনে মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করছে। আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, কোনো মতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। আমাদের জয় হবেই। তাঁর মুখেই শুনলাম ওটা জুলাই মাস।"[২২]

তারার বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদেরকে শাড়ি বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দিত না। কোন্ ক্যাম্পে কোন্ মেয়ে নাকি গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই তাদের পরনে পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়াখোড়া। এমনিভাবে কয়েক মাস চলে যায়। হঠাৎ ওদের ভেতর একটি মেয়ে মারা যায়। সে অন্তঃসত্ত্বা ছিলো। সকাল থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ওরা বন্ধ দরোজায় অনেক চেচামেচি করে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না। মেয়েটার নাম ছিলো ময়না। পনেরো বছর বয়স হবে। কাটা পাঁঠার মতো হাত পা ছুড়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে, মুখখানা নীল হয়ে যায়। বয়স্কা সুফিয়ার মা একটা ছোটো কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। হাসপাতালটি ছিলো ঈশ্বরদী। এরপর তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনচারদিন পর জানানো হয় সে গর্ভবতী। প্রায় মাসখানেক পরে তাঁকে পাঠানো হয় ধানমণ্ডি পুনর্বাসন কেন্দ্রে। নীলিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে ওখানেই তাঁর দেখা হয়। এরপর সুইডেনের লেডি ডাক্তারের সহযোগিতায় তারা সুইডেন চলে যান।

কাপাসিয়ার মেয়ে মেহেরজান। কাপাসিয়ায় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আর্মি প্রবেশ করে। গ্রামে ঢুকে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। মানুষজন দিশেহারা হয়ে পড়ে। মেহেরজান বর্ণনা করেছেন, দেখতে দেখতে গ্রামের চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাঁদের বাড়িতে কেবল মেহেরজান, তাঁর মা আর ছোটো ভাই মিলু। এমন সময়ে জলপাই রঙের একটা জিপ গিয়ে থামে মেহেরজানদের বাড়ির সামনে। মিলুকে বুকে জড়িয়ে মেহেরজানের হাত ধরে তাঁর মা শোবার ঘরে ঢুকে পড়েন। মেহেরজান শোনেন কে যেন বাংলায় বলে, 'হ সাব এইডাই মেহেরজানগো বাড়ি, বহুত খুব সুরত লাড়কি।' এমন সময়ে দরোজায় লাথি। দ্বিতীয় লাথিতে দরোজা ভেঙে পড়ে। সেনাদের সঙ্গে কয়েকজন লুঙ্গি পরা লোক তাঁদেরকে ঘরের বাইরে বের করে আনে। চুল ধরে টেনে হিচড়ে মেহেরজানকে জিপে তোলে। আর্তনাদ করতেই মেহেরজানের মা এবং ভাই মিলুকে ব্রাশ ফায়ার করে। মেহেরজান দেখেন তাঁর মায়ের দেহটা তখনো থরথর করে কাঁপছে আর ভাইয়ের মাথাটা কাত হয়ে একদিকে ঢলে পড়েছে। চিৎকার করে উঠতেই ধমকে ওঠে 'চোপ খানকি।' অষ্টম শ্রেণির ছোট্ট মেয়ে মেহেরজান বোবা হয়ে যান। মেহেরজান বর্ণনা করেছেন–

> "আমার মানসিকতার স্থবিরতা কেটেছে অনেক দিন পরে। সেখান থেকে হাত ও জায়গা বদল হয়ে কখনো একা কখনো আরও মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। ... নিজেকে একটা অশরীরী কঙ্কালসার পেত্নী বলে মনে হতো। কিন্তু তবুও এ দেহটার অব্যাহতি নেই। মাস দুই পর ওদের নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের গোসল করতে দিতো। পরনের জন্য পেতাম লুঙ্গি আর সার্ট কিংবা গেঞ্জি, শাড়ি দেওয়া হতো না। ... ময়মনসিংহ কলেজের এক আপাও ছিলো আমাদের সঙ্গে। উনি বেশির ভাগ সময়ই একা একা উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হতো বাইরের আলো দেখার জন্য ছিদ্র খুঁজছেন। ক'দিন পর আপা অসুস্থ হলো। শুয়ে থাকতো, ওকে শাড়ি পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো ডাক্তার দেখানোর জন্য। আপা আর ফিরলো না। ভাবলাম আপা বুঝি মুক্তি পেয়েছেন, অথবা হাসপাতালে আছেন। কিন্তু না, আমাদের এখানে এক বুড়ি মতো ছিলো, বললো, আপা গর্ভবতী হয়েছিলো তাই ওকে মেরে ফেলা হয়েছে।"[২৩]

মেহেরজানের বর্ণনায় সেখানে চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে থেকে চল্লিশ বছরের যৌবনোত্তীর্ণ মহিলাও ছিলেন। কেউ প্রায় সব সময়ই কাঁদতো, কখনো নীরবে কখনো সুর করে। আওয়াজ বাইরে গেলে তাঁদের কঠোর শাস্তি পেতে হতো। কেউ চুপ করে বসে থাকতো। প্রথমে বাইরের কোনো খবর পেতো না। কিন্তু এ জায়গায় এসে এমন একটা জমাদারনী পেয়েছে যে বাইরের অনেক খবর দেয়। তার কাছ থেকে জেনেছে জায়গাটার নাম ময়মনসিংহ। তাঁদেরকে আরেকটা ক্যাম্পে নিয়ে যায়, সেখানে এক হাবিলদারকে পান। নাম লায়েক খান। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তার কাছে জানতে পান যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। যুদ্ধ পরাজয়ের ভয় লায়েক খানকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। মেহেরজান সব দিক চিন্তা করে লায়েক খানকে বলেন তাঁকে বিয়ে করতে। অবশেষে ক্যাম্পের মৌলবি সাহেব তাদের নিকাহ পড়ান। যুদ্ধ পরাজয়ের পর সবাই ছুটাছুটি করে, কিন্তু মেহেরজান লায়েক খানের হাত ছাড়েনি। মেহেরজান তার বিবরণ দিয়েছেন–

> "আমি শাড়ি পড়লাম কিন্তু লায়েক খানের হাত ছাড়লাম না। এতক্ষণে বুঝলাম হিন্দিভাষীরা ভারতীয় সৈন্য। একজন বললো, মা, তোমার ভয় নেই, তুমি বললে তোমাকে ঘরে পৌঁছে দেবো। আমার স্বামী করুণ নয়নে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম আমার কোনো ঘর নেই, ইনি আমার স্বামী। আমাদের ধর্মমতে বিয়ে হয়েছে। এঁকে যেখানে নেবেন আমিও সেখানে যাবো। সেপাই হাসলো, পাকিস্তানি জওয়ানদের সঙ্গে আমাকেও বন্দী হিসেবে ট্রাকে তুললো।"[২৪]

মেহেরজান বন্দীদের সঙ্গে ঢাকা পৌঁছেন। পরদিনই তাঁদের নাম ঠিকানা লিখে নেন। তাঁদের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ কলেজের দুইজন উচ্চশিক্ষিত মহিলা ছিলেন। সেখানে এক সঙ্গে প্রায় ত্রিশজন মেয়ে। তাঁরা বলেন নাম-ঠিকানা ঠিকমতো লিখে দিতে যাতে দেশের মানুষ তাঁদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতনের সঠিক তথ্য জানতে পারে। এরপর চারদিনের মাথায় মেহেরজানের বাবা আসেন তাঁকে নিয়ে যেতে। কিন্তু তাঁদের সামাজিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে মেহেরজান লায়েক খানের হাত ধরে পাকিস্তান চলে যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্রী রীনা। নীলিমা ইব্রাহিম রীনাকে বাসা থেকে আর্মির তুলে নেওয়ার স্মৃতিচারণ করেছেন। বেলা একটার দিকে আর্মির একটা জিপ এসে থামে

তাঁদের বাড়িতে। একজন অফিসার তাঁর বাবার সঙ্গে করমর্দন করে। তাঁর বাবা তাদের বসতে বলেন। তারা বসে না। রীনার বাবাকে জিজ্ঞেস করে তাঁর ছেলে কোথায়। তিনি বলেন, সে আর্মির ক্যাপ্টেন কুমিল্লায় আছে। কথা শেষ করতে না দিয়েই তাঁর গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষে দেয়। তিনি হতভম্ব হয়ে বলেন, 'তোমরা জানো আমি কে?' কথা শেষ না হতেই 'কুত্তার বাচ্চা' সম্বোধনের সঙ্গে লাথি খেয়ে তিনি বারান্দায় পড়ে যান। রীনার মা ছুটে এলে তাঁকে 'হট যাও বুড্ডি' বলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। খানসামা আলী এগিয়ে এলে তাকেও দাঁড় করায়। তারপর সবাইকে স্টেনগানের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে দেয়। রীনা বাইরে বের হয়ে এলে তাঁকে টেনে জিপে তুলে নেয়। তারপর ডিসেম্বর পর্যন্ত রীনা হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে।

ফাতিমা নীলিমা ইব্রাহিমকে জানিয়েছেন তাঁর মা বোনের সঙ্গে গ্রামের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে প্রতিবেশি জজের ছেলে সহপাঠী ফারুক তাঁকে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেয়। সেই ফারুক পরবর্তীতে বাংলাদেশের একজন জজ। ফাতিমা তাঁকে তুলে নেওয়ার স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন–

> "ফারুক বললো, খালাম্মা চলে যাচ্ছেন। চলুন আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। কেন জানি না অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু মা যেনো আকাশর চাঁদ হাতে পেলেন। দুখানা বেবিট্যাক্সি ডাকা হলো। আমি মার সঙ্গে উঠতে যাচ্ছিলাম, ফারুক আমাকে তারটায় উঠতে ইঙ্গিত করলো। মা আর সোনালি সামনেরটায় উঠলেন। কিছু দূর যাবার পর আমাদের ট্যাক্সি সোজা স্টেশনের পথে না গিয়ে বাঁ দিয়ে সেনানিবাসের পথ ধরলো। আমি বললাম ওকি? এ পথ কেনো? ফারুক ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো, ও দিকে ছেলেরা বেরিকেড দিয়েছে। বললাম, মা আর ওরাও ঘুরে আসতো। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। চিৎকার করে বললাম, এই বেবি থামো। না, সে তার গতি বাড়িয়ে দিলো। আমি লাফ দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওই শয়তানের সঙ্গে গায়ের শক্তিতে না পেরে ওর হাতে আমার সবকটা দাঁত বসিয়ে দিলাম। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠলো পশুটা। তারপর বেবিট্যাক্সি থামিয়ে ওই জানোয়ারটা তার গামছা দিয়ে কষে আমার মুখ বাঁধলো। তারপর সোজা সেনানিবাস। আমি বন্দী হলাম। ফারুক আমাকে উপহার দিয়ে এলো।"[২৫]

নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর গ্রন্থে আরো কয়েকজন বীরাঙ্গনার স্মৃতিচারণ তুলে ধরেছেন। যেমন– নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ার মেয়ে ময়না। সে নারায়ণগঞ্জ কলেজের আইএ ক্লাসের ছাত্রী ছিলো। সে তাঁর বাবাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে তাঁকে জামিন রেখে ছেড়ে দেয় তাঁর বাবাকে। ময়না তাঁর বিবরণে জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানিদের অত্যাচারের দরজায় যখন আমি উৎসর্গকৃত হলাম তখন আর অনাঘ্রাতা পুষ্প নই। রাজাকারের উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছি।' তাঁকে নিয়ে গেলো নারায়ণগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে অন্য জায়গায়। তারপর থেকে সে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে হানাদারদের দ্বারা যুদ্ধের পুরো সময় নির্যাতিত হন। অন্য জায়গায় প্রথম যে নিয়ে গেলো সেখানে ছয়জন মেয়ে। দিনের বেলা তাঁদের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। তাঁরা বেশিরভাগ সময় অন্ধকারের মধ্যে কাটায়। প্রতিরাতে একেক জন মেয়ের ওপর তিন চারজন করে ধর্ষণ করে। একজনের অপকীর্তি অন্যজন উপভোগ করে। কুৎসিত আলাপ করে। আর মেয়েরা ভয়-শংকা অনুভূতি-শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে। ময়না তাঁর বিবরণে জানিয়েছেন–

"সারারাত ওদের দেহমনের ওপর যে অত্যাচার চলেছে তাতে সোজা হয়ে বসবার ক্ষমতা থাকে না। সবগুলোরই প্রায় গায়ে জ্বর, তাই কম্বল অত্যাবশ্যকীয়। আমার পরের অভিজ্ঞতা আমাকে এসব ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর তাগড়া রাক্ষুসীর মতো একটা মেয়েলোক ঘরে ঢোকে। সামনে কুচি দিয়ে শাড়ি পরা এবং সহজেই অনুমেয় জমাদারনী। দু'দিকে দুটো গোসলখানা দেখিয়ে বললো, যাও, মুখ হাত ধুয়ে আর সব কাজ সেরে এসো। নাশতা লাগাবে বাবুর্চি। সারারাতের ক্লান্তি। বাথরুমে ঢুকে একটাই শান্তি পেলাম যে, বাথরুমটা পরিষ্কার। পরে হাসি পেলো, দেহটাই যার নরককুণ্ড তার আবার পরিষ্কার বাথরুম! স্নান করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু শাড়ি ভেজালে পরবো কী? সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। জমাদারনী এসে শাড়িটা নিয়ে গেলো এবং ছোটোখাটো একটা লুঙ্গি আমাকে পরতে দিলো। চোখ গরম করে বললো, শব্দ করবি না, সেপাই ডাকবো। গোসলখানার দরোজা বন্ধ করা নিষেধ। লজ্জা বিসর্জন দিয়ে গোসল করে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে নতুন ময়না বেরিয়ে এলাম।"[২৬]

খুলনার শহরের উপকণ্ঠে শিল্পশহর খালিশপুরের পাশে সোনাডাঙ্গার মেয়ে ফাতেমা। খালিশপুর হাউজিং এলাকায় প্রচুর বিহারী বাস করে। ফাতেমাকে ধরে নেয় বিহারি নাসির আলী। ফাতেমা সে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন–

"মিলিটারি আসছে। বিহারিরা স্লোগান দিচ্ছে, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার। সামনে যা পেলাম নিয়ে সবাই গ্রামমুখী হলাম। কিন্তু নাসির আলীর হাত থেকে মুক্তি পেলাম না আমি আর পোনা। পোনাকে কোলে নিয়ে আমি দৌড়াচ্ছিলাম, তাই সবার পিছনে পড়েছিলাম। ধরে ফেললো আমাকে, আমার গায়ের জোরও কম না। ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি দেখে হঠাৎ পোনাকে তুলে একটা আছাড় দিলো। ওর মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে গেলো। আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। নাসির আরো দুই তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো ওদের বাড়ির দিকে। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে। বাহাবা দিচ্ছে কেউ কেউ। আমি শুধু বোবা চোখে তাকিয়ে দেখছি।"[২৭]

ফাতেমা নীলিমা ইব্রাহিমকে জানিয়েছেন, ওই দিনই ওই বস্তিতে তারা ফাতেমার ওপর চড়াও হয়। বাপ ছেলে মিলে একই মেয়ের ওপর বলাৎকার করে। সোনাডাঙ্গা থেকে মা মেয়েকে ধরে এনে দুই জনকে এক সঙ্গে পরস্পরের সামনে ধর্ষণ করে। চার-পাঁচ দিন সেখানে তাঁদেরকে নির্যাতন করার পর একটা খোলা ট্রাকে করে যশোর ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যায়। এরপর শুরু হয় তাঁদের হাত বদলের পালা।

মিনা ঢাকার মেয়ে। আগস্ট মাসে তাঁর মেয়ে ফাল্গুনীর খুব জ্বর হয়। অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে তিনি ডাক্তারের কাছে যান। সিস্টার মেয়েকে নিয়ে পাশের রুমে ঢোকে। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তায় গোলাগুলি শুরু হয়। ডিসপেনসারির সামনে দুতিনটা জিপ এসে থামে। ডাক্তার রোগী দেখছে দেখে হঠাৎ মিনার হাত ধরে টান দেয়। ডাক্তার কিছু বলবার চেষ্টা করে কিন্তু তাঁকে কিল, ঘুষি, চড়, থাপ্পড় দিয়ে মিনাকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে পাকিস্তানি সেনারা জিপে তোলে। তাঁর মেয়ে ফাল্গুনী পড়ে থাকে ডাক্তারখানায় মালিকহীন। আর মিনা সেনা ক্যাম্পে যৌনদাসী। শুরু হয় তাঁর ওপর নির্যাতনের পালা। মিনা নীলিমা ইব্রাহিমকে জানিয়েছেন–

"শকুন যেমন করে মৃত পশুকে ঠুকরে ঠুকরে খায়, তেমনি, কি-বা রাত্রি, কি-বা দিন আমরা ওই অন্ধকার দোজখে পচতে লাগলাম। মাঝে মাঝে তারা ওপরে ডাকতো আমাদের। আমরা গোসল করতাম, কাপড় বদলাতাম তারপর আবার অন্ধকার কূপে। কারা আমাদের ওপর অত্যাচার করতো, তারা বাঙালি না বিহারি, পাঞ্জাবি না পাঠান কিছুই বলতে পারবো না। ব্যাধিগ্রস্ত হলে তাকে নিয়ে যেতো। ভাবতাম যখন রোগে ধরবে অন্তত সেই সময় তো বাইরে যেতে পারবো, হাসপাতালে নেবে। পরে জেনেছি হাসপাতালে নয় চিরকালের জন্য আলো দেখিয়ে দিতো। অর্থাৎ নির্বিচারে হত্যা করতো।"[২৮]

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী– একজন বীরাঙ্গনা

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী 'নিন্দিত নন্দন' গ্রন্থে একাত্তরে তাঁর অসহায়ত্ত, নির্যাতন ও ধর্ষণের স্মৃতিচারণ করেছেন। একাত্তরে স্বামী সিরাজের সঙ্গে তাঁর কাগজে কলমে বিচ্ছেদ হয়। ২৩শে মার্চ অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন তাঁর স্বামী সিরাজ তাঁদের তিন ছেলেকে নিয়ে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি একা হয়ে যান। তাঁর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না। খুলনায় তখন চারদিকে হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং চরম উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে। তিনি বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়ের জন্য ঘুরতে থাকেন। ৭ই এপ্রিল তাঁর খালিশপুরের বাসায় ফিরে এসে দেখেন সেখানে হানাদার বাহিনী বাঙালিদের জবাই করার কসাইখানা বানিয়েছে। সেখানে থাকতে থাকতেই পাশের বাড়ির ১৪ জনকে একসঙ্গে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করতে দেখেন। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর শুভাকাঙ্ক্ষী বিয়ার নামের একজন তাঁকে পাবলা মুরগির ফার্মের কাছে ইঞ্জিনিয়ার হক সাহেবের বাসায় কয়েকদিনের জন্য রেখে আসেন। কয়েকদিনের মধ্যে বিহারিরা হক সাহেবকে হত্যা করে। সাতদিনের মাথায় তিনি সে বাসা ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি পথে নামেন অজানা উদ্দেশ্যে। তখনো জানেন না কোথায় যাবেন। পথে নেমে পরিচিত একজন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। জাহাঙ্গীর তাঁকে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবেন, জুট মিলে আবার জয়েন করবেন কি না। জাহাঙ্গীর তাঁকে সহযোগিতার কথা বলে নিয়ে যায়। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী লিখেছেন–

"জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কথামতো বাড়িটিতে ঢোকার পর তিনি আমাকে একটা বেডরুমে নিয়ে গেলেন এবং ভয়ংকরভাবে আমাকে আক্রমণ করলেন, কয়েক মুহূর্ত আগেও যে দুর্ঘটনার কথা আমার মাথায় আসেনি। মুহূর্তে আমার বুকের আঁচল তাঁর হাতের মুঠোয়। তার দংশনে আমার স্তন ক্ষত বিক্ষত। আমি বল প্রয়োগের একটিই উপায় খুঁজে পেলাম। তার হাত মটকে দাঁত দিয়ে কামড় বসাতে শুরু করি। এক সময় সে আমাকে শাসাতে শাসাতে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লো, সন্ধ্যাবেলা আমি সব টের পাবো। নির্দেশ দিয়ে গেলো, আমি যেনো কোথাও না যাই। ঘটনাটা বদ্ধঘরে ঘটেছিলো, তাই দারোয়ান পিয়নরা টের পায়নি। একটি ছেলে ১৮/১৯ বছর সে কিছুটা টের পেয়ে বলে, আপা আমি ড্রইং রুমের এপাশ থেকে দরজা খুলে দিচ্ছি, আপনি সদর রাস্তায় নেমে রিকশা নিয়ে চলে যান।"[২৯]

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী একেবারে নিরুপায় হয়ে পূর্বের কর্মস্থল খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুটমিলে যোগদান করতে যান। তিনি লিখেছেন, 'দেখলাম আমার কোনোই উপায় নেই ফিরে যাবার। তাই আমার পূর্ব চাকরিস্থল ক্রিসেন্ট জুট মিলে ফিরে যেতে মনস্থ করি। যা থাকে ভাগ্যে।' তিনি ক্রিসেন্ট জুটমিলের

প্রধান হিসাবরক্ষক ফিদাই সাহেবের সহযোগিতায় কাজে যোগ দেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি প্রথম দিন অফিসে গিয়ে কয়েকবার উপর্যুপরি ধর্ষণের শিকার হই বিভিন্ন জন দ্বারা। বুঝতে পারছি না যুদ্ধের এ কোন ভয়ানক রূপ! আমার বুকের স্তনে আগের দিনের ক্ষত এখনো শুকায়নি।' বারোটার পর ফিদাই সাহেব তাঁকে ওপরে ডাকেন। ঘরে ঢুকতেই ফিদাই সাহেব তাঁর দিকে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকান। হঠাৎ দরোজা বন্ধ করে দেন। অনেক হাতে পায়ে ধরে তখনকার মতো রেহাই পান। কিন্তু যুদ্ধের পুরো সময় ক্রিসেন্ট জুট মিল থেকে তাঁকে আর রেহাই দেয়নি। ক্রিসেন্ট জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারের বাংলো 'ফাল্গুনী'তে তাঁকে বসবাস করতে হয়। মিল কর্তৃপক্ষ তাঁর বাইরে থাকাটা পছন্দ করে না। নেভাল কমান্ডার গুলজারিন কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে ডেকে পাঠান। তাঁর নামে হত্যার অভিযোগ। মিষ্টি সুরে খুব কঠিন প্রশ্নগুলো করতে থাকেন। হঠাৎ গুলজারিন তাঁর হাত ধরে টেনে তার বেডরুমে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দেন। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী লিখেছেন–

> "মুহূর্তে খুনির চেহারা ধারণ করে, মুখে হাতের দুই করের চেয়েও বড়ো সোনালি রঙের দাঁত। শুধু এইটুকু দেখেই চোখ বন্ধ করেছি। হয়তবা সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু অনিবার্য হওয়ার কথা। সমস্ত শরীরে যেনো আগুনের হলকা বয়ে চলেছে। তার লেলিহান জিহ্বার গগনে আগুনে পুড়ছে আমার শরীর। আজও যেনো সেই সাপের বিষ লেগে আছে আমার সারা মুখে। যখনই চোখ বন্ধ করি একাত্তর ভেসে ওঠে, স্মৃতিগুলি ঠিক তেমনই দুঃসহ। আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করিনি সেদিন। জানি সম্ভব ছিল না। যুদ্ধের করাল গ্রাসে আমি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চলেছি।"[৩০]

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীকে সময়ে অসময়ে আর্মি অফিসার, নেভি অফিসার, ক্রিসেন্ট জুটমিলের অফিসার– এদের নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। ক্রিসেন্ট জুটমিলের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ফিদাই সাহেব তাঁর এই মধ্যস্থতার কাজটি করতেন। কখনো নিজে ড্রাইভ করে পৌঁছে দিতেন কখনো অন্যজনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন ফিদাই সাহেব তাঁকে তৈরি হয়ে আসতে বলেন। ইচ্ছে অনিচ্ছের বাইরে তিনি তৈরি হয়ে নিতেন। কারণ তাঁর কিছুই করবার ছিল না। বরং যতো তাড়াতাড়ি দুঃসময় পার করা যায়। খুলনা রেল স্টেশনের সামনে একটি একতলা আলিশান বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যান। সেখানে আর্মি অফিসাররা তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী সে ঘটনার স্মৃতিচারণে লিখেছেন–

> "ভেতরে একটি অতিথি বসার ছোট্ট রুম। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম চার-পাঁচ জন সামরিক অফিসার বসে তাস খেলছে। ফিদাই আমাকে এই চার জন অফিসারের সাথে পরিচয় করালেন। একজন ক্যাপ্টেন ইমতিয়াক, ক্যাপ্টেন সাবের, আরেকজনের নাম মনে পড়ছে না। অন্যজন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার সিনিয়র এডিটর মিস্টার ওয়ার্সি। ওদের কথার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে বাড়িটি ওদের একজন বড়োলোক বন্ধু রাজা হোসেনের। যিনি বিদেশে অবস্থান করছিলেন। সেদিন এইসব অফিসাররা আমাকে নির্দয়ভাবে আমার ওপরে পাশবিক নির্যাতন করে। আমার অসহায় কান্নাকাটি দেখে ওয়ার্সি সাহেব আমাকে কিছু না বলে, অন্য দিন আসতে বলে ছেড়ে দেন। আমাকে কঠোর করে শাসানি দিয়ে ফিদাই রিকশায় যেতে বলে।"[৩১]

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী লিখেছেন, 'বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই তিনি ধর্ষণের শিকার হন। কখনো একজনে কখনো কয়েকজন মিলে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়।' তাঁর স্মৃতিচারণে খুলনার খালিশপুরে হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও ধর্ষণের রূপচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর সবকিছু জানার পরও সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁর বিয়ার ভাই (আহসানউল্লাহ) তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন।

একাত্তরের যুদ্ধশিশু

ফতেহ আক্তার বেগম নূরজাহান সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া' গ্রন্থে 'স্মৃতিতে একাত্তর' শিরোনামে স্মৃতিচারণমূলক লেখায় একজন বীরাঙ্গনা এবং তাঁর যুদ্ধশিশুর স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> "রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজে'র অধ্যক্ষা হিসাবে পদাধিকার বলে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এমনি একটি প্রতিষ্ঠান 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড।' কয়েকজন দুস্থ মহিলা, সঙ্গে কয়েকজন 'বীরাঙ্গনা'ও ছিলেন সেখানে। সেখানে সভায় মাঝে মাঝে যেতেন তিনি। কলেজের কাজের জন্য এক সভায় যেতে পারেননি। সে সভার বিবরণ তিনি শোনেন আওয়ামী লীগের এম সি এ মোতাহার হোসেন তালুকদারের কাছে। সেখানে চৌদ্দ-পনেরো বছরের এক ব্রাহ্মণ কিশোরী ছিলো পুনর্বাসন বোর্ডে। তার পিতা মাতা ও ভাই বোনদের পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। সে মেয়ের একজন যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়।"[৩২]

একজন বিদেশী দম্পতি আসেন 'ওয়ার বেবি' দত্তক নেওয়ার জন্য। সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি হওয়ার কথা। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। দত্তক পিতামাতা শিশুটিকে নিয়ে যাবেন এমন সময় শিশুটিকে দিতে অস্বীকৃতি জানায় তার মা। ফতেহ আক্তার মেয়েটির ভাষ্যে লিখেছেন–

> "না দেবো না। কিছুতেই না। সে কী! ওকে রাখলে তোমার কী হবে? তুমি কোথাও ঠাঁই পাবে না, দিয়ে দাও। তোমার নতুন জীবন হবে, সংসার হবে, ভাত কাপড়, সংসার সব পাবে। চাও না তুমি? কিশোরী মাতা বললো – "চাই না। ভাত, কাপড়, সংসার সমাজ কিছুই চাই না। ওকে বুকে করে আমি ভিক্ষা করে খাবো।" হু হু করে কেঁদে ওঠে মেয়েটি। বলে –'আমার তো আর কেউ নেই।'[৩৩]

মুস্তফা চৌধুরী ''৭১-এর যুদ্ধশিশু: অবিদিত ইতিহাস' গ্রন্থে একাত্তরের যুদ্ধশিশুর চিত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> "বাঙালি নারীদের ইচ্ছেমতো আটকে রাখা হয়েছে মিলিটারি ক্যাম্পে মাসের পর মাস, তাঁদের ওপর নির্যাতন চলেছে অবিশ্রাম, দেশের স্বাধীনতা লাভের দিন পর্যন্ত এ অনাচার চলেছে অবাধে। ...বাংলাদেশে মার্চ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তার দোসররা যে অগণিত নারীদের ধর্ষণ করে তার ফলশ্রুতিতে জন্ম হয় যুদ্ধশিশু। বাংলাদেশে যুদ্ধশিশুরা অক্টোবর ১৯৭১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। ... যুদ্ধশিশু নিয়ে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেসব অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নারী পুনর্বাসন বোর্ড কর্তৃক ১৯৭২ সালে যে ২২টি সেবা সদন প্রতিষ্ঠিত হয় সেখান থেকে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার যুদ্ধশিশু জন্ম হওয়ার কথা প্রকাশিত হয়।"[৩৪]

বাংলাদেশ সরকার এসব শিশুদের অনেককে ১৯৭২ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইনী প্রক্রিয়ায় দত্তক হিসাবে প্রদান করে।

উপসংহার

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত নারীদের মধ্যে স্বপ্রণোদিত হয়ে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন মাত্র একজন। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত নারী নির্যাতনের তুলনায় স্মৃতিকথায় তার খুব কম চিত্র পাওয়া যায়। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সামাজিকভাবে অসম্মানিত ও নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে তাঁরা তাঁদের লাঞ্ছিত জীবনের ঘটনাকে স্মৃতিচারণ না করে বরং লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। পরিবারের সদস্যরাও ঘটনার পুনরালোচনা না করে তাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও তাদের অপকর্মের স্বাক্ষর না রেখে যথাসম্ভব মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। বাংকার ছেড়ে যাবার আগে তারা নারীদেরকে হত্যা করে গেছে। শ্রুত ঘটনার ওপর নির্ভর করে অনেকে সে সময়ের নির্যাতন ও ধর্ষণের স্মৃতিচারণ করেছেন। অনেকে নির্যাতিত নারীদের খুঁজে বের করে, তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করে পুনর্বাসিত করবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে স্বল্পসংখ্যক নারী তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া নির্মম নির্যাতনের স্মৃতিচারণ করেছেন। স্মৃতিকথায় প্রকাশিত হয়েছে সব বয়সের নারী, হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মম নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এসব নির্যাতিত নারীদের অধিকাংশকে তারা হত্যা করে। যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ নিজের পরিবারের এবং সমাজে স্বাভাবিক জীবনের মর্যাদা পাননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিগৃহীত হয়েছেন। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির কথা স্মরণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধের অংশীদার মনে করে তাঁরা নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জার্নাল ৭১* ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ৬৮

২. তদেব, পৃ. ঐ

৩. তদেব, পৃ. ৬৯

৪. তদেব, পৃ. ৬৯

৫. তদেব, পৃ. ৭২

৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৫৯৬

৭. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৮. জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, দ্বাবিংশতম মুদ্রণ, ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ১২০

৯. রাবেয়া খাতুন, *একাত্তরের নয়মাস*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ৪০

১০. নাজিম মাহমুদ, *যখন ক্রীতদাস: স্মৃতি ৭১*, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯৫, পৃ. ৬৬

১১. হাসান আজিজুল হক, *একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা*, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪, পৃ. ৩৪

১২. কাজী ফজলুর রহমান, *দিনলিপি: একাত্তর*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ. ১১৩

১৩. তদেব, পৃ. ১৩৭

১৪. মো. জহুরুল ইসলাম বিশু, *পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের কথা*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ৬৭

১৫. তদেব, পৃ. ৭৫

১৬. নাসির উদ্দিন, *যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা*, পঞ্চম মুদ্রণ, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ১৬০

১৭. আহমদ রফিক, *একাত্তরের পাকবর্বরতার সংবাদভাষ্য*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১৮৬

১৮. হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিতা কিছু নারী স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ধানমণ্ডি নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে যান। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশের চলমান পরিস্থিতিতে যেসব নারী নির্যাতিত হয়েছে, হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে, বাংকারে যেসব নারীকে আটকে রেখে ধর্ষণ করে মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু তাঁদেরকে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেন। বীরাঙ্গনাদের একজন রাজশাহীর তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বঙ্গবন্ধু যা বলেছিলেন তা লিখেছেন। বঙ্গবন্ধু তারাদের বলেছিলেন, 'তোরা আমার মা, জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিস। তোরা শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনা। আমি আছি তোদের চিন্তা কী?' সূত্র: নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, নবম মুদ্রণ, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ. ২৪

১৯. তাদামাসা হুকিউরা, *রক্ত ও কাদা* ১৯৭১, কাজুহিরো ওয়াতানাবে অনূদিত, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১৪১

২০. আবুবকর সিদ্দিক, "একটি স্বস্তিকর মৃত্যুসংবাদ ও অবরুদ্ধ যুদ্ধদশা", *শৈলী*, ঈদ সংখ্যা ১৯৯৮, পৃ. ৩১১

২১. তদেব, পৃ. ৩১২

২২. নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, নবম মুদ্রণ, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ. ২০

২৩. তদেব, পৃ. ৪৪

২৪. তদেব, পৃ. ৪৮

২৫. তদেব, পৃ. ৯৭

২৬. তদেব, পৃ. ১২৮

২৭. তদেব, পৃ. ১৫৫

২৮. তদেব, পৃ. ১৭৪

২৯. ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, *নিন্দিত নন্দন*, ঢাকা: শব্দশৈলী প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ১১১

৩০. তদেব, পৃ. ১২৩

৩১. তদেব, পৃ. ১৪২

৩২. ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যেসব ঘটনায় বিশ্ববাসী আলোড়িত হন তার মধ্যে অন্যতম হলো 'অধিকৃত' বাংলাদেশে মার্চ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত জবরদখল করে থাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযান এবং ধর্ষণ। সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে থাকাকালীন তারা যে অগণিত নারীদের ধর্ষণ চালায়, তার ফলশ্রুতিতে যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়। বিংশ শতাব্দীর ঘৃণ্য অমানবিক অপরাধের ফসল যারা বাংলাদেশি নারী ও বালিকার (১৩ বছর বয়সী বালিকা পর্যন্ত মা হয়) গর্ভে দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সদস্য ও তাদের সহযোগীদের

ধর্ষণের ফলে যথাসময়ে নাম-পরিচয়হীন যুদ্ধশিশু হিসেবে ভূমিষ্ঠ হয়। বাংলাদেশি যুদ্ধশিশুরা অক্টোবর ১৯৭১ থেকে সেপ্টেরম্বর ১৯৭২-রের মাঝের সময়ে জন্মগ্রহণ করে। এই হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 'অধিকৃত বাংলাদেশে' পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারীদের ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে তাদের গর্ভে যে সন্তান জন্ম হয় তাদেরকে যুদ্ধশিশু বলা হয়। সূত্র: মুস্তফা চৌধুরী, *'৭১-এর যুদ্ধশিশু: অবিদিত ইতিহাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০১৬, পৃ. xx.

৩৩. ফতেহ আকতার, ''স্মৃতিতেএকাত্তর'', অন্তর্গত *মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া*, সম্পা. বেগম নূরজাহান, ঢাকা: গতিধারা, ২০১৩, পৃ. ৩৭

৩৪. মুস্তফা চৌধুরী, *'৭১-এর যুদ্ধশিশু: অবিদিত ইতিহাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০১৬, পৃ. ১৬

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 59-67

সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে প্রত্নস্থল ভরতভায়না

খ. ম. রেজাউল করিম

সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর, বাংলাদেশ
ইমেইল : rezakarim.km@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের সংখ্যা খুবই কম এবং ইতিহাসে তার উল্লেখও অস্পষ্ট। এখনো শুধু পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলের কথাই মানুষ অবগত আছে। সম্প্রতি ভরতভায়নাকে কেন্দ্র করে নতুন এক সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যশোর জেলার কেশবপুরে অবস্থিত ভরতভায়না প্রত্নস্থলটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি আদি স্থাপনা। এর উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর অধিকাংশ গুপ্তযুগের বলে ইতিহাসবেত্তাদের ধারণা। এটা এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখননের মধ্যদিয়ে ভরতভায়না দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠনে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য যে, ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রত্নস্থলটি এখনো দেশের মানুষের কাছে অনেকটাই অপরিচিত। সঙ্গত কারণেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ভরতভায়না সম্পর্কে জানা জরুরি। দৈতয়িক তথ্যনির্ভর প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ভরতভায়না প্রত্নস্থলটির বিস্তৃতি এবং প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।

মূলশব্দ

প্রত্নতত্ত্ব, ভরতভায়না, বাঙালি সংস্কৃতি, সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য

ভূমিকা

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক। বাঙালি সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস ও জাতিসত্তা বিকাশের ধারা উন্মোচনে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলো অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, শাসকশ্রেণি গড়ে তোলে বিভিন্ন নগর, ইমারত, প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, বিহার ও সমাধিসৌধ।[১] এসব ঐতিহ্যের অধিকাংশ

কালের গর্ভে বিলীন হলেও কিছু সংখ্যক পুরাকীর্তি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও টিকে আছে। এ সকল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেকটাই আজও অনাবিষ্কৃত। বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে প্রায় ২৫০০ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান রয়েছে। এর মধ্যে ২০০৬ সালের জুন মাস নাগাদ ৪৫২টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের সন্ধান মিলেছে। এসব স্থানের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে মাত্র ১৭৬টি।[২] দেশে আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি, নওগাঁর পাহাড়পুর ও সদ্য আবিষ্কৃত নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিচে দেশের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের নাম, অবস্থান ও সময়কালের বিবরণ তুলে ধরা হলো-

সারণি-১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের নাম, অবস্থান ও সময়কাল

ক্রমিক নং	প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান	অবস্থান	সময়কাল	শাসনামল
১।	মহাস্থান গড়	শিবপুর, বগুড়া	৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ	মৌর্য শাসন
২।	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার	বদলগাছী, নওগাঁ	৮ম- ৯ম শতক	পাল আসন
৩।	ওয়ারি বটেশ্বর	বেলাবো, নরসিংদি	৫ম শতক	গুপ্ত শাসন
৪।	ভরতভায়না	কেশবপুর, যশোর	৯ম- ১১শ শতক	গুপ্ত শাসন
৫।	ময়নামতি	কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	৮ম- ১২শ শতক	সেন শাসন

সূত্র : বাংলাপিডিয়া, ২০১০, শাহনাওয়াজ, ২০০৮, দ্যা ডেইলি স্টার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে বৌদ্ধ এবং হিন্দু শাসনামলের পুরাকীর্তিই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। আবিষ্কৃত প্রত্নস্থলে বিভিন্ন সময়ে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে উদ্ধারকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর সঠিক এবং বিস্তারিত পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এ সকল স্থান সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান সীমিত পর্যায়েই রয়ে গেছে। সুতরাং এটা বলা যায় যে হাতে গোনা কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ছাড়া দেশের বাকি অংশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব ইতিহাসে এখনও অস্পষ্ট।[৩] এ প্রেক্ষিতে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জেলা যশোরের কেশবপুরে অবস্থিত ভরতভায়নাকে কেন্দ্র করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানববসতির বিস্তার, বিকাশ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ভরতভায়না একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রত্নস্থলটি স্থানীয়ভাবে ভরতের দেউল বা ভর্তের দেউল নামে পরিচিত। ইতিহাস বিশ্লেষণে জানা যায়, কেউ কেউ মনে করেন, ভরত নামে একজন প্রভাবশালী রাজা সুন্দরবন তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে একটি প্রাচীন দেউল বা মন্দির নির্মাণ করেন।[৪] অনেক ইতিহাসবেত্তা উল্লেখ করেছেন যে সুন্দরবন অঞ্চলে ভরতগড় নামে একটি স্থান রয়েছে। এটি স্থানীয়ভাবে ভরত রাজার দেওল বা মন্দির নামে পরিচিত। অন্য এক সূত্রমতে, পাল রাজত্বের প্রাক্কালে যখন সমগ্র বঙ্গে মাৎসন্যায় বিরাজ করছিল, সে সময় ভরত নামক এক রাজা এই এলাকায় রাজ্য স্থাপন করে অনেকটা

স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন, সুন্দরবনে ১২৮ নং লাটে যে ভরত রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, সে ভরত রাজা ও এখানকার ভরত রাজা অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে।[৫]

চিত্র : ভরতভায়না প্রত্নস্থল, কেশবপুর, যশোর

ভৌগোলিক অবস্থান

প্রত্নস্থলটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার গৌরিঘোনা ইউনিয়নের বুড়িভদ্রা নদীর পশ্চিম তীরে ভরতভায়না মৌজায় (জেএল নং ১৩৯) ১.২৯ একর ভূমির ওপর অবস্থিত। স্থানটির অবস্থান খুলনার দৌলতপুর থেকে ২০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব এবং যশোরের কেশবপুর থেকে ১৮ কি. মি. পূর্ব-পশ্চিমে। এখানে নদীর তীরে আকৃতিতে প্রায় গোলাকার একটি ইটের স্তূপের অস্তিত্ব দেখা যায়। এর পরিধি পাদদেশে ২৭৪.৩২ মিটারেরও অধিক এবং গোড়ার দিকের পরিধি প্রায় ২৫০ মিটার। চারপাশের ভূমি থেকে প্রায় ১২.২০ মিটার উঁচু প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবিকে অনেকটা ছোট পাহাড়ের মত দেখায়।[৬] সতীশচন্দ্র মিত্র এ ঢিবির উচ্চতা ৫০ ফুট বলে দাবী করেছেন। স্থানটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে অনেকটা দেবে যাওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[৭] তার বর্ণনানুযায়ী, ভরতভায়না ঢিবিটি ছিল অনেকটাই গোলাকৃতির। এর উত্তর-পূর্ব ও পূর্বদিকে বুড়িভদ্রা নদী এবং বাকি তিন দিকে রয়েছে গড়খাই বা পরিখা। বর্তমানে ঢিবিটির দক্ষিণ দিকে নদীর কাছে একটি পুকুরের মত খাত দেখতে পাওয়া যায়। এর পার্শ্ববর্তী গৌরীঘোনা গ্রামে ভরত রাজার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ির দক্ষিণে নদী ও অন্য তিনদিকে গড়খাই ছিল। এছাড়া ভরতের দেউলের এক কিলোমিটার দক্ষিণে কাশিমপুর গ্রামে ডালিঝাড়া নামক স্থানে একটি ভগ্নস্তূপ দেখা যায়। স্তূপটি ভরতরাজার কোনো প্রধান কর্মচারির বাড়ি ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করে থাকেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ঐতিহাসিক ভরতভায়না প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটির পরিচিতি জনসম্মুখে তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্যকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

ক) ভরতভায়নার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুসন্ধান করা;

খ) ভরতভায়নায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো চিহ্নিত করা;

গ) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবনে ভরতভায়নার প্রভাব বিশ্লেষণ করা;

ব্যবহৃত পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি মূলত উদঘাটনমূলক (exploratory) প্রকৃতির। প্রবন্ধটিতে প্রধানত দৈতয়িত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, দেশি-বিদেশি জার্নাল, ম্যাগাজিন, স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকা, প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পর তা বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা আর্নল্ড টয়েনবি তাঁর Challenge and Response (প্রতিবন্ধকতা ও মোকাবেলা) তত্ত্বে বলেন, শুধু ভৌগোলিক পরিবেশ বা মানুষের নৃতাত্ত্বিক উন্নয়নের ফল হিসেবেই সভ্যতা গড়ে ওঠেনি বরং মানুষ তার প্রয়োজনের মুখোমুখি হতে গিয়ে অথবা প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে গিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলেছে। তাঁর মতে, মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় বলেই তা অতিক্রম করতে গিয়ে তার সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটায়।[৮] প্রাচীন বাংলায় নগরসভ্যতা হিসেবে ভরতভায়না যেমন একদিনে গড়ে উঠেনি তেমনি তার ক্রমবিকাশও একদিনে ঘটেনি। শত শত বছর ধরে এর বিকাশ ঘটেছে।[৯] বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের বর্ণনানুযায়ী এটা আনুমানিক ৯ম-১১শ শতকের একটি বৌদ্ধবিহার। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯২২ সালে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ ভরতভায়না ঢিবিটিকে সংস্কারের আওতায় নিয়ে আসে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক কাশিনাথ দীক্ষিত ১৯২৩ সালে প্রথম এই স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান। তিনি ভরতভায়নাকে ৫ম শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভরতভায়না ঢিবিটির বেড়ার দৈর্ঘ্য ২৪৩.৮৪/২৭৪.৩২ মিটার এবং উচ্চতা ১২.৯২/১৫.২৪ মিটার। দীক্ষিত এর পরিমাপ দেখান ১৬´×১৩´×৩। তিনি বলেন, বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট অঞ্চলে যে ৩০টি সঙ্ঘারাম পরিদর্শন করেন এ মন্দির তারমধ্যে অন্যতম।[১০] সে সময়ে তিনি কিছু সীমানা পিলারও স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম বলেন, খুলনা জেলার দৌলতপুরের ১৩ মাইল দক্ষিণে বুড়িভদ্রা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী ২১.৩৩ মিটার উচ্চ ও ২৭৪.৩২ মিটারেও বেশি

পরিধিবিশিষ্ট স্তূপ ভরতভায়না নামে পরিচিত। সম্ভবত এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপ।[১১] এছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে বলেছিলেন, প্রায় হাজার বছর পূর্বেও ২৪ পরগণার নানা স্থানে বৌদ্ধবিহার ছিল। এ অঞ্চলে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে পুঁথি পাঁজি রচনা করতেন। অন্য এক সূত্রমতে, মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রবাহ যশোর-খুলনা অঞ্চলেও পৌঁছেছিল। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, ভরতভায়নায় একটি বৌদ্ধ সংঙ্ঘারাম ছিল এবং পাশ্ববর্তী গ্রামে এই সংঙ্ঘারাম সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধদের বসবাস ছিল। ভরতরাজা ছিলেন এই সংঙ্ঘারামের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।[১২] তার রাজকোষের অর্থে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ সংসারত্যাগী হয়ে এ সকল সংঙ্ঘারামে জীবন অতিবাহিত করেন। আবিষ্কৃত এই বৌদ্ধবিহার অবিভক্ত বাংলার দক্ষিণবঙ্গে আবিষ্কৃত প্রথম সম্পূর্ণ ও তিনটি মন্দির বিশিষ্ট বৌদ্ধবিহার। এর পূর্বদিকে দুটো বৌদ্ধ মন্দির, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে টানা বারান্দা, ভেতরের বাইরের দিকে দেয়ালসহ সর্বমোট ৯৪টি কক্ষ রয়েছে।[১৩]

খননকার্য

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহে নিবিড় বীক্ষণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার শুরু হলেও ভরতভায়না দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রথম ১৯৮৪-১৯৮৫ সালে ভরতভায়না ঢিবির খননকার্য শুরু করে। এক দশক পর ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে পুনরায় খনন করা হয়। এরমধ্যে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর বাদে ২০০০-২০০১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতি মৌসুমে এখানে ধারাবাহিকভাবে খননকার্য অব্যহত থাকে। দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের খননদলের অংশগ্রহণে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভরতভায়না ঢিবির এক চতুর্থাংশের (উত্তর-পশ্চিমাংশ) স্থাপত্য কাঠামো উন্মোচনের নিমিত্তে পুনরায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য সম্পাদিত হয়। সম্প্রতি ভরতভায়না ঢিবিকে কেন্দ্র করে সমগ্র গৌরিঘোনা ইউনিয়নে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সরেজমিনে অনুসন্ধান পরিচালনা করেছে। এ অনুসন্ধানে অনেকটা এলাকা জুড়ে প্রাচীন বসতির প্রমাণ মিলেছে। তন্মধ্যে ভরতভায়না ঢিবি ছাড়াও দু'টি প্রত্নস্থল স্পষ্টই চিহ্নিত হয়েছে। এর একটি ডালিঝরা অপরটি ভরত রাজার বাড়ি। ভরতভায়না ঢিবি ও ডালিঝরা সতীশচন্দ্র মিত্র উল্লিখিত গড়খাই বা পরিখার বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত।[১৪]

আবিষ্কৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন

সংস্কৃতি মানুষের সার্বিক জীবন প্রণালী। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী টাইলর বলেন, সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে সব অভ্যাস ও দক্ষতা অর্জন করে এবং যেসব বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আইন, নৈতিকতাবোধ, প্রথা, আচার-আচরণ গড়ে তোলে সেগুলো একসাথে মিলে যে জটিল ও পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয় তাই সংস্কৃতি।[১৫] বিশেষ করে শিল্পকলা ও সাহিত্যে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে। ভরতভায়না প্রাচীন বাংলার মানুষের জীবনাচার, শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বহন করছে। অনেকের মতে, ভরতভায়না ছিল গুপ্তযুগের একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মচর্চা কেন্দ্র।[১৬] প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা

দেশের প্রাচীন সমাজ ইতিহাস বিনির্মাণে এক নতুন অধ্যায়। নিচে ভরতভায়নায় আবিষ্কৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করা হলো :

ক. **ভরতভায়না ঢিবি :** ভরতভায়না ঢিবি খননের ফলে একটি বৃহৎ স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। স্থাপনাটির উপরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। বিদ্যমান অংশটিকে সম্ভবত উপরে স্থাপিত মনোরম ক্রুশাকৃতি অট্টালিকার ভিত্তি বা উঁচু মঞ্চ বলে মনে হয়। খননের পর সমগ্র অট্টালিকার ভিত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত মোট ৯৪টি কক্ষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। চার পাশের ৪টি উইং ওয়ালের মধ্যে ১২টি কক্ষ ও ৮৩টি কক্ষ সমন্বয়ে এই দেউল তৈরি। এছাড়া দেউলের চূড়ায় রয়েছে ৪টি কক্ষ। এ কক্ষগুলোর দুপাশে আরো ৮টি ছোট কক্ষ রয়েছে।[১৭] অধিকাংশ কক্ষ মাটিতে পূর্ণ হয়ে ঢেকে গেছে।[১৮] এই অট্টালিকার ভিত্তি বিভিন্ন আকৃতির বদ্ধ প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়া এর নিচ থেকে উদ্ধার হয়েছে বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন কিছু সাংস্কৃতিক নিদর্শন। পাশাপাশি মন্দির পরিকল্পনার একটি কাঠামো বা নক্সা উন্মোচিত হয়েছে। এর তিনটি অংশ চিহ্নিত করা গেছে। এগুলো হলো: (ক) ক্রুশাকার বেষ্টনী (খ) বেষ্টনীর মাঝখান জুড়ে একটি মঞ্চ, কয়েকটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠ এবং (গ) মূল মন্দির। এর ভিত্তি বিভিন্ন আয়তন এবং বিভিন্ন দিকে বিন্যস্ত প্রচুর আড়াআড়ি দেয়াল ক্রমশ উপরের দিকে উন্নত করে নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষবিশিষ্ট একটি কাঠামো। আড়াআড়ি স্থাপিত দেয়ালগুলির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানসমূহে মাটি ভরাটের ফলে বহু বদ্ধপ্রকোষ্ঠ তৈরি হয়েছে।[১৯] তবে প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকের একটিও অক্ষত অবস্থায় মেলেনি। ছাঁচে তৈরি এবং হাতে গড়া দু'ধরনের ফলকেরই খণ্ডাংশ দেখে ধারণা করা হয় মন্দিরের দেয়াল অলংকরণ করার জন্য এসব ফলক ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া ঢিবি থেকে প্রায় ২০০ ফুট উত্তর-পূর্বকোণে পুকুর পাড়ে তিন ফুট গভীরতায় এই বৃহৎ ফলক পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবেত্তাদের ধারণা এটাই এ যাবৎকালে দেশে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে সর্ববৃহৎ।[২০] এই ফলকে তিনটি নারীমূর্তির অস্তিত্ব স্পষ্ট। এর মধ্যে প্রথমটি সম্পূর্ণ অক্ষত, দ্বিতীয়টি হাঁটুর উপর থেকে পা পর্যন্ত অক্ষত এবং তৃতীয়টি পায়ের পাতার খণ্ডাংশ। পরিহিত পোশাক-অলংকার থেকে অনুমিত হয় এগুলো নর্তকীর প্রতিমূর্তি। প্রথম মূর্তিটির উর্ধ্বাংশ নিরাভরণ, নিম্নাংঙ্গে চেক ধুতি পরিহিত। তাদের গলায় মোটা চেইন, হাতে কারুকার্যহীন চুড়ি, ফুলের ডিজাইন করা বাজুবন্দ, আর পায়ে রয়েছে মল। আর নর্তকীর হাতে রয়েছে একটি বাদ্যযন্ত্র। এছাড়া মানুষ ও গরুর মাথা, তৈলপ্রদীপ, মৃৎপাত্র, অলংকৃত ইট, পদচিহ্নযুক্ত ইট, বিভিন্ন রকমের পোড়ামাটির অলংকার ইত্যাদি পাওয়া গেছে। পোড়ামাটি ছাড়াও এই প্রত্নস্থল থেকে লোহার অস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রী, কড়ি এবং বেশ কিছু সংখ্যক পশুখণ্ড পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ভরতভায়নার প্রাচীন অধিবাসীদের প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের গভীর পরিচয়ের পাশাপাশি তাদের শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যপ্রীতি এবং বিভিন্ন ধরনের কারিগরী কাজে দক্ষতার বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলে।

খ. **ডালিঝরা :** ডালিঝরা প্রত্নস্থলটি ভরতভায়না ঢিবি থেকে প্রায় ১.৫ কি.মি. দক্ষিণে কাশিমপুর গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, ভরতের দেউল নির্মাণের পর নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের ডালি থেকে

অবশিষ্ট উপকরণ এখানে ঝেড়ে ফেলতো। সেজন্য এ স্থানের নাম হয় ডালিঝরা। প্রাপ্ত উপকরণ ও পরিপার্শ্ব থেকে অনুমিত হয় ভরতের দেউল নির্মাণের পর অবশিষ্ট উপকরণ দিয়ে ডালিঝরা নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে খননের ফলে ভরতভায়না ঢিবির অনুরূপ ইটের আস্তরণ, খোদাই করা সূর্য আকৃতির ইট (পরিমাপ ৮.২৫″×৭.৪৫″×১.৭৫″ এবং ১২″×৭″×২″) এবং নানা ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

গ. **ভরতরাজার বাড়ি :** ভরতভায়না ঢিবি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণে বাঁশবাগান ঘেরা প্রত্নস্থলটি ভরত রাজার বাড়ি নামে পরিচিত। এ বাড়ির নিকটে বুড়িভদ্রা নদী বাঁক নিয়েছে। এখানে প্রাপ্ত ইট, পাথর ও পোড়ামাটির টুকরো প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে মানুষ নির্মাণ চিন্তায় অনেক অগ্রসর ছিল। এখানে সাধারণ ও কুলুঙ্গিযুক্ত অলংকৃত ইট পাওয়া গেছে। এ ইটের পরিমাপ ৯.৭৫″ ×৯″×২.৭৫″। এছাড়া এখানে বড় আকারের দুই খণ্ড পাথর পাওয়া গেছে। একটির পরিমাপ হচ্ছে ২৭″×১১″×২৭″ এবং অন্যটির পরিমাপ হচ্ছে ২ ৮″×প্রস্থ ১′২″×৭″। পাথর দুটির দুই প্রান্তে সিঁড়ির ধাপ রয়েছে। এছাড়াও আরো দু'টি চমৎকার পাথরখণ্ড পাওয়া গেছে। একটি কৃষ্ণবর্ণের বেলে পাথর, যার পরিমাপ হচ্ছে ২২″×১৬.৫″×১। এটি কোনো প্রস্তরস্তম্ভের পাদপীঠ বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যটি কুমির ভাস্কর্যের একাংশ, যার পরিমাপ হচ্ছে ৫৬″×১৫″×২। ভাস্কর্যটি কোনো সিঁড়ির পাশে অথবা তোরণ বা প্রাচীরের উপরিভাগে বসানো ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। বর্তমানে এটি গৌরিঘোনা ইউনিয়ন পরিষদ অফিসসংলগ্ন মসজিদের সামনে রক্ষিত আছে।

ঘ. **গড়খাই বা পরিখা :** প্রাচীন ও মধ্যযুগে গুরুত্বপূর্ণ বসতি ও স্থাপনার চারদিকে নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট পরিখা থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। ভরতভায়নার তিনটি প্রত্নস্থলের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর সতীশচন্দ্র মিত্রের ভরতভায়না ঢিবির তিনপাশে গড়খাই থাকার অনুমানটি সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে প্রত্নঅঞ্চলটির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গড়খাইটি চিহ্নিত করা জরুরি ছিল। কারণ উল্লিখিত তিনটি প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন বিশ্লেষণে জানা যায়, ভরতভায়না ঢিবি ও ডালিঝারার কাছাকাছি সময়ে বসতি গড়ে উঠেছিল।

ঙ. **মাইধিল বিল :** তিনটি প্রত্নস্থলকে পাশে রেখে দক্ষিণ দিক থেকে পূর্বদিকে বয়ে যাওয়া বুড়িভদ্রা নদীর এক কালের খাত 'জাহাজ ডুবি' নামের চরসদৃশ স্থানকে ঘিরে রয়েছে একটি নিম্নভূমি ও জলাশয়। স্থানীয় জনগণের কাছে এটি মাইধিল বিল নামে পরিচিত। প্রবন্ধে আলোচ্য গড়খাই বলে যে খাতটিকে অনুমান করা হয়েছে তা এই মাইধির বিলের উত্তরাংশ থেকে শুরু করে সামান্য বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে 'ডাঙ্গি'র বিলের সাথে যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে গড়খাইটি ধানি জমিতে পরিণত হলেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটি যে সাধারণ ভূমি থেকে কিছুটা নিচু তা সহজেই অনুমিত হয়।

চ. **নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা :** পৃথিবীর সকল সভ্যতাই কোনো না কোনো নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। যেমন, টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা।[২১] তেমনি ভরতভায়নাও এর ব্যতিক্রম নয়। ভরতভায়না বুড়িভদ্রা

নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এ নদীর মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে ভরতভায়নার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য নগরের ন্যায় নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা হিসেবে ভরতভায়না বিকশিত হয়েছিল। মানববসতিগুলো এই স্থাপনাগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, বিকশিত হয়েছিল। সেগুলোর বিস্তৃতি অনেক ক্ষেত্রে সমসাময়িক নগরগুলোর চেয়েও বড় এলাকা জুড়ে ছিল। তার অর্থ এই নয় যে, এই বসতিগুলো নগরই ছিল। তবে গ্রাম বা বাণিজ্য-যোগাযোগ-প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে এই বসতিগুলোর যোগাযোগ ছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবনে ভরতভায়নার প্রভাব

যে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমাজ ইতিহাস বিনির্মাণে সহায়তা করে। ভরতভায়না দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের সমাজ ও সভ্যতার শেকড়। এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য তথা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিভূমি এই ভরতভায়না। ভরতভায়না ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের নগরসভ্যতা। এখানকার বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বহু নিদর্শন এবং সমকালীন মানুষের ব্যবহার্য বস্তু সংস্কৃতি এ অঞ্চলের সমৃদ্ধ সামাজিক ইতিহাস তৈরিতে সহায়তা করেছিল। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ বিশ্লেষণে জানা যায় এখানকার স্থাপনাগুলো গুপ্তযুগের (৩২০-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ)। এই যুগে বিশেষভাবে আরম্ভ হয় সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা। ভরতভায়নায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, সে সময়ে এ অঞ্চলের মানুষ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চল থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্যে যথেষ্ট প্রাগ্রসর ছিল। আজকে এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পিছনে ভারতভায়নার অবদান অনস্বীকার্য। ভরতভায়না প্রাচীন বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনাচার, শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাক্ষ্য বহন করছে। ভরতভায়নার মানুষের প্রাচীন মানুষের জীবনে বুড়িভদ্রা নদীর ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক। এ অঞ্চলের কৃষি, যাতায়াত, পরিবহন, প্রতিরক্ষা-প্রায় সব কাজেই এ নদী ব্যবহৃত হত। প্রাচীনকাল থেকেই এ এলাকা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শস্যভাণ্ডার হিসেবে স্বীকৃত। এখনো এখানকার উর্বর মাটিতে খুব ভাল ধান ও বিভিন্ন প্রকার সবজি উৎপন্ন হয়। এ থেকে অনুমান করা যায় তদানীন্তন সময়ে ভরতভায়নায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য নদীপথে বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হতো। জানা যায় এক সময় বুড়িভদ্রা নদীটি পূর্বে আরো প্রশস্ত ছিল। সুতরাং ভরতভায়না নৌযোগাযোগের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য নদীবন্দরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে এখানকার নদীকেন্দ্রীক সভ্যতা এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

উপসংহার

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থান ভরতভায়না খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, যা এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। ফলে ভরতভায়নার প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনেক গভীরে প্রোথিত। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নিনদর্শনগুলো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে এর নিবিড় পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও উৎখনন পরিচালনা করা হলে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন উন্মোচিত হতে পারে, যা এ অঞ্চলের সমাজ ইতিহাসকে নতুন করে বিনির্মাণে সহায়তা করবে।

সহায়ক তথ্যনির্দেশ

১. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মাদ হাবিবুল্লা পাঠান, উয়ারি-বটেশ্বর: শেকড়ের সন্ধানে, ঢাকা: প্রথমা, ২০১২, পৃ. ১৫

২. বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর, ঢাকা, জুন ২০০৬, পৃ. ১৭

৩. কে এম শাহনেওয়াজ, বিশ্বসভ্যতা, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬, পৃ. ১

৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) বাংলাপিডিয়া: জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ১০, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩, পৃ.১১৫

৫. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, খুলনা: রূপান্তর, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৩৫

৬. সৌখিন প্রত্নতাত্ত্বিক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নস্থলটি ভ্রমণ করে জানান, তখনও এর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি : তখনও ঢিবিটি ৯ মিটার উঁচু ও বেড় ছিল প্রায় ২৯২ মিটার। তবে ঢিবির চারদিকে ভূমি প্রায় সমতল এবং ঘাষের মাঝে প্রচুর ইট দেখেছেন। তার মতে, সবমিলিয়ে ঢিবির অংশ ধরলে ঢিবির পরিধি হবে ৪২৪ মিটার।

৭. প্রাগুক্ত, মার্চ ২০০৩, পৃ. ১১৫

৮. Arnold Joseph Toynbee, A Study of History, New York: Oxford, ১৯৬০, p. ২৩৪

৯. L.S.S.O Malley, Bengal Districts Gazeteer's Jessore, Calcutta, 1912, p.2

১০. K. N. Dikshit (edited), Report of Archeological Survey of India, Asiatic of India,1923, p. 76

১১. খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম, বাংলা বিশ্বকোষ, ৩য় খন্ড, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, জুলাই, ১৯৭৩, পৃ. ২৩৯

১২. প্রাগুক্ত, ২০০১, পৃ. ১৩৬

১৩. বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, ২০১৬, পৃ. ১১৩

১৪. এ কে এম শাহনাওয়াজ, সাম্প্রতিক প্রত্ন-গবেষণায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ১৪

১৫. এ কে নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯, পৃ. ১১৭

১৬. এ কে এম শাহনাওয়াজ, মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৪

১৭. জয়দেব চক্রবর্তী, ভরত রাজার দেওল সরকারি উদ্যোগ নিলে হয়ে উঠতে পারে নয়নাভিরাম পর্যটন কেন্দ্র, দৈনিক আমারদেশ, (ঢাকা) ১০ ডিসেম্বর ২০১৮

১৮. বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর, খুলনা, জুন ২০০৬, পৃ. ১৩

১৯. প্রাগুক্ত, ২০০৮, পৃ. ১২

২০. বর্তমানে ফলকটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই খণ্ডিত ফলকটির পরিমাপ বিবেচনায় জাদুঘর কতৃপক্ষ সম্পূর্ণ ফলকটির আকার অনুমান করেছেন ৫৬″×৩০″×৪″।

২১. পূর্বোক্ত, ২০০৮, পৃ. ১৩

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 68-85

বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বিকাশ : খুলনা মহানগরীর অভিজ্ঞতা

মহসিন মিঞা
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান
সরকারি জয়বাংলা কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail :m.mia2705@gmail.com

সারসংক্ষেপ

জাতীয় কিংবা বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষার অবস্থান সবসময়ই অগ্রগামী। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া কোন উন্নয়নই সম্ভবপর নয় যার মূল ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারিকরণ করলেও কিন্ডারগার্টেন নামক উপধারাটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়ই রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে কম হলেও শহর বা নগর এলাকায় এদের জনপ্রিয়তা বা বিস্তার দ্রুত বাড়ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা খরচে শিক্ষাসেবা নেয়ার বিপরীতে উচ্চ খরচে এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর জন্য অভিভাবকদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান হওয়ার ফলশ্রুতিতে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত শিক্ষার্থী সংকটে ভুগছে। ক্ষেত্রবিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধের উপক্রম হয়েছে। অন্যদিকে কিন্ডারগার্টেন নামক খরুচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘিরে এক ধরনের অশুভ তৎপরতা ও সামাজিক শ্রেণিকরণ হচ্ছে যার আর্থসামাজিক প্রভাব শুধু শিক্ষার্থী নয় বরং অভিভাবকদের মাঝেও বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ছে। সবমিলিয়ে খুলনা মহানগরীর শিশু শিক্ষায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর প্রকৃতচিত্র তুলে ধরার প্রয়াসেই এই নিবন্ধ রচনা।

মূলশব্দ

শিক্ষা, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কিন্ডারগার্টেন, খুলনা মহানগরী

ভূমিকা

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বৃটিশ আরোপিত শিক্ষার উত্তরাধিকার। জাতীয় চাহিদার সাথে এ শিক্ষার সংযোগ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দেশে প্রচলিত ত্রিস্তর বিশিষ্ট শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর প্রাথমিক শিক্ষা নামে পরিচিতি। জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল চালু আছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুল শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়-পূর্ব উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ। একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিক্ষার

সুযোগ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। তবে রাষ্ট্র যে সকল স্থানে শিক্ষা পৌঁছাতে পারেনি, সেখানে সম্পুরক হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিতে বাধ্য হচ্ছে। দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে। এরপরও এসব স্কুলের কাছেই ব্যক্তি উদ্যোগে এক বা একাধিক কিন্ডারাগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দেশে এভাবে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে ও পরিচালিত হচ্ছে, তার বেশিরভাই শিক্ষাবিজ্ঞান সমর্থন করে না।

উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা। এই সাধারণ উদ্দেশ্যকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল-

১. কিন্ডারগার্টেন স্কুল ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ;

২. কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহের কারণ অনুসন্ধান;

৩. কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন;

ব্যবহৃত পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটিতে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় প্রকার উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাতকার অনুসূচি ব্যবহার করে ১৫ জন শিক্ষার্থী, ২০ জন কিন্ডারগার্টেন স্কুল শিক্ষক, ১০ জন কিন্ডারগার্টেন স্কুল মালিক, ৩০ জন অভিভাবক, ১৫ জন মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও ৫ জন সুধীজনের নিকট থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা-সাংবাদিক, সুশীল সমাজের সদস্য প্রমুখের অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে। দ্বৈতয়িক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সুভ্যেনির, দৈনিক পত্রিকা ও ইন্টারনেটের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কসপ. কনফারেন্স, গোলটেবিল বৈঠক ও আলোচনা সভার সুপারিশ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করার পর পরিসংখ্যান কৌশলের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে তা সরল সারণি ও বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সমস্যার বিবৃতি

শিক্ষা মানুষের জন্মগত মৌলিক ও একটি মানবিক অধিকার। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণি, যার শিক্ষা আছে বিধায় রয়েছে সংস্কৃতি ও সভ্যতা। ফলে মানুষ নিজেকে সকল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন

এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা।[১] বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন একজন মানুষের মূল ভিত্তি হলো তার প্রাথমিক শিক্ষা। প্রতিটি শিশু তার জন্মলাভের পর থেকে বিদ্যালয়ে ভর্তির আগ পর্যন্ত পরিবারের কাছে বিশষত : মা-বাবার স্নেহ-ছায়ায় তার জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে শেখে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ শিশুদের সে সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করে, যা তাদের সুন্দর ভবিষৎ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মূলত এটি নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি প্রভৃতির উপর।[২]

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ৪ নম্বর অভীষ্ঠ হলো সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি। যার ৯.২ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা হলো ২০৩০ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়ের প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠার নিশ্চয়তা বিধান করা।[৩] দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় গত কয়েক বছরে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর শুরুটা হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই। ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রার সূচনা করেছিলেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক হিসেবে, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৮৫৩৮টি। ভর্তির হিসাব অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১০.০১ মিলিয়ন, জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৪.৪৮ মিলিয়ন, কিন্ডারগার্টেনে ভর্তির হার ১.৯৮ মিলিয়ন এবং মাদ্রাসায় ভর্তির হার ১.২৪ মিলিয়ন[৪]। তবে, কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কষ্টসাধ্য। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী দেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা- ২৪৩৬৩টি।[৫] তবে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদ এর তথ্যানুযায়ী, দেশে প্রায় ৬৫০০০ কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে অধিক সংখ্যক স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে।[৬]

সরকারি হিসেব মতে, দেশে জনসংখ্যা অনুপাতে সকল শিক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রশস্ত অবকাঠামো, খেলার মাঠ থাকা সত্ত্বেও অভিভাবক ও শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পক্ষান্তরে শহরাঞ্চলে বেশিরভাগ আবাসিক এলাকায় কোন ধরনের অনুমতি ছাড়াই যত্রতত্র কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠছে। ফলে একই এলাকায় কিন্ডার গার্টেন স্কুল, বেসরকারি স্কুল, সরকার অনুমোদিত স্কুল আবার সরকারি স্কুলও গড়ে উঠছে। দেশের অন্যান্য বিভাগের মত খুলনাতেও এ জাতীয় স্কুল গড়ে উঠেছে এবং উঠছেই।

কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

কিন্ডারগার্টেন স্কুল বর্তমানে জনপ্রিয় শিক্ষা পদ্ধতি। প্রাথমিক পর্যায়ের এ প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শিক্ষার হাতেখড়ি ঘটে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব শিশু পড়ে না, তাদের কাছে এটি অধিক জনপ্রিয়

প্রতিষ্ঠান। প্রাক-বিদ্যালয় হিসেবে কিন্ডারগার্টেন স্কুল বা শিশুমন-বিকাশ সাধক বিদ্যালয় হলো ৪ থেকে ৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এক বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা। নানা রকম খেলাধুলা ও সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আপনাকে ব্যস্ত করার ও শিশুকে গড়ে তোলার গুণের বিকাশ সাধনই কিন্ডারগার্টেন স্কুলের উদ্দেশ্য। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের আবির্ভাব ঘটে আঠারো শতকের তৃতীয় দশকে। জানা যায় এ শিক্ষা পদ্ধতির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছিল ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব। এ বিপ্লবের সময় শিশুশ্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সন্তানের জন্য স্কটল্যান্ডের ল্যানার্কে ১৮১৬ সালে রবার্ট ওয়েন নামে এক ব্যক্তি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুদের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের মানসিক ও মানবিক বিকাশে গুরুত্বারোপ করা হয় এ স্কুলে। তিনি ১৮৩৭ সালে ব্যাড ব্ল্যাংকেনবার্গে শিশুদেরকে বাড়ি থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত গমন এবং খেলা ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ধারণাকে কেন্দ্র করে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৮৩৮ সালে সুইজারল্যান্ডের পেস্টালোজা উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য হোম অ্যান্ড কলোনিয়াল স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে খেলার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক প্রশিক্ষণের জন্য জার্মানির দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও শিশু মনস্তত্ত্ববিদ এফ ফোয়েবল ক্লাঙ্কেনবার্গে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর এই শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুরা স্বাধীন ও আনন্দঘন পরিবেশে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ লাভ করবে। তার মতে, শিশুরা হলো বাগানের ফুলের চারার মতো।[৭] একজন শিক্ষককে শিশুর জন্য নিয়োজিত মালী হিসেবে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সররকম যত্ন নিতে হয়। স্কুলে শিশুদের এমন সব সৃজনশীল কাজের সুযোগ দিতে হবে যার মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবে।[৮] তার এ স্কুলের অনুসৃত পদ্ধতি পরবর্তী সময়ে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবেই পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক সাবলীল বিকাশ ও উন্নতি সাধন। শিশুর জন্য নির্ধারিত এই কাজ শিশু নিজ হাতে সম্পন্ন করবে।[৯] এ শিক্ষা পদ্ধতিটি শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। ফলে ফ্রোবেলের মৃত্যুর ২৫ বছরের মধ্যেই অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, জার্মানি, হল্যান্ড, হাঙ্গেরি, জাপান, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান প্রধান শহরে এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০] পরবর্তীতে অন্যান্য দেশেও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি চালু হয়।

বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে নিম্নলিখিত শর্তগুলোর উল্লেখ রয়েছে : (১) সকলের জন্য অভিন্ন ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সকল শিশুর জন্যে বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা বাধ্যতামূলক করতে হবে। (২) প্রয়োজন মাফিক শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে প্রশিক্ষিত করে সে সকল সেবায় মনোনিবেশ গড়ে তুলতে হবে। (৩) দেশ থেকে অশিক্ষা দূর করতে হবে। এসব শর্তগুলোর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারিভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে; যেমন, ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন। এছাড়া শিক্ষার আলো সবার মাঝে পৌঁছে দেয়ার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে গ্রহণ করা হয়

পাঁচ বছর মেয়াদী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং এটি দ্বিতীয় দফায় গ্রহণ করা হয় ১৯৯০ সালে। এতে করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত না হওয়ায় ১৯৯০ সালে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে আইনে পরিণত করে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সবার জন্যে শিক্ষা বিষয়ক কনফারেন্স হবার পর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০০ সালের মধ্যে তা কার্যকর করতে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে ১৯৯২ সালে ১ জানুয়ারি থেকে ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের মাঝে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও অশিক্ষা দূর করতে এবং প্রশাসনিক ও নীতিগত দিককে শক্তিশালী করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামক একটি পৃথক বিভাগের সূচনা হয়, যা প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে আগস্ট ১৯৯২-এ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] মূলত দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হবার ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে শুরু করে যা কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও বেসরকারি বিদ্যালয় নামে দুটি নতুন ধারা তৈরি করে। পরবর্তীতে সরকার কিছু বেসরকারি বিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া শুরু করলে এটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অনিবন্ধনকৃত বেসরকারি বিদ্যালয় নামে আরও একটি ধারা তৈরি হয়। এভাবে বেসরকারি শিক্ষাখাতে বাণিজ্যিক শিক্ষা বিকশিত হতে থাকে যা কেবল উচ্চবিত্তদের সন্তানদের পক্ষেই উচ্চ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা সম্ভব হয়।[১২]

বাংলাদেশে কিন্ডার গার্টেন স্কুল

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন ১৯৯০ অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তবে শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও এখনো এ শিক্ষানীতি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি ফলে পূর্ববর্তী ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্তই বাধ্যতামূলক পর্যায়ে বহাল আছে। ইতোমধ্যে এর বাইরে ১ম শ্রেণির পূর্বে প্রাক-প্রাথমিক নামক একটি নতুন শ্রেণি চালু হয়েছে। এ সকল শ্রেণিতে সরকারি কারিকুলাম অনুযায়ী একটি শিশু কোন শ্রেণিতে কি পড়বে, কতটুকু পড়বে, কিভাবে পড়বে সবকিছু নির্ধারণ করা আছে এবং সে অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড (এনসিটিবি) থেকে প্রয়োজনীয় বই ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরিবীক্ষণ করার জন্য রয়েছে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা প্রশাসন। তারপরেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তানদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে দেশে শিশু শিক্ষার জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যত্রতত্র কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠছে। এসব স্কুলে শিশুদের জন্য নেই সামঞ্জস্যপূর্ণ কারিকুলাম, বই-পুস্তক, পঠন-পাঠনের নিয়মশৃঙ্খলা, খেলারমাঠ, নেই শিক্ষক নিয়োগ ও দায়দায়িত্ব পালনের বিধিবিধান।[১৩] এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নীতিমালা না থাকায় এসব স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশৃঙ্খলা ও ব্যবসায়িক মনোভাব লক্ষ করা যায়। এসব স্কুলের বিরুদ্ধে সীমাহীন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের স্কুল নিবন্ধন আইনের আলোকে ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার একটি বিধিমালা তৈরি করে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে এই বিধিমালার অধীনে নিবন্ধন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। সে সময়ে দেশে মাত্র ৩০২টি প্রতিষ্ঠান

নিবন্ধন করলেও বাকি স্কুলগুলো নিবন্ধন করা থেকে বিরত থাকে। অথচ কিন্ডারগার্টেন স্কুল সমিতির তথ্যমতে, সারাদেশে এ ধরনের অন্তত ৭০ হাজার স্কুল রয়েছে। পাড়া-মহল্লার অলি-গলি, ফ্ল্যাট বাড়ি বা ছাদে সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

মূলত কিন্ডারগার্টেন স্কুলে চড়ামূল্যে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এসব স্কুলে মূলত প্লে-গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেন স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, এ পর্যন্ত মূল্যায়ন কমিটির চারটি সভায় ৬১৪টি কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিসি অ্যান্ড অপারেশন বিভাগের তথ্যানুযায়ী, এ স্কুলগুলোর ২৮৩টি ঢাকা বিভাগের। কমিটি সিলেট বিভাগের ৫টি এবং চট্টগ্রাম বিভাগে মাত্র ৩টি কিন্ডার গার্টেনকে সুপারিশ করেছে। রংপুরে সুপারিশ পেয়েছে ১৫৪টি, খুলনায় ১১২টি, রাজশাহীতে ৪৮টি এবং বরিশালে ৯টি।[১৪]

খুলনা মহানগরীতে কিন্ডার গার্টেন স্কুল

খুলনা মহানগরের প্রাথমিক শিক্ষার তদারকি কর্তৃপক্ষ খুলনা সদর থানা শিক্ষা অফিস। তাদের কাছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য যতটা গোছালোভাবে সংরক্ষিত থাকে কিন্ডারগার্টেনের তথ্যগুলো ততটা নয়। কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল বিষয়ক প্রচলিত নীতিমালায় এসব স্কুলের প্রতিষ্ঠা-অনুমোদন-নিবন্ধন-নিয়োগ-পরিচালনা-মনিটরিং কোন বিষয়েই তাদেরকে সুস্পষ্ট কোন দায়িত্ব দেয়া নেই। ফলে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সাথে তাদের সম্পর্ক বার্ষিক বই বিতরণ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি তথ্যফরম জমাগ্রহণ কেন্দ্রিক। তার মানে যেসব স্কুল তাদের থেকে বই নেয় না বা বিদ্যালয় শুমারির তথ্য দেয় না সেসব স্কুলের তথ্যও তাদের কাছে নেই। তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, খুলনা মহানগরীতে বসবাসকারী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। মহানগরের স্কুলগুলোকে মনিটরিংয়ের সুবিধার্থে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডভিত্তিক ৭টি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে।

সারণি ১ ক্লাস্টার ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ডভিত্তিক বিদ্যালয়ের অবস্থান

ক্লাস্টার	ফুলবাড়ি বি. কে	বীণাপাণি	স্যাটেলাইট টাউন	কাজী আঃ বারী	সোনাডাঙ্গা	সোনাপোতা	দক্ষিণ টুটপাড়া	মোট
কেসিসি ওয়ার্ড	১, ২ এবং যোগীপোল ও আড়ংঘাটা ইউনিয়ন	৩, ৪, ৫, ৬, ৭	৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫	১৪, ১৬	১৭,১৮, ১৯,২০, ২৫, ২৬	২১,২২,২৩, ২৪,২৭,২৯	২৮,৩০,৩১	৩১টি ওয়ার্ড ও ২টি ইউনিয়ন
সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	১৭টি	১৯টি	১৫টি	১৭টি	২৩টি	১৯টি	১৬টি	১২৬টি
কিন্ডারগার্টেন স্কুল	০৯টি	০৯টি	২৪টি	১৪টি	২৭টি	৪৫টি	১৯টি	১৪৭টি

সুত্র : থানা শিক্ষা অফিস,খুলনা সদর, খুলনা, মার্চ ২০২০

এছাড়াও ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীর অভাবে চারটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা অফিসের কাছে মহানগরীর যে সংখ্যার কিন্ডারগার্টেনের তথ্য আছে প্রকৃত সংখ্যা নাকি তার থেকেও বেশি বলে গণমাধ্যমে প্রকাশ এবং সংখ্যাটি ৩০০ এর অধিক।[১৫] সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে কিন্ডারগার্টেনের সবথেকে বেশি বিস্তার হয়েছে মহনগরীর প্রাণকেন্দ্র সোনাপোতা (ময়লাপোতা) ও আশেপাশের এলাকায় এবং সবথেকে কম দৌলতপুর- ফুলবাড়িগেট এলাকায়।

শিল্পনগরী খুলনাতে স্বাধীনতাপূর্বকাল থেকেই কিন্ডারগার্টেন ধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল। নগরে এই ধারার ১ম স্কুল ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সোনাডাঙ্গা এলাকার 'ন্যাশনাল দিবা প্রাইমারি স্কুল'। এরপর ১৯৬৮ সালে খালিশপুর এলাকায় চালু হয় 'এলিজাবেথ মার্বল প্রাথমিক বিদ্যালয়'। পরবর্তীতে সত্তর ও আশির দশকে স্বল্পমাত্রায় বাড়লেও নব্বই দশক থেকে ব্যাপকহারে বাড়তে থাকে কিন্ডারগার্টেন স্কুল। সব থেকে বেশি সংখ্যক কিন্ডারগার্টেনের যাত্রা শুরু হয় এ শতকের প্রথম দশকে। নিচে খুলনা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠাকালের ভিত্তিতে কিন্ডারগার্টেনের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো-

সারণি ২ প্রতিষ্ঠাকালের ভিত্তিতে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পরিসংখ্যান (১৯৬১-২০২০)

বছর	১৯৬১-১৯৭০	১৯৭১-১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১০	২০১১-২০২০	মোট
স্কুল সংখ্যা	০২টি	০৯টি	১৪টি	৩৪টি	৪৭টি	৪১টি	১৪৭টি

সূত্র : থানা শিক্ষা অফিস,খুলনা সদর,খুলনা, মার্চ ২০২০

প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি ২০১৮ এর তথ্যমতে, দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় কিন্ডারগার্টেনের হার ১৮.১৬%।[১৬] খুলনা মহানগরীতে প্রাথমিক শিক্ষার তুলনামূলক চিত্রে দেখা যাচ্ছে প্রাক প্রাথমিক, ১ম ও ২য় শ্রেণিতে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীসংখ্যা বেশি হলেও ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে সংখ্যাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে এখনও কম। কারণ হলো অনেক কিন্ডারগার্টেনের কার্যক্রমই ২য় শ্রেণি পর্যন্ত। তবে সংখ্যাগত দিক দিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে কিন্ডারগার্টেন এগিয়ে গেলেও মোট শিক্ষার্থীসংখ্যায় এখনও তারা পিছিয়ে আছে। তবে বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে এ চিত্র পাল্টে যেতে বেশিদিন নাও লাগতে পারে। কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেন তো শিক্ষার্থী সামাল দিতে দুই শিফট্ চালু করেছে। নিচে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীসংখ্যার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো-

সারণি ৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

স্কুলের ধরণ	প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৯৯টি	৫১৭৫টি	৫১০৮টি	৫৩৫৪টি	৫২১৭টি	৪৩৭৫টি	২৯,১২৮টি
কিন্ডারগার্টেন স্কুল	৪৭১৮টি	৬০২২টি	৫৭৯৩টি	২৮৯২টি	২৪৪৬টি	২০৮২টি	২৩,৯৫৩টি

সূত্র : থানা শিক্ষা অফিস, খুলনা সদর, খুলনা, মার্চ ২০২০

মহানগরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ভূমিকা দৃশ্যমান। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় এসব স্কুলে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত আছেন।[১৭] তবে খুলনা সদর থানা শিক্ষা অফিসের তালিকাভুক্ত স্কুলগুলোর তথ্য বিশ্লেষণে এই সংখ্যাটা একটু বেশিই মনে হয় যদিও তাদের কাছে থাকা তালিকার দ্বিগুন স্কুলের তথ্য গণমাধ্যমেই প্রকাশিত যা তাদের সংরক্ষণে নেই। সারণি-৪ এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারী সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো–

সারণি ৪ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীর তুলনামূলক চিত্র

ধরন	প্রধান শিক্ষক	সহকারী শিক্ষক	কর্মচারী	মোট
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬ জন	৯২২ জন	৩৩ জন	১০৮১ জন
কিন্ডারগার্টেন স্কুল	১৪৭ জন	১৫৬৭ জন	২১৯ জন	১৯৩৩ জন

সুত্র : থানা শিক্ষা অফিস, খুলনা সদর, খুলনা, মার্চ ২০২০

দেখা গেছে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ নিজেদের পদবীকে অধ্যক্ষ হিসেবেই নির্ধারণ করেছেন যদিও এই স্তরের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অধ্যক্ষ পদবী ব্যবহার করা রেওয়াজ বা নিয়মসিদ্ধ নয়।[১৮] সাধারণত কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানগণ এ পদবী ব্যবহার করেন।

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেল মহানগরীর কিন্ডারগার্টেনগুলো চলছে 'ফ্রি স্টাইলে'। কারণ ২০০৭ ও ২০১১ সালে দু'দফায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রবর্তিত কিন্ডারগার্টেন নীতিমালায় এসব স্কুলের অনুমোদন বা নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয় । শুরুতে এসব স্কুলের অনুমোদনের দায়িত্ব ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যলয়ের কাছে। বর্তমানে তা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বে নেয়া হয়েছে। এই দুই কর্তৃপক্ষ খুলনা মহানগরে ৩ পর্যায়ে ১১টি কিন্ডারগার্টেনকে সাময়িকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দেয়। এগুলো ছাড়া নগরীর বাকি কিন্ডারগার্টেনগুলো অনুমোদহীনভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেহেতু অনুমোদনের বাধ্যতা নেই এবং অনুমোদন নেয়ার বাড়তি সুবিধা-অসুবিধাও নেই তাই কঠিন শর্ত মেনে- অর্থ খরচ করে অনুমোদন বা নিবন্ধন নেয়াকে বোকামিই মনে করছেন অনেকে। ফলে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও অনুমোদনে যেসকল কঠিন শর্ত রয়েছে সেগুলো থোড়াই কেয়ার করে যত্রতত্র গড়ে উঠছে এসব প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি স্কুলের ন্যূনতম দূরত্বের শর্তটাও মানা হয়নি অনেকক্ষেত্রে।

বেশিরভাগ স্কুলের প্রতিষ্ঠার পেছনের কাহিনী বিশ্লেষণে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য বা বেকারত্ব মোচনের উপায়কেই মুখ্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। যার ফলে ব্যবসায়িকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে আকর্ষণীয় সুযোগসুবিধার প্রতিশ্রুতিতে কার্যক্রম শুরু করেছে এসব স্কুল। অনেক স্কুলেই নেই স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ-পদোন্নতি-বরখাস্ত স্কুল মালিকের ইচ্ছাধীন। শিক্ষকদের শিক্ষাগত

যোগ্যতা বা শিক্ষণ দক্ষতার ন্যূনতম মানও অনেকসময় অবহেলিত থাকে। স্কুলের ভর্তি ফি, মাসিক বেতনসহ অনেক খাতে অর্থ নেয়া হয় মর্জিমাফিক যার কোন মনিটরিং নেই।

তবে সবথেকে শংকাজনক এই যে, এসব স্কুলের পাঠ্যক্রমে জাতীয় কারিকুলামের গুরুত্ব খুবই ক্ষীণ। সরকারি চাপে সাম্প্রতিককালে জাতীয় টেক্সটবুক বোর্ডের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেও কারিকুলামের বাইরের বইয়ে তাদের আগ্রহ বেশি। এসব বইয়েই মূলধারার সাথে তাদের পার্থক্য ও বিশেষত্ব এনে দিয়েছে বলে তারা মনে করেন। কিন্তু এসব বইয়ের তথ্য-উপাত্ত সঠিক মানসম্মত ও যাচাইকৃত কিনা সে প্রশ্ন শিক্ষাবিদ-সুধীজনদের। তারা মনে করেন - কোন বয়সের শিশুকে কী কী বিষয়ে কতটুকু শিখতে হবে তা বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে কারিকুলামে স্পষ্ট করা আছে । তাই কারিকুলামের বাইরে গিয়ে শ্রেণিপাঠ্য হিসেবে মানে প্রশ্নবিদ্ধ বাড়তি বই পড়ানো শিশুর ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির কারণ

খুলনা মহানগরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং সেখানে বিনামূল্যে বিদ্যার্জনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে যে, তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন অভিভাবকগণ তাদের সন্তানকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়াতে আগ্রহী। বিভিন্ন কারণে এসব স্কুলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভর্তি করে থাকেন -

১. তারা মনে করেন এসব স্কুলে সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে। পক্ষান্তরে সমাজের প্রান্তিক বা নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পড়াশুনা করে। ফলে সহপাঠী হিসেবে একই সামাজিক শ্রেণির বাচ্চাদের সাথে বেড়ে উঠতে পারবে যা তার ব্যক্তিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

২. এসব স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করানোকে অভিভাবকরা সামাজিকভাবে মর্যাদাকর বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে স্কুলের অধিক বেতন, ভালো সঙ্গী পাওয়া, অপেক্ষাকৃত ভালো পরিবেশ, পোশাকের চাকচিক্য যেমন কারণ হিসেবে কাজ করে তেমনি অভিভাবকদের সামাজিক অবস্থানটাও গুরুত্বের মধ্যে পড়ে।

৩. বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ আকর্ষণীয় প্রচার ও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে থাকে। যেমন- ডায়েরি লিখন, ভালো ফলাফল, খাতা সরবরাহ, নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ, ক্লাস পার্টি, বার্থ ডে পার্টি ছাড়াও মজার ও আকর্ষণীয় অনেক কার্যক্রম শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে।

৪. কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কোর্স ও বইয়ের সংখ্যা মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে সাধারণতঃ বেশি। ফলে এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা জাতীয় কারিকুলামের অতিরিক্ত বইয়ের কারণে অল্প বয়সে অধিক

কিছু জানতে পারে যা মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হয়ত পারে না। সন্তানের এই বেশি পারার বিষয়টি অভিভাবকদের মানসিক শান্তি দেয় ও গর্বিত করে।

৫. কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের আধুনিকতা ও আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে। এসব স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা শিক্ষার্থীদের দেয়া বিভিন্ন ফি নির্ভর বিধায় শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের পারদর্শিতা ও দায়িত্ববোধের বিষয়ে স্ব-আরোপিত সচেতনতা থাকে যেটা অভিভাবকগণ পছন্দ করেন।

৬. স্কুলের কর্মঘণ্টাও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তিতে অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে। এসব স্কুলে প্রভাতী/দিবা শাখা আছে এবং স্কুলে অবস্থানকাল ১-২ ঘন্টার মত যেটা শিক্ষার্থী-অভিভাবক সবার জন্য সুবিধাজনক। বিশেষতঃ কর্মজীবী অভিভাবকগণ তাদের অফিস সময়ের সাথে সমন্বয় করে স্কুলের শিফট্ নির্ধারণ ও আনা-নেয়া করতে পারেন।

৭. নিরাপত্তা ইস্যুটাও গুরুত্বপূর্ণ। মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেসব ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার অনেকগুলেতেই অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে নির্মাণ ত্রুটি থাকে। ফলে নির্মাণের অল্প সময়ের ব্যবধানে ভবনসমূহ জীর্ণ-শীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লেও প্রক্রিয়াগত বাস্তবিক জটিলতার কারণে যথাসময়ে সংস্কার করা সম্ভব হয় না বিধায় অভিভাবকগণ সন্তানদের প্রাণের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে বিকল্প চিন্তা করেন। এছাড়া এসব স্কুলে কার্যক্রম চলাকালে প্রবেশ দ্বারে সিকিউরিটি গার্ড নিয়োজিত থাকে বলে শিশুদের স্কুল অবস্থানকালের নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকরা স্বস্তিতে থাকেন যেটা মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাস্তবতায় প্রায় অসম্ভব।

৮. নামী কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষায়তনিক পরিবেশ বিশেষতঃ স্বাস্থ্যকর শ্রেণিকক্ষে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের কারণে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, মাল্টিমিডিয়া সুবিধা, যুগোপযোগী শিখন উপকরণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌক্তিক অনুপাত, মানসম্মত আসন ব্যবস্থা, মানসম্মত টয়লেট সুবিধা, পরিবহন সুবিধা, প্রতিক্ষালয় সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলো অভিভাবকদের আকর্ষণ করে বিপরীতে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বাস্তবিক কারণে উপর্যুক্ত বিষয়ের সুবিধাসমূহ কাঙ্খিত মানের নেই।

৯. স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের জবাবদিহিতার বিষয়টিও অভিভাবকদের পছন্দের আরেকটি কারণ। শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের সন্তুষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের চাকুরীর ভবিষ্যত নির্ভরশীল বিধায় এক্ষেত্রে তারা উঁচু পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার চেষ্টা চালায় বলে অভিভাবকগণ মনে করেন। বিপরীতে মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের স্থায়ী ও প্রায় অবদলিযোগ্য চাকুরী বলে এমন জবাবদিহিতা তাদের থেকে পান না বলেই মনে করেন।

১০. সচেতন অভিভাবকদের একটা বড় অংশ মনে করেন বর্তমান সরকারি প্রাথমিক সকল শিক্ষকদের গুণগত মানও কাঙ্খিত পর্যায়ের নয়। যুক্তি হিসেবে তারা বলছেন সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ৬০% নারী কোটা থাকে, এছাড়া পোষ্য কোটাসহ অন্যান্য কোটার কারণে তুলনামূলক কম যোগ্য অনেকেই

শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন। বিশেষত এসব পদে নারীদের চাহিত শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুদিন আগেও এসএসসি পাশ ছিল যা বর্তমান কারিকুলাম পাঠদানের জন্য যথেষ্ট বলে তারা মনে করেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ জাতীয়করণের সুযোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুযোগ পেলেও তাদের মান অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করতে পারছে না।

১১. প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের আধিক্য এবং তাদের একইসাথে সংসার ও কর্মক্ষেত্র সামলাতে হয় বিধায় দীর্ঘক্ষণ কর্মস্থলে থাকতে থাকতে তারা ক্লিশে হয়ে যান। তাদের আচরণ অনেক সময় খিটকিটে হয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি মমতাপূর্ণ ও যত্নশীল আচরণ করতে পারেন না। যার প্রভাবটা শ্রেণি পাঠদানে নেতিবাচকভাবেই পড়ে বলে অভিভাবকরা বিকল্প হিসেবে কিন্ডার গার্টেন স্কুলকে পছন্দ করছেন।

১২. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণিতে ভর্তির ন্যূনতম বয়স ৬ বছর। অথচ কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে ৩ বছর বয়স থেকেই প্লে/ নার্সারি/ কেজি-১/কেজি-২ নামের প্রাক-স্কুল প্রচলিত যা অতি সচেতন অভিভাবকদের বহুলাংশ আকৃষ্ট করে। যদিও সম্প্রতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রথমে নূন্যতম ৫ বছর বয়সীদের জন্য ১ বছর মেয়াদী এবং পরবর্তীতে ন্যূনতম ৪ বছর বয়সীদের জন্য ২ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু করা হয়েছে তা এখনও সচেতন অভিভাবকদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর তুলনায় মন কাড়তে পারেনি।

১৩. অতি সচেতন অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ স্কুলিং নিয়ে খুব সতর্ক থাকেন। তাদের ভাবনায় ৩য় শ্রেণিতে একটা ভালো স্কুলে (জিলা স্কুল /করোনেশন স্কুল) ভর্তি করাতে পারলে একসাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরটা নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে। এসব স্কুলের তুমুল ভর্তিযুদ্ধে টিকে থাকতে যতবেশি আপডেট থাকতে হয় তার প্রস্তুতিকাল হিসেবে সরকারি প্রাথমিকের চেয়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলকেই অভিভাবকরা বেশি পছন্দ করছেন। নিচে অভিভাবকদের কিন্ডারগার্টেন ভর্তিতে আগ্রহের কারণ তুলে ধরা হলো-

সারণি ৫ কিন্ডারগার্টেন ভর্তিতে আগ্রহের কারণ (উত্তরদাতাদের মতামত)

ক্রমিক নং	আগ্রহের কারণ	সহমত	ভিন্নমত	উত্তর দেননি/নেয়া হয়নি
০১	আকর্ষণীয় প্রচার	৬৭ জন	২১ জন	১২ জন
০২	সমশ্রেণির সহপাঠী	৭৭ জন	০৬ জন	১৭ জন
০৩	সামাজিকভাবে মর্যাদাকর	৫৬ জন	২১ জন	২৩ জন
০৪	অধিক শেখানো	৭৮ জন	১৬ জন	০৮ জন
০৫	শিক্ষকদের আধুনিকতা	৭২ জন	১৭ জন	১১ জন
০৬	স্কুলের কর্মঘন্টা	৮৮ জন	০৮ জন	০৪ জন

০৭	স্কুলের নিরাপত্তা	৭১ জন	২২ জন	০৭ জন
০৮	শিক্ষায়তনিক পরিবেশ	৭৬ জন	১২ জন	১২ জন
০৯	স্কুলের জবাবদিহিতা	৬৬ জন	১৬ জন	১৮ জন
১০	মূলধারার স্কুলের মান অবনতি	৬২ জন	১৭ জন	২১ জন
১১	প্রাকস্কুলের সুবিধা	৮১ জন	০৬ জন	১৩ জন
১২	৩য় শ্রেণির ভর্তিতে এগিয়ে থাকা	৫৮ জন	২৬ জন	১৬ জন

সূত্র : মাঠ পর্যায়ে জরিপ, মার্চ ২০২০

উপর্যুক্ত এসব কারণে মহানগরীতে কিন্ডারগার্টেন স্কুল সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থী সংকটে বাধাগস্ত হচ্ছে। এসব বিষয়ে শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের সদস্যরা বলছেন- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী আকর্ষণে ব্যর্থ হচ্ছে।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

চিরায়তভাবে প্রতিটি ঘটনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিকই থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে বর্তমান ধারার কিন্ডারগার্টেন অভিভাবকদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হলেও এর কিছু খারাপ দিকও প্রতিভাত হচ্ছে। তাই দুটো দিককেই আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হল-

ক. কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ইতিবাচক প্রভাব

অনুকূল পরিবেশ : প্রাক-বিদ্যালয় হিসেবে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে কোমলমতি শিক্ষার্থীর বয়সসীমা সাধারণত ৩ থেকে ৫ বছরের হয়ে থাকে। তাদের মনের মাঝে সর্বদা পারিবারিক পরিবেশ বিরাজমান থাকে। অনুকূল পরিবেশই তাদের শিক্ষাজীবনের মূল ভিত্তি। সাধারণত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত যৌক্তিক এবং শিক্ষিকাদের সংখ্যাই বেশি থাকে যারা মাতৃস্নেহে অনুকূল পরিবেশে যত্নের সাথে শিখন প্রক্রিয়া চালান।

অধিক শিক্ষণ : অনেক অভিভাবকের ধারণা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে তাদের বাচ্চারা অল্প বয়সে বেশি কিছু জানতে ও শিখতে পারছে। এতে তারা মানসিকভাবে কিছুটা উঁচু অবস্থানে থাকেন। নামী স্কুলে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষায় এই অধিক জানা কিছুটা সুবিধাও দেয়।

সৃজনশীলতার চর্চা : এসব স্কুলে বাচ্চাদের সৃজনশীল প্রতিভার (নাচ/গান/আবৃত্তি/অংকন/অভিনয়/অন্যান্য) চর্চা বা চর্চায় উৎসাহ বেশি দেয়া হয় বলে অতি অল্প বয়সে বাচ্চারা এসকল দক্ষতায় অভিভাবকদের মানসিকভাবে খুশি ও সামাজিকভাবে সম্মানিত করে।

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি : কিন্ডার গার্টেন স্কুল ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে ভূমিকা রাখছে। অর্থাৎ

বাচ্চা কোন স্কুলে পড়ছে তার মাধ্যমে পিতামাতার সামাজিক মর্যাদা নিরুপিত হচ্ছে। নামী কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর অভিভাবকরা মর্যাদা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে একটু ভালো অনুভূতিতে থাকেন।

তুলনামূলক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি : একটু ভালো মানের শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহের কারণে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো তাদের মান বাড়াতে বাড়তি উদ্যোগ নিচ্ছে। অনেক কিন্ডারগার্টেন যেমন বিশেষ কারিকুলাম /কোর্স/সেবা চালু করছে তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও সরকারিভাবে সারাবছর নানান উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণ সেরকম একটি উদ্যোগেরই ফল।

বেকারত্ব মোচন : বিভিন্ন বাস্তবিক কারণে যারা কোন কর্মে প্রবেশ করতে পারেননি এসব স্কুল তাদের কর্মস্থানের অন্যতম অবলম্বন হচ্ছে। তেমনি এসকল স্কুলে পড়াশোনার বাড়তি চাপের কারণে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশনের বড় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খ. কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নেতিবাচক প্রভাব

বইয়ের বোঝা : কিন্ডার গার্টেন স্কুলে প্লে গ্রুপে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কোনো বই না থাকলেও এ স্তরের শিশুদের বাংলা, অংক, ইংরেজি, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি ব্যাকরণ, জ্যামিতি, অ্যাকটিভ ইংলিশ, ধর্ম, সাধারণ জ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি, ওয়ার্ড বুক, ড্রয়িং বুকসহ ১৪টি ডায়েরি কিনতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তী ক্লাস নার্সারিতেও ১২টি বই ও ১৫টি ডায়েরি কিনতে হয়। আবার কেজি-১ এ এনসিটিবির তিনটি বইসহ ১২টি বই পড়ানো হচ্ছে। এভাবে প্লে গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসে এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা চাপানো হয়। মূলত স্কুল কর্তৃপক্ষ বাড়তি মুনাফার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে এসব নিম্নমানের বই কিনতে বাধ্য করে।

শৈশব হরণ : অতিরিক্ত বইয়ের সাথে সহশিক্ষা কার্যক্রমের চাপ সামলাতে স্কুল সময়ের বাইরেও বাচ্চাদেরর কোচিং সেন্টার/ প্রাইভেট ব্যাচ/হাউস টিউটরের কাছে সময় কাটাতে হয়। এতে করে তাদের নিজেদের মত অবসর বিনোদন বা খেলাধুলা করার সময় বের করা কঠিন হয়ে যায়। এভাবেই শিশুর জীবন থেকে প্রতিনিয়ত চুরি যাচ্ছে মধুর শৈশব।

শিশুর মনোজগতে চাপ : কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিজের ইচ্ছার তেমন প্রতিফলন ঘটে না। বরং তাদের বাবা-মার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে অনেকখানি। অনেক বাবা-মা তাদের নিজের জীবনের অপারগতা বা অপ্রাপ্তি সন্তানের মাধ্যমে পূরণ করতে চান বলে যেসব স্কুল অল্প বয়সেই সন্তানকে অলরাউন্ডার বানিয়ে দেবে তেমন স্কুল হিসেবে কিন্ডার গার্টেনকেই বেছে নেন। এসব স্কুলের অতিরিক্ত চাপ শিশুর মনোজগতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অশুভ প্রতিযোগিতা : এসব স্কুল অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের অশুভ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কার বাচ্চা কত বেশি শিখছে, কত বেশি করছে, কার কতগুলো ব্যাচ বা প্রাইভেট টিউটর এসব নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগেই থাকে যার প্রভাব কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পারস্পারিক

সম্পর্কের ওপরও পড়ে। বাড়তি হিসেবে বাচ্চাদেরকে স্কুলে আনা-নেয়া করা অভিভাবকদের যোগ্যতা-দক্ষতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা ইত্যাদি বিষয়েও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন।

গৃহবিবাদ বৃদ্ধি : বাড়তি চাপের কারণে কিন্ডারগার্টেন ধারার শিক্ষায় অভিভাবকদের অংশগ্রহণ ও বাড়তি দায়িত্বের ভার সাধারণ প্রাথমিকের তুলনায় অনেক বেশি। এই দায়িত্ব ভাগাভাগি নিয়ে যেমন গৃহবিবাদ হয় তেমনি কোন স্কুলে,কয়টা ব্যাচ/কোচিং/হাউস টিউটর রাখা দরকার/অদরকার এ নিয়েও প্রায়শ লেগে যায়। বাচ্চাদের স্কুল-কোচিং সঙ্গী মায়েদের ফ্যাশন-কেতাদুরস্তার চাহিদা মেটানোর বাড়তি খরচও গৃহবিবাদের অন্যতম কারণ। নিয়মিত বাচ্চাদের স্কুলে বা কোচিংয়ে আনা-নেয়ার মধ্যকালীন সময়ে কোন কোন অভিভাবককে গৃহের বাইরে স্কুল বা কোচিংয়ের প্রতিক্ষালয়ে কাটাতে হয়। তবে সবথেকে অবাক করা তথ্য হলো এই সুযোগটাকে কেউ কেউ পরকীয়ার সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায় এবং এ নিয়ে গৃহবিবাদ সংসার ভাঙ্গা অব্দিও গড়ায়।

দুর্নীতিতে উৎসাহ : কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নির্ধারিত-অনির্ধারিত নানাবিধ ফি/চাঁদা/সেবামূল্য, শিক্ষা উপকরণ, পোষাক, টিফিন, স্কুল পরিবহন, কোচিং-হাউস টিউটর মিলিয়ে বিশাল ব্যয়ের সাথে যোগ হয় স্কুলকেন্দ্রিক অভিভাবকদের লাইফস্টাইল খরচ। বিনামূল্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বিপরীতে এত অতিরিক্ত খরচের দায় সামলাতে গিয়ে কেউ কেউ অবৈধ রোজগারের পথে পা বাড়াচ্ছেন।

কর্মদক্ষদের সেবা : এসব স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন সমন্বিত বা স্বীকৃত পদ্ধতি নেই। তাই যোগ্যদের পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু -সুহৃদ বা পরিচিত অনেকে ন্যূনতম যোগ্যতা নিয়েই চাকুরী পেয়ে যান। স্বীকৃত কোন চাকুরী ছেড়ে এ পেশায় এসেছেন এমনটাও খুব একটা নেই। শিশু শিখন পদ্ধতির ওপর সরকারিভাবে কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগও তাদের কম। এর বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমোগ তুলনামূলক বেশি যোগ্যরা শিক্ষক হিসেবে নিয়ে নিয়োগ পান এবং নিয়োগ পরবর্তী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর শিক্ষকদের মাত্র ১৫ শতাংশ ছিল প্রশিক্ষিত। অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার ছিল ৯৪ শতাংশ। তাই বলাই যায় যে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে প্রকৃতপক্ষে তুলনামূলক কম যোগ্যদের আন্তরিক সেবা পাওয়া যায়।

অসম সামাজিকীকরণ : কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে সাধারণত সচ্ছল পরিবারের শিশুরা ভর্তি হয়। ফলে সমাজের অসচ্ছল অংশের সাথে তাদের পরিচয়ই হচ্ছে না। জানতেই পারছে না সমাজের এই বিপুল অংশের শিশুর ভাষা-সংস্কৃতি, চিন্তা-বিশ্বাসসহ দৈনন্দিন হাসি-কান্না। ফলে তাদের শিশুকাল থেকেই একমুখী সামজিকীকরণ হয় যা সুনাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়।

শ্রেণি বৈষম্যের সৃষ্টি : শিশুদের স্কুলিং এর ভিত্তিতে সমাজে একটি শ্রেণিকরণ প্রচলন হচ্ছে যেখানে বেশি খরচের স্কুলগুলোতে শুধু ধনিক শ্রেণির সন্তানেরা পড়বে। এ ধরনের খরচে নামী কিন্ডারগার্টেন

স্কুলগুলো একেকটা ব্রান্ড যেখানে নামী ব্রান্ডের ভোক্তা হিসেবে ধনিক শ্রেণি নিজেদের আলাদা করতে পারে। এসব স্কুলে ভর্তির আগেই অভিভাবকের আর্থিক সামর্থের খোঁজ নেয়া হয় যা স্পষ্টতই শ্রেণি বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। সীমিত আসন সংখ্যার কারণে এ ধারার স্কুলে ক্ষমতাবান শ্রেণির তদবির নৈরাজ্যের ঘটনাও ঘটে।

শিশু শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ : এসব স্কুলের বেতন-ফি বিষয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তেমন একটা নেই। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ উঁচুহারে ভর্তি ফি, মাসিক বেতনসহ বছরব্যাপী নানান ফি আদায় করে। পরিচালন ব্যয় বাদে তাদের এতটাই মুনাফা হয় যে অনেকে স্কুলের নতুন নতুন শাখা খুলতে উৎসাহী হয়। এটা এতই লাভজনক যে কিছু স্কুল মালিকরা মুনাফার টাকা দিয়ে স্কুলের নামে বিশাল বাণিজ্যিক শপিং কমপ্লেক্সও গড়ে তুলেছেন। ফলে ব্যবসায়িক লাভের আশায় অনেকেই এ ধরনের স্কুল খুলছে। শিশু শিক্ষার এমন বাণিজ্যিক বিস্তার মোটেই সুখকর নয়।

মানহীন স্কুলের বিস্তার : কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর মালিকেরা অভিভাবকদের থেকে বিপুল অর্থ আদায় করলেও কর্মরত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ খুব কমই ব্যয় করেন। ফলে আর্থিকসহ অন্যান্য বিষয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এসব স্কুলের শিক্ষকরাই আবার নতুন নতুন স্কুল খুলে বসেন। রাতারাতি এসব স্কুলের জন্য কাংখিতমানের শিক্ষক বা পরিবেশ তৈরি করতে না পারলেও তাদের মানহীন কার্যক্রমে চালু রাখে যাতে অনেক অভিভাবক প্রতারিত হন।

কোচিং বাণিজ্যের প্রসার : এসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত বই ও পড়াশোনার বাড়তি চাপ সামলানোর জন্য নগরে প্রচুর কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট ব্যাচ চালু হয়েছে। এরা শর্টকাট উপায়ে ফলাফলমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে নিজেদেরকে স্কুলের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে যা শিশুর সামাজিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সরকারি স্কুলগুলোর অধঃগতি : কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ক্রমবিকাশের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা বা শিক্ষার মান দুটোতেই ধ্বস নেমেছে। সচেতন-সচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিশুরা কিন্ডার গার্টেনে চলে যাওয়ার কারণে এসব স্কুলে পড়ে থাকছে অসচেতন বা অসচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা যাদের পিছনে প্রচুর খাটুনি দিয়েও ভালো ফলাফল করানো কঠিন। ফলে এসব স্কুলের শিক্ষকেরাও হতাশা থেকে অনেক সময় হাল ছেড়ে দেন।

শিক্ষকতায় পুনর্বাসন : কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কারণে প্রচলিত প্রবাদ 'যার নেই কোন গতি-সে করে পন্ডিতি' দ্বারা উপহাস প্রবণতা বাড়ছে। যে কেউ ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই এ ধরনের স্কুল মালিক হবার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। তিনি আবার তার স্বামী/ স্ত্রী, সন্তান, জামাতা/পুত্রবধু, ভাই-বোনকেও শিক্ষক পরিচয় দিয়ে দেন যোগ্যতার বাছ-বিচার ছাড়াই। অনেকের শিক্ষাজীবন শেষ না হলেও নিজেরাই শিক্ষক হয়ে যাচ্ছেন। আবার শিক্ষাজীবন শেষে প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ প্রক্রিয়ায়

ব্যর্থ অনেকের শেষ আশ্রয় হয় এই পেশায়। ফলে শিক্ষকতা পেশার গুণগত মান এবং সামাজিক মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার ক্রমাবনতি হচ্ছে।

স্কুলের পরিবেশ : কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর অনেকেরই নিজস্ব মালিকানার সুপরিকল্পিত শিশুবান্ধব স্কুল ক্যাম্পাস নেই বরং বিভিন্ন পুরাতন আবাসিক ভবন/ ফ্লাটবাড়ির ১-২ টি ফ্লোর বা ছাদ অথবা এমন কোন সংকীর্ণ ঘিঞ্জি পরিবেশে স্কুল চালু করছে যেখানে খেলার মাঠ নেই, পর্যাপ্ত আলো বাতাসও নেই। এমন পরিবেশ শিশুর শারিরীক ও মানসিক বিকাশকে ত্রুটিপূর্ণ করে।

শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের সদস্যরা মনে করেন - কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সংখ্যক বইয়ের বোঝা চাপিয়ে শিশুর শৈশবকে নষ্ট করা হচ্ছে। এছাড়া অধিক পড়ার চাপে শিশুরা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে এবং তাদের সুষ্ঠু মানবিক ও মানসিক বিকাশ ব্যহত হচ্ছে। পাশাপাশি এর দীর্ঘমেয়াদি বহুমাত্রিক আর্থ-সামাজিক প্রভাব পড়ছে। তাহলে কেনইবা অভিভাবকরা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে শিক্ষার নামে নিজ সন্তানের ক্ষতি ডেকে আনছেন? তাদের মতে- প্রকৃতপক্ষে সচেতন অভিভাবকদের মনোজাগতিক পরিবর্তন ও সাহায্য ছাড়া এই সংকটের পরিত্রাণ নেই। তারা যদি তাদের সন্তানকে মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনেন এবং কিন্ডারগার্টেনের মতই নিয়মিত যাতাযাত করেন তাহলে এসব স্কুলের যোগ্যতার পরীক্ষায় প্রমাণিত এবং দক্ষতার প্রশ্নে প্রশিক্ষিত শিক্ষকরা প্রাণশক্তি ও উৎসাহ ফিরে পাবেন। তখন শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে যেমন কাংখিত মান ফিরে আসবে পাশাপাশি অবকাঠামো-পরিকাঠামোগত বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশেরও উন্নতি হবে। কিন্তু পরিবেশের দোহাই দিয়ে যদি অভিভাবকেরা এসব স্কুল থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়ে উন্নত পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দায়টা এককভাবে সরকারের কাধে দেন তাহলে তা বাস্তবসম্মত হয় না। বরং রাষ্ট্রের প্রাচীনতম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও কিছু দায় থেকে যাবে।

সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে যে স্বপ্ন আমরা দেখছি ,তার সফল বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত দেশের মতো মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতি করতে হবে। সেজন্য যা করা দরকার তা হলো–

ক) প্রাথমিক শিক্ষার সকর ধারাকে সমন্বিত করে একটি অভিন্ন কারিকুলামে শিশুদের নিয়ে আসা।

খ) পরবর্তী ধাপের স্কুল ভর্তিতে কারিকুলাম বহির্ভুত শিক্ষার উপযোগিতাকে রহিত করা।

গ) সরকারি কারিকুলামের বাইরের অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা ও পড়াশোনার চাপ শিশুর জন্য কতটা ক্ষতিকর সে বিষয়ে গণমাধ্যম বা অন্যকোনভাবে অভিভাবকদের সচেতন করা।

ঘ) সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ ও যুগোপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ।

ঙ) সব থেকে যোগ্য ও মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়ে আসা এবং তাদেরকে এ পেশায় আগ্রহী করতে ও টিকে থাকতে আকর্ষণীয় আর্থিক সুবিধার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা

চ) বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষকতায় গুণগত মানসম্পন্ন জনশক্তি পাবার জন্য পেশায় প্রবেশের পূর্বে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, শেখানোর যোগ্যতা ও চারিত্রিক নথি যাচাইপূর্বক সনদ প্রাপ্তির শর্তারোপ করা যেমনটা চিকিৎসক বা আইনজীবীদের ক্ষেত্রে আছে।

ছ) প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষকদের যুগোপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ও কার্যকরী প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করা।

জ) সরকারি বা মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিপাঠকে আরো আকর্ষণীয় ও সময়পযোগী করা।

ঝ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব ও আন্তরিকতাকে আরো বেশি জবাবদিহিমূলক করা

ঞ) শিক্ষকদের কাজের কৃতিত্ব ও দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রণোদনা বা তিরস্কার প্রচলন করা

ট) যত্রতত্র ব্যক্তি উদ্যোগের কিন্ডারগার্টেন চালুর তৎপরতাকে নিষিদ্ধ করা

ঠ) কিন্ডারগার্টেন স্কুলোর বাণিজ্যিক উদ্দ্যেশ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা

ড) পরবর্তী ধাপের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) সরকারি প্রাথমিকে পড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া

ঢ) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা

ণ) শিক্ষা প্রশাসনে দুর্নীতিমুক্ত যোগ্য, দক্ষ ও স্থায়ী ব্যবস্থাপক দল দ্বারা পরিকল্পপনা ও নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং করা।

ত) প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে নিয়মিত গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা

থ) সর্বোপরি শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ ও অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত এবং যৌক্তিক পরামর্শ গ্রহণ করা।

উপসংহার

সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁতের মতে, মানুষের উন্নতি বিশেষভাবে শিক্ষার উন্নতির উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের উন্নতি মানেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন। তাই শিক্ষার সুযোগ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। তবে রাষ্ট্রের পক্ষে যে সকল স্থানে শিক্ষা পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, সেখানে সম্পূরক হিসেবে অনিবার্যভাবে বেসরকারি উদ্যোগকে অনুমোদন দিতেই হচ্ছে। কিন্তু নগর বা শহর এলাকায় এধরনের উদ্যোগ কোন স্তরে কতটা প্রয়োজন তার সমীক্ষা হওয়া উচিৎ। শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তরে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানায় পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার যে চিত্র এই নিবন্ধে ফুটে উঠেছে তাতে রাষ্ট্রীয় আকাংখার কতটুকু পূরণ হচ্ছে সে বিষয়ে আরো গভীর ও বিস্তৃত পরিসরে গবেষণার উপযোগিতা প্রতীয়মান হয়। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান মালিকদের লাভালাভ এবং অবিভাবকদের চাহিদা ও মনোতুষ্টির ওপর ভিত্তি করে বিপুল সংখ্যক শিশুর ভবিষ্যতকে প্রশ্নবিদ্ধ রেখে আগামী প্রজন্মকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলাটা কাম্য নয়। বরং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা-কারিকুলাম বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিভাবে নিয়মিত তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে পারলে দেশের গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হবে বলে আশা রাখি।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা: এনসিটিবি, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ.৩

২. মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কিছু ভাবনা: জাপানের অভিজ্ঞতা', দৈনিক কালেরকণ্ঠ (ঢাকা), ৩০ আগস্ট ২০১৯, পৃ. ৪

৩. পূর্বোক্ত, ৩০ আগস্ট ২০১৯, পৃ. ৪

৪. Nurul islam Nazem (edi). National Atlas of Bangladesh, Dhaka: Asiatic Society, 2017, p. 290

৫. www.dpe.gov.bd

৬. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষায় আমাদের করণীয় কী? দৈনিক কালেরকণ্ঠ (ঢাকা), ৬ মার্চ ২০১৯

৭. স্যামুয়েল কোয়েনিগ, সমাজবিজ্ঞান (অনুবাদ: রংগলাল সেন), ঢাকা: বই বিতান, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৩

৮. পূর্বোক্ত, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৩

৯. মো. আজাহার আলী ও হোসনে আরা বেগম, শিক্ষাদানের কলা কৌশল ও পদ্ধতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০০১, পৃ. ৫১

১০. ইমরুল ইউসুফ, কিন্ডাগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতিকে কে প্রথম শুরু করেছিল? দৈনিক ভোরের কাগজ (ঢাকা), ৪ জুলাই ২০১৮

১১. মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, অ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রম ও জাতীয় উন্নয়ন, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা- ৯৬, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬, পৃ. ৪০-৪১

১২. সরোয়ার বাশার, বিশ্বায়ন এবং বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা- ১০৯, এপ্রিল-জুন ২০০৯, পৃ. ৩৯

১৩. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যাপিং অত্যাবশ্যক, দৈনিক কালেরকণ্ঠ (ঢাকা), ১৬ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৮

১৪. শাওয়াল খান, কিন্ডারগার্টেনের আত্মপরিচয় সংকট কী পরিকল্পিত? দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ (ঢাকা), ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১৫. খুলনায় তিন শতাধিক অবৈধ কিন্ডারগার্টেন, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ (ঢাকা), ২৯ অক্টোবর ২০১৬

১৬. এক নজরে প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি ২০১৮, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, পৃ. ৩

১৭. মিনা অছিকুর রহমান দোলন,অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন খুলনার কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকেরা, দৈনিক প্রবর্তন (খুলনা), ১৪ এপ্রিল ২০২০

১৮. খুলনায় অনুমোদনহীন কিন্ডারগার্টেনে নাজুক শিক্ষার পরিবেশ, দৈনিক সংগ্রাম (ঢাকা), ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 86-116

পূর্ববাংলার কবিতায় পাকিস্তান-চেতনা

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি বিভাগ), শহীদ আবুল কাশেম কলেজ
কৈয়াবাজার, হরিণটানা, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : bibhutim7@gmail.com

সারসংক্ষেপ

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ঘোষিত লাহোর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন শুরু হয়, তার ঢেউ পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানদের দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করে। কেবল রাজনৈতিক বা ভৌগোলিকবৃত্তে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পাকিস্তানি চেতনা প্রতিষ্ঠাও এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তাই পাকিস্তানি চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সংগঠন-সংসদ গড়ে ওঠে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিগতকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের মতো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও বাংলা তথা পূর্ববাংলার সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমানদের স্বাধিকার অর্জন এবং ইসলামের প্রসারই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। সে কারণে পাকিস্তান চেতনার বৈশিষ্ট্য বা উপাদানের মধ্যে ছিল (ক) ইসলামি আদর্শ ও দর্শন প্রতিষ্ঠা, (খ) ইসলামের আলোকে পাকিস্তান বিনির্মাণ, (গ) ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি। পূর্ববাংলার কবিকুলের একটি অংশ পাকিস্তানি জজবায় বা পাকিস্তান চেতনা দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তারা তাদের কবিতায় পাকিস্তান চেতনা প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এইসব কবি রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, নজরুল-সাহিত্যের ইসলামিকরণ করতে চেয়েছিলেন, বাংলাভাষার বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের কাব্যে অনাবশ্যকভাবে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেছিলেন, কবিতার রূপক-উপমা-চিত্রকল্পের খোঁজে তারা ইসলামি অনুষঙ্গের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, কবিতার বিষয়-বক্তব্য খুঁজতে পুঁথিসাহিত্য ও ইসলামি কাহিনি উপাখ্যানের শরণ নিয়েছেলেন। তাদের পাকিস্তান চেতনাপ্রসূত কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-কল্পনা, পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপার সম্ভাবনা, জিন্নাহর প্রশস্তি-বন্দনা, পাকিস্তান সব পেয়েছির দেশ, ইকবাল-প্রসঙ্গ, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রগতিশীলতা ও কমিউনিজমের বিরোধিতা প্রভৃতি। এই কবিরা ইসলাম ও পাকিস্তানকে, বলতে গেলে, প্রায় অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। পাকিস্তানি ধারার কবিদের কেউ কেউ সারাজীবনই পাকিস্তান চেতনা ধারণ ও লালন করেছেন। কেউ কেউ পরবর্তীকালে সেই চেতনা থেকে ফিরে এসে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছেন, কেউবা কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, কেউবা পাকিস্তান চেতনার কবিতাকে অস্বীকার করেছেন। বিশেষ একটি সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে

রচিত এইসব কবিতায় পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানের অন্তর্গত জীবনদর্শন, ধর্মীয় ভাবাবেগ ও রাজনৈতিক বিশ্বাস মিলিয়ে যে রাষ্ট্র-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছিল এই প্রবন্ধটি তারই একটি মসীচিত্র অংকনের প্রয়াস।

মূল শব্দ

পূর্ববাংলা, জিন্নাহ, পাকিস্তান, ইসলাম, বাঙালি মুসলমান

ভূমিকা

পাকিস্তান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাঙালি মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিত্বশীল অংশ পাকিস্তান-স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাকিস্তান-আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে তারা পাকিস্তান এবং ইসলামকে এক ও অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হলে তাদের পাকিস্তান-প্রেম আরও তীব্র এবং সংহত হয়ে ওঠে। পাকিস্তান মানে ইসলাম এবং মুসলান, বাঙালিত্ব মনে হিন্দুত্ব এবং পৌত্তলিকতা-এই বোধে তারা আক্রান্ত এবং প্রভাবিত হন। ফলে পাকিস্তান এবং ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হলে বাঙালিত্ব পরিহার করতে হবে। বাঙালিত্ব বর্জনের মানসে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ এবং নজরুলকে শুদ্ধিকরণ করা হয়, বাংলাভাষার বিরোধিতাপূর্বক মুসলমানি বাংলা কিংবা পাকিস্তানি বাংলা নির্মাণের লক্ষ্যে কবিদের একাংশ তাদের কবিতায় ব্যাপকভাবে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের অযৌক্তিক প্রয়োগ শুরু করেন। বাংলা কবিতা স্বতন্ত্র এক পথে বাঁক বদল করে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটি প্রাদেশিক গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। এই কবিতায় যেন স্বাভাবিক প্রবাহ অনুপস্থিত হয়ে পড়ে, কবিতাগুলোকে কষ্টকল্পিত এক খাপছাড়া সৃষ্টি কলে মনে হয়। এসব কবিতা তেমনভাবে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে না, কেবল উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে বাংলাভাষার ওপর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন শুরু হলে তার প্রতিবাদে বাঙালির আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটলে এই সব কবির কেউ কেউ তাদের মত ও পথ পরিবর্তন করেন, কেউ কেউ পূর্বতন আদর্শে অবিচল থাকেন। ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ দু'কুলপ্লাবী জলোচ্ছ্বাসের মতো উত্তুঙ্গ হয়ে উঠলে পাকিস্তান-চেতনাবাহী এইসব কবি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কবল থেকে পূর্ববাংলা, বাঙালি এবং বাঙালিত্ব রক্ষা পাওয়ার সাথে সাথে বাংলা কবিতাও পাকিস্তানের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করে।

উদ্দেশ্য

সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে যুগ-প্রভাব এবং যুগ-বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে কবিতার ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। যুগবৈশিষ্ট্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিতাকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। যুগকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শনও বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সাহিত্যের যুগবিভাগ না হলেও একটি প্রদেশ বা ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক কালবিভাজন সাহিত্যকে, বিশেষত কবিতাকে, কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে, ভুল-রাষ্ট্রদর্শনের মোহে

কবিরা কতটা অন্ধ হয়ে যেতে পারেন, কবিতার মতো মহৎ একটি শিল্পীমাধ্যমকে কীভাবে নষ্ট করা যেতে পারে, কবিতাকে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কীভাবে তার গতিপ্রবাহকে পেছন দিকে ফেরানো যেতে পারে- এসব বিষয় সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে পাকিস্তান আমলে রচিত পূর্ববাংলার কবিতা ও কাব্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বিশেষ অস্থিরতাপূর্ণ একটি সময়ে বিশেষ কতকগুলো উদ্দেশ্যসাধনে কৃত্রিম একটি কবিতা কাঠামো তৈরি করলেও কালপ্রবাহ মোকাবেলা করে তা বেশি দূর এগোতে পারে না। এই ধ্রুব সত্যটাও প্রকটিত হয় পাকিস্তানি ধারার কবিতার পরিণতির দিকে তাকালে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই গবেষণাপত্রের লক্ষ্য মূলত পাকিস্তান কালখণ্ডে রচিত বাংলা কবিতায় পাকিস্তান-চেতনা অনুসন্ধান করা।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

পাকিস্তান শাসনামলে রচিত পূর্ববাংলার কবিতা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা বা গবেষণামূলক রচনা চোখে পড়েনা। অনুসন্ধানে জানা যায় নিতাই দাস এই বিষয়ে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সাঈদ-উর-রহমান পূর্ববাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতির সাথে কবিতার প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেছেন। এদের রচনার কিছু কিছু উদ্ধৃতি এই গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

পদ্ধতি

গবেষণাপত্রটিতে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ববাংলা পূর্বপাকিস্তান নামে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। পূর্ববাংলা আবহমান বাংলা ও বাঙালির এক অখণ্ড সত্তার উত্তরাধিকারী। চিরকালীন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ পূর্ববাংলা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বিভেদের এক বিপন্ন ভূ-খণ্ড হয়ে ওঠে। ভাষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা গোটা জীবন ব্যবস্থাই সাম্প্রদায়িক বিষে নীল হতে শুরু করে। আধুনিক বাংলা কবিতার ইসলামি ধারাটি সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হয় এবং ইসলামের মাহাত্ম্যকে হীন স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান-চেতনার অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে মুসলিম পুনর্জাগরণ। পাকিস্তান চেতনার ধারায় বাংলা কবিতা স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। 'দ্বি-জাতি তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজনীতিকদের পাশাপাশি অনেক মুসলিম সাহিত্যিকও চেষ্টা চালান। বাঙালি হিন্দু সাহিত্যিকদের অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের মূলধারা থেকে পৃথক অবস্থান সৃষ্টি করাই ছিল তাদের লক্ষ।'[১] পাকিস্তান রাষ্ট্র বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করার পূর্বে থেকেই এইসব কবি-সাহিত্যিক, বিশেষত কবিরা, তাদের কবিতায় পাকিস্তানের জয়গান গাইতে শুরু করেন। পাকিস্তান তাদের চিন্তা-চেতনায় গাঢ়তর স্বপ্ন-কল্পনার আভা বিস্তার করতে থাকে। পাকিস্তানকে তারা মানস প্রতিমার মতো সাজাতে শুরু করেন তাদের কবিতার উপাচারে। পাকিস্তানকে নিয়ে এইসব কবির

আশা-আকাঙ্ক্ষা-উৎসাহ-উদ্দীপনা-উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না। কোনো কোনো কবির চোখে স্বপ্ন ভাসতো, পাকিস্তান একটি আদর্শ ধর্মরাজ্য হিসেবে গড়ে উঠবে। এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। কারও মনে হতো পাকিস্তান হবে 'সব পেয়েছি'র দেশ। কেউ মনে করতেন পাকিস্তানে মানবতা ও মানবাধিকারের পূর্ণতম প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটবে। কোনো কোনো কবি পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তানি ভাবধারার সাহিত্য রচনার উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। "পাকিস্তান প্রস্তাব রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানকে যেমন একটি স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করে, তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও হীনমন্যতাবোধ দূর করে ও হিন্দু লেখকদের প্রভাবমুক্ত করে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনেও পড়ে।'[২] পাকিস্তানি ধারার কবিরা কবিতার ভাবগ্রহণ এবং আঙ্গিক নির্মাণেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পালনে সচেষ্ট হন। বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ একটি উত্তরাধিকারকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে পূর্ববাংলার একদল কবি আরব-ইরানের ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট কবিতার আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং পূর্ববাংলার কবিতায় অনুরূপ একটি ধারা নির্মাণে প্রয়াসী হন। এই লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার কবিতায় তারা প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের ব্যবহার এবং স্বতন্ত্র বানানরীতি চালু করেন, যা যতটা না কবিতার প্রয়োজনে তার চেয়ে বেশি কবির উদ্দেশ্যমূলক ইচ্ছাপূরণে। কোনো কোনো কবির কবিতায় এইসব ভাষার এতবেশি অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায় যে, সে সব কবিতাকে বাংলা কবিতা হিসেবে শনাক্ত করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকী কবিতার বক্তব্যও পাঠকের কাছে অধরা থেকে যায়। উপমা-রূপক-চিত্রকল্প নির্মাণেও তারা আরব-ইরানের ইতিহাস-ঐতিহ্য-লোককথা-উপকথার দ্বারস্থ হয়েছেন। এছাড়াও তারা স্বদেশের ইসলামি পুঁথিসাহিত্য থেকেও রসদ সংগ্রহ করেছেন।

বিষয়টি এভাবেও বলা যায় যে, পাকিস্তানি ভাবোন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত পূর্ববাংলার এইসকল কবি পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রচারে তাদের কবিতাকে হাতিয়ার করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই কোনো কোনো কবির স্বপ্নভঙ্গ হয়, তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে, কেউবা আবার পরিবর্তিত সকল পরিস্থিতির মধ্যেও পূর্বতন দর্শনও আদর্শে অবিচল থাকেন। পূর্ববাংলার কবিকুলের মধ্যে যারা পাকিস্তানবাদী কবি হিসেবে স্বীকৃত এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর সময়ে প্রতিষ্ঠিত, তাদের কবিতায় পাকিস্তান-চেতনার স্বরূপ-সন্ধান করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে এই প্রবন্ধে। পাকিস্তানবাদী কবিদের অগ্রগণ্য ছিলেন গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭), বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), ছদরুদ্দিন (১৯১০-১৯৯০), আজহারুল ইসলাম (১৯১১-), রওশন ইজদানি (১৯১৭-১৯৬৭), তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), মুফাখখারুল ইসলাম (১৯২১-), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) প্রমুখ। এঁদের পাকিস্তান চেতনাপ্রসূত কবিতাকেই যথাসম্ভব আলোচনায় আনা হয়েছে। পূর্ববাংলার কবিদের মধ্যে এমন ক'জন কবি আছেন যারা ঠিক পাকিস্তানবাদী কবি নন কিন্তু তাৎক্ষণিক পাকিস্তানমোহে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বীরত্ব ও কৃতিত্বে গৌরব বোধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের সেই মোহ ও গৌরব অপসৃত হলেও সেই সময়ে তারা জিন্নাহ-

বন্দনা করে এবং তাঁর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে আবেগময় কবিতা লিখেছিলেন। প্রবন্ধের প্রথম অংশের উপজীব্য মূলত পাকিস্তানবাদী কবিদের কবিতায় পাকিস্তান-চেতনা।

ইসলামি ঐতিহ্য এবং প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের কবি গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) সাহিত্য সাধনায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এতটাই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে 'পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তিনি পুরোপুরি পাকিস্তানি কবিতে পরিণত হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে পাকিস্তানের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন।'[৩] কবি-দম্পতির সম্পাদনায় ১৩৫৬ সালে 'মাসিক নওবাহার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল 'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচার করা, কম্যুনিজমের বিস্তার রোধ করা এবং বিশ্ব মুসলিম জাহানের তামাদ্দুনিক সংযোগ নিবিড় করা।'[৪] এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রচার চালান তিনি। ধারণা করা হয় যে, নজরুল কাব্যে ইসলামবিরোধী এবং পাকিস্তানবিরোধী ভাব খুঁজে বের করার আড়ালে গোলাম মোস্তফা নিজেকেই পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে উপস্থাপিত করার মনোবাসনা পোষণ করেছিলেন।[৫] পাকিস্তানের জাতীয় কবি হবার বাসনা থেকেই তিনি পাকিস্তানের প্রশস্তি-বন্দনা করে কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তাঁর 'তারানা-ই-পাকিস্তান' (১৯৪৮) কাব্যে ১৫টি পাকিস্তানি গান সংকলিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্টের মধ্যরাত্রিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত হয় গোলাম মোস্তফা রচিত- 'সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা/দুনিয়াতে ভাই যে কোন্ স্থান / পাকিস্তান সে পাকিস্তান / আসমানের ওই মিনার চূড়ে / উড়ছে কার সবুজ নিশান / পাকিস্তান সে পাকিস্তান।'[৬] গানটি যেন পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত। 'তারানা-ই পাকিস্তান' কাব্যের ১নং গানটি পড়লে মনে হয়, সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা পূর্ববাংলার ভৌগোলিক অবস্থানে যেন উষর মরু-পর্বতময় পশ্চিম পাকিস্তানকে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা, গানটিতে পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলির জলকল্লোল মুখরিত বিস্তীর্ণ ধানখেতে বাতাসের শব্দ শোনা যায়।

পাকিস্তানের প্রশস্তি-বন্দনা করে তিনি লিখেছেন-

'পাকিস্তান সে ইজ্জৎ মোদের আযাদী মোদের মান
ফুলের যেমন খোশবু তেমন আমাদেরো পাকিস্তান;
পাকিস্তান সে মোদের আশা
পাকিস্তান সে মোদের ভাষা
জানো কি ভাই এই দুনিয়ায় ফিরদৌস তোমার সে কোন্ খান
পাকিস্তান সে পাকিস্তান ॥'[৭]

নব গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে অনেক সমস্যা ও ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরেছিলেন তিনি। বিশেষত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের সাথে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল। কোনো বিরূপ পরিস্থিতিতে যেন পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙে না পড়ে সেজন্য তাদেরকে চাঙ্গা রাখার জন্য তিনি গান লিখেছেন।

'(ওরে ও) ওরে মোমিন ভাই তুই করিস কেন ভয়।
পাকিস্তানের দুর্দিন যাবে-হবে হবে জয় ॥
(ওরে ও) পাকিস্তান সে নয় কাঁচা রঙ-পাকা রঙ সে ভাই
পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার সাধ্য কারো নাই।
এসেছে সে থাকার তরে যাবার তরে নয়।'[৮]

পাকিস্তানপ্রেমের কারণেই পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার প্রতিও কবির বিশেষ শ্রদ্ধা ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়। সগর্বে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানিয়েছেন-'উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান / চাঁদ-তারা-সাদা আর সবুজ মিশান-/ আমাদের কওমী নিশান।'[৯] পাকিস্তানের পতাকা কবির চোখে সাম্যবাদের প্রতীক। তিনি এও মনে করেন, এই পতাকা আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিমূর্ত প্রকাশ।

'তারা সে ইসারা সাম্যবাদের
প্রতীক সে অগণিত গণ-মানবের
চাঁদ সাথে দেখা তার মিলন মহান
আমাদের কওমি নিশান ॥'[১০]

পাকিস্তানকে গড়ে তোলার জন্য কবি তরুণদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। 'চল্ চলরে মুকুলদল/ চল ওরে চঞ্চল / মোদের শাখায় শাখায় আয়রে আজি / ফুটাই ফুল ও ফল / আজ নতুন আশার স্বপ্ন মোদের চক্ষে ঝলমল।'[১১] পাকিস্তানের নারীদেরও জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন তিনি। 'হাজেরা, রহিমা, খাদিজা, আয়শা, ফাতিমা, চাঁদ সুলতানা, সুলতানা রাজিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট রমণীর মতো করে মুসলিম নারীকুলকে জেগে ওঠার জন্য কবি আহবান জানিয়েছেন।'[১২] পাকিস্তান-অনুসারীদের 'পাকিস্তানের কওমী ফৌজ'[১৩] এবং 'পাহারাদার'[১৪] বলে আখ্যা দিয়ে দুর্নীতিবাজদের প্রতিরোধ করতে বলেছেন। সম্পদ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার জন্য কবি চাষী, ব্যবসায়ী, কামার, কুমোর, তাঁতি, ডাক্তার, হাকিম, ইঞ্জিনিয়ার সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। আহবান জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রয়োজনে খাঁটি মানুষ হতে। পাকিস্তানকে তিনি সকল দেশের সেরা বলে অভিহিত করেছেন।[১৫] পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে জনসাধারণের কানে 'পাকিস্তানের পাক-কলেমা'[১৬] পেশ করার আহবান জানিয়েছে। তিনি জিন্নাহকে 'কওমী ইমাম'[১৭] 'ঝড় তুফানে কিশতী'[১৮] 'নও-জমানার মুয়াজিজন'[১৯] বলে আখ্যা দিয়ে 'তসলিম' জানিয়েছেন। এছাড়াও জিন্নাহকে তিনি 'বীর-মুজাহিদ চির-নির্ভীক-চির-উন্নতশির'[২০] 'বিস্ময় ধরণীর'[২১] 'সম্বোধন করে 'জিন্দাবাদ' ও 'মুবারকবাদ' জানিয়ে লিখেছেন-

নয়া যামানার আলাদিন তুমি মায়াবী মূর্তিমান
নূরের চেরাগে হিন্দুস্তানে আনিলে পাকিস্তান
সোনার কাঠির পরশে তোমার জাগিল মুসলমান
সাত সাগরের নাবিক তুমি-তুমি যে সিন্দাবাদ ॥'[২২]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আপামর বাঙালি যখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনড় এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তখন গোলাম মোস্তফা 'পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত মত ও পথের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন।'[২৩] ভাষার দাবি যখন তুঙ্গে, ভাষার প্রশ্নে যখন বাঙালি ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পরস্পর যুযুধান তখন তিনি ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন যে কবিতায় তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কটাক্ষ ও আন্দোলনের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রভাষার বাকবিতণ্ডা ভুলে 'মহব্বতের রাষ্ট্রভাষায়' কথা বলার জন্য বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানান।

'থামাও তোমার ভাষার দ্বন্দ্ব, তুলোনা ওকথা দিওনা লাজ
মহব্বতের রাষ্ট্রভাষায় দিলে দিলে কথা কহিব আজ।'[২৪]

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি কবিকে আনন্দিত করে। 'সামরিক শাসনকে তিনি ইসলামসম্মত বলে'[২৫] অভিনন্দন জানিয়ে আইয়ুব খানের প্রশস্তি-বন্দনা করে দীর্ঘ একটি কবিতা[২৬] লেখেন। সেই কবিতায় আইয়ুব খানকে 'আমীরুল মুসলিমীন' হবার আহবান জানিয়ে তিনি লেখেন।

'খুশ-আমদিদ! পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক আইউব খান;
মরণ আহত জাতির জীবনে নয়া জিন্দিগী মূর্তিমান।'[২৭]

১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হলে কবি সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭) 'তাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।'[২৮] তাঁর স্বপ্ন ছিল-পাকিস্তান হবে একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র, মুসলমানদের জন্য এক 'সব পেয়েছির দেশ'। সুতরাং প্রথমেই পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে হবে। সে কারণে দরকার হলে অকাতরে প্রাণোৎসর্গ করতেও কবি প্রস্তুত। অর্থাৎ যে-কোনো মূল্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র চাই-ই চাই।

'কোটি কোটি মোরা মুক্তপ্রাণ এই ভারতের জেহাদী মুসলমান-
জাতির মুক্তির তরে দিতে পারি অকাতরে জানমাল কোরবান।
মোরা চাই পাকিস্তান
মোদের সাধের আজাদ পাকিস্তান।'[২৯]

নদীয়ার রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে সপ্তদশ অশ্বারোহী একদা বঙ্গদেশে ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের উত্তরসূরি মুসলমানরা পাকিস্তান কায়েম করবে বলে কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী বীর যে দেশেতে–

'উড়াইল বিজয় নিশান
তাদেরই জ্ঞাতি সেই বীর জাতি মোরা
দশকোটি মুসলমান।
মহাবলে আজি করিবে কায়েম
এ দেশে আজাদ পাকিস্তান।'[৩০]

কবির স্বপ্নের পাকিস্তানে ইসলামি সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন যুদ্ধ, ধ্বংস আর দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুসলমানরা মুক্তি পাবে। এই বিশ্বাস নিয়ে কবি লিখেছেন :

'জিন্দাখানা খুলিছে আজিকে বন্দীরা দলে দলে
পাকিস্তানের নয়া রাহা ধরে ধরে মুক্তির পথে চলে।'[৩১]

কবির 'ভাঙ্গা তলোয়ার' কাব্যে পরবর্তীকালে 'নয়াসড়ক' নামক একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। 'এই কবিতায় পাকিস্তানের মুসলমানদের ইসলামের আদিযুগে প্রত্যাবর্তন করার আহবান জানানো হয়েছে।'[৩২] 'আজিকার সংগীত' নামক কবির একটি ক্ষুদ্র কাব্যের নাম জানা যায়। কাব্যটি মাত্র তিনটি কবিতার সংকলন। 'ওয়াকত এসেছে হইতে শহীদ অথবা গাজীর সম্মান', 'আজিকার কবিতা', ও 'শহীদ হইয়া সহিব মৃত্যু' এই কবিতা তিনটিতে কবির পাকিস্তানবাদী মানসিকতাই পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।'[৩৩] কবির 'স্বপ্ন যার আনলো যে গড়লো যারা' (১৯৫৯), উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত, কাব্যটিতে পাকিস্তানের বিশিষ্ট ব্যক্তি-ইকবাল, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী ও আইয়ুব খানকে নিয়ে পাঁচটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কাব্যের উৎসর্গপত্রে এঁদেরকে শ্রদ্ধ জানিয়ে কবি লিখেছেন :

'ইকবাল তুমি খাব দেখেছিলে অপূর্বসুন্দর
জিন্নাহ তুমি রূপ দিলে তার অপরূপ মনোহর।
লিয়াকত তুমি করে গেলে স্বীয় বক্ষ রক্তদান
আইয়ুব তুমি গড়ে তোল পূত সোনার পাকিস্তান।
তোমরা মোদের জাতির স্তম্ভ দরদী নেতা মহান-
লও গো তোমরা আজি এ জাতির কবির অর্ঘ্যদান।'

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতা লাভ করলে তাকে অভিবাদন জানিয়েই কবি এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। '১৯৫৮ সালের অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে এবং এই বিপ্লবের অপরিহার্যতার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সার্থক কাব্য দ্বারা অভূতপূর্ব বিপ্লবী উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছে পাক জাতীয় জীবনে এই কবি।'[৩৪] আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলে উচ্ছ্বসিত হয়ে কবি দু'টি কবিতা লিখেছেন। 'একটি কবিতায় বলা হয়েছে যে, প্রাক-আইউব আমলে অন্যায় অবিচার দুর্নীতি জুলুম ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে পাকিস্তান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল; অপর কবিতায় বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে আইউব খানের ক্ষমতা দখলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং প্রাণভরে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছে।'[৩৫]

'আইয়ুব নামের তাজিম করিছে, ইজ্জত সম্মান
তুমিই ধন্য, ধন্য যে তুমি, ওগো শের-হ-সেরইদ আইয়ুব খান ॥'[৩৬]

পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী কবি বেনজীর আহমদের (১৯০৩-১৯৮৩) কবিতায় স্বভাবতই পাকিস্তানি ভাবাদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।'নবোদিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের বাংলা স্বতন্ত্র মুসলিম সাংস্কৃতিক চরিত্রের বাংলা হবে এটাই ছিল তাদের কাম্য। এই বিশ্বাসে বা ধারণায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরবি ফারসি শব্দ সমন্বিত বা শব্দমিশ্রিত ভাষা নির্মাতা হওয়ার চেষ্টা করেন তাঁর 'জিন্দেগী' কাব্যে তারই চিহ্নিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে।'[৩৭] 'জিন্দেগী' কাব্যের কবিতাসমূহে তিনি ইসলামের ঐতিহ্য, ইতিহাস, উৎসব প্রভৃতি বিষয়কে ধারণ করেছেন। ইসলামি দর্শনের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিকাশ হবে বলে মনে করেছেন তিনি। তাই তার কবিতায় ইসলামি চেতনা ও পাকিস্তান-ভাবনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

পাকিস্তানবাদী কবিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কৃতিত্বকে নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়েছেন। বেনজীর আহমদও এই ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নন। 'জিন্দেগী' কাব্যের 'কায়েদে আজম' কবিতায় তিনি পাকিস্তানকে 'মুক্তির মঞ্জিল' এবং জিন্নাহকে 'সূর্যের শিখা,' 'যুগের ইমাম,' 'নব খালেদ,' 'মুক্তির বিহঙ্গ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। যারা পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক কবি তাদেরকে 'আল্লার সেনা'[৩৮] বলে সম্বোধন করেছেন। এবং এই সেনারা কায়েদে আজমের নেতৃত্বে পাকিস্তানকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলবে। পাকিস্তানের জন্মবার্তাকে কবি 'নয়া জামানার ভেরী'[৩৯] বলেছেন। 'কায়েদে আজম' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

'সেদিন ইমাম ভুল ইমান হারালে তাই হলে পথহারা,
যুগের ইমাম আজি কায়েদে আজম তব দিতেছে ইশারা
আর নহে দেরী
যাত্রীরা এগিয়ে যাও, শুন না বাজিছে নয়া জমানার ভেরী?'[৪০]

কায়েদে আজমকে 'অমৃত-সন্তান'[৪১] বলে আখ্যায়িত করে কবি তার গুণকীর্তন করেছেন। তাঁর মতে, কায়েদে আজম অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে নতুন সূর্যের মতো নতুন জীবনরশ্মি নিয়ে এসেছেন। সেই আলো পাকিস্তানবাসীর জীবনের সকল ক্ষেত্রকে আলোকিত করেছে। মুক্তির দূত হয়ে তিনি মুসলমানদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মৃত্যুকে পদানত করে সমাধির বুকে প্রাণের সঞ্চার করেছেন তিনি।

বেনজীর আহমদ ইংরেজ শাসনকে মুসলমানদের জন্য 'জিন্দানের জিঞ্জির বন্ধন'[৪২] বলে আখ্যা দিয়েছেন। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের সেই জিঞ্জিরের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। মুসলমানরা দীর্ঘকাল 'কামনার কন্টকের বনে'[৪৩] পথ হারায়ে 'খুদা ও খুদীরে ভুলি'[৪৪] ছুটে বেড়িয়েছে 'মায়ামৃগ সনে।'[৪৫] কিন্তু পায়নি 'মুক্তির পথ'[৪৬] ধুকেছে 'অন্ধকার রাতে।'[৪৭] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে সেই রাত ভোর হয়েছে, আবার দেখা হয়েছে সুবে- সাদেকের সাথে। কবির নয়া তারানা পাকিস্তানের পতাকা যেন মুক্তির প্রতীক।

'আমার রুহানী-রাজ খাক-গড়া বন্ধনের কারা
মানেনি কখনো কভু-মোর তরে আলম আল্লাহর
রয়েছে সম্মুখে খোলা আমার পতাকা চাঁদ-তারা
অসীম আকাশ সমদৃষ্টি মোর অনন্ত উদার।'[৪৮]

পাকিস্তানি ধারার অন্যতম কবি ছদরুদ্দিন (১৯১০-১৯৯০) ইসলামকে যে-কোনো ইজমের চেয়ে মহত্তর[৪৯] মনে করে পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইসলামি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকারের গৃহীত নীতি-সিদ্ধান্তকে ইসলামসম্মত মনে করে সেগুলোকে সমর্থন করেছেন। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার বাংলা ভাষার বিরোধিতাপূর্বক বাংলা ভাষা সংস্কারের যে অপচেষ্টা চালিয়েছিল ছদরুদ্দিন সেই অভিযাত্রায়ও সামিল হয়েছিলেন। এমনকী নিজের নামের উচ্চারণটি আরবি-ফারসি ভাষার উচ্চারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে মনে করে তিনি 'সদরুদ্দিন'-এর পরিবর্তে 'ছদরুদ্দিন' লেখেন। বাংলা বর্ণমালার দ্বিত্ব ও ত্রিত্ব তুলে দিয়ে 'একত্ব ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানি বাংলা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন।'[৫০] তার কোনো কোনো কবিতায় এর দৃষ্টান্ত মেলে। ছদরুদ্দিনের 'মানুষ' (১৩৪৬), 'পয়গাম' (১৩৫৮), 'সংগ্রাম (১৯৫১), 'একফালি চাঁদ' (১৩৫৭), প্রভৃতি কাব্যে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, যেমন আদম-হাওয়ার উপখ্যান, হযরত মোহাম্মদের নবুয়ত লাভ ও গৃহপ্রত্যাবর্তন, খাঁটি মুসলমানের ছিফাতসমূহ, ঈদুল ফিতর উদযাপন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের আনন্দ, জিন্নাহর প্রশংসা ও তার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ও তার পাকিস্তানি ভাবধারার কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে কবির মনে যে আবেগ-পাবন ও নতুন আদর্শবোধের জন্ম হয়েছিল, (সংগ্রাম কাব্যে) কবিতা গুলোতে তার পরিচয় রয়েছে।'[৫১] তিনি ধর্মভিত্তিক যে জীবনদর্শনের স্বপ্ন দেখতেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। আরব দেশ থেকে শুরু হওয়া ইসলামের জয়যাত্রা ভারতবর্ষকে অধিকার করে নিয়েছিল। দীর্ঘদিন হস্তগত থাকার পর মুসলমানদের শাসনদণ্ড চলে গিয়েছিল ইংরেজদের হাতে। জিন্নাহর হাতে আবার সেই শাসন ক্ষমতা ফিরে এসেছে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনার সূত্রে তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র এক স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন :

'হিন্দু মুসলমান
একজাতি নয় কভু-
দুই জাতি এরা, কোটি ব্যবধান।
স্বতন্ত্রে বিকাশ এর, একত্রে নিধন।
তাই
মুসরিমের তরে চাই
স্বতন্ত্র আবাসভূমি-পাকওয়াতন।'[৫২]

কবির দৃষ্টিকে পাকিস্তান এক স্বপ্নের দেশ। স্বপ্নপুরীতে থাকে না হতাশা বেদনার কোনো স্থান বরং প্রাচুর্য থাকে সুখ-সমৃদ্ধি আর আনন্দের। তাইতো পাকিস্তান নিয়ে কবির উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই।

'হাসি গানে ভরপুর নতুন জগত
নেমে এলো পাকিস্তান
শ্রেষ্ঠতম মুছলিম জাহান।'[৫৩]

কবি হিসেবে ছদরুদ্দিন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নন। ভাষা, ছন্দ, উপমা কোনো কিছুর প্রয়োগেই তিনি কোনো স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রাখতে পারেন নি। 'তথাপি বিশেষ এক যুগে রাষ্ট্রদর্শনের ভিত্তিতে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে তিনি যে ঐকান্তিকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন– তার জন্য তিনি একালের অনেকের কৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন- একথা বোধ করি বলা যায়।'[৫৪]

মুসলিম বিশ্বের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গৌরবদীপ্ত স্বপ্নভূমি হিসেবে পাকিস্তানকে কল্পনা করেছেন কবি আজহারুল ইসলাম (১৯১১-)। 'সমসাময়িক কালের অন্যান্য পাকিস্তানবাদী কবির মতো তিনিও হযরত মোহাম্মদসহ অন্যান্য মুসলিম ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন।'[৫৫] 'ছায়াপথ' (১৯৬৬) কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় হযরত মোহাম্মদের কীর্তি, ইসলামি আদর্শবাদ, পাকিস্তান-উচ্ছ্বাস, জিন্নাহ-প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় বিধৃত হয়েছে। পাকিস্তানপ্রেমে বিভোর কবি পাকিস্তানভূমিতে ইসলামের হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব্যক্ত করে 'পাকিস্তান' কবিতায় লিখেছেন :

'দূর চেতনার সীমান্ত হতে পূর্ব শ্যামল কূলে
নবচেতনার ঊর্মি আজিকে মহাউল্লাসে দুলে
সারা পাকভূমি ধ্বনিয়া উঠিছে ওতানের জয়গানে
অতীত দিনের গৌরব যাহা স্মরিতেছে প্রাণে প্রাণে।'[৫৬]

কবি পাকিস্তানকে মুসলিম জাহানের আদর্শ হিসেবে কল্পনা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের সেরা কবি-বীর-সাধক-দার্শনিকের তত্ত্বদর্শনের এক মিলনক্ষেত্র যেন কবির আরাধ্য পাকিস্তান। 'পাকিস্তানের সকল অংশে মিলিতভাবে ইকবালের খুদীর তত্ত্ব বাস্তবায়িত হবে বলে কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।'[৫৭] কবি লিখেছেন :

'সাদী হাফিজের ধ্যান ও ধারণা হেথা হয় একাকার,
ফেরদৌসী রুমী-গাজ্জালী প্রাণধারা মিশে বারবার
ইকবালের যে খুদীর তত্ত্ব প্রতিটি পাকিস্তানী
মনের গহনে লুকায়ে রাখিছে নিজেরে ধন্য মানি।'[৫৮]

'ছায়াপথ' কাব্যের 'কায়েদে আজম' শীর্ষক কবিতায় কবি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে 'নয়া জামানার আলাদীন' বলে আখ্যা দিয়েছেন। "শোষণের বিরুদ্ধে অন্ধকারে একলা সংগ্রাম করে তিনি পাকিস্তানি মুসলমানদেরকে 'মুক্তিবাণী' শুনিয়েছেন ও মুসলমান সম্প্রদায়কে

নবজীবনের পথ দেখিয়েছেন বলে কবি মনে করেন।"[৫৯] মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জালিমের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং আপামর পাকিস্তানি মুসলিমদের কাছে তিনি স্মরণীয় বরণীয় বলে কবির বিশ্বাস। কবির ভাষ্য মতে, জিন্নাহর নামটি স্মরণ করে 'মোজলুম সব মোনাজাত করে'।[৬০]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কবি স্বপ্নের পাকিস্তান তার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে বেদনাহত হন। কিন্তু 'নতুন কোনো জিজ্ঞাসা দ্বারা অবশ্য তিনি আলোড়িত হননি অন্যান্য অনেকের মতো সরল উচ্ছ্বাস ও গতানুগতিক পথেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। ইসলামের পথে এবং পাকিস্তানি ধারার সাথে আশ্রয় লাভের মাধ্যমে যে স্বস্তি তিনি একদা লাভ করেছিলেন তা থেকে তিনি সরে আসেননি।' [৬১]

কবিজীবনের প্রারম্ভে রওশন ইজদানী (১৯১৭-১৯৬৭) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বৃটিশবিরোধিতা, দাঙ্গার অভিঘাত, পল্লীপ্রেম, হযরত মোহাম্মদের কীর্তিত জীবন, ইসলামি ভাবাদর্শ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেও পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক এবং কট্টর পাকিস্তানবাদী হয়ে ওঠেন। "ইকবালের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত 'পাকিস্তানবাদী' কবি হিসেবে পরিচিতি পান। পাকিস্তান সম্পর্কে তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গান ও কবিতা রচনা করেছেন, এমনকি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের কাহিনী অবলম্বন করে 'পাকিস্তানের জঙ্গনামা' নামক একটি পুঁথিও রচনা করেছিলেন।"[৬২] ইসলাম ও পাকিস্তানকে বিষয়বস্তু করে তিনি প্রথম যে কাব্যটি লেখেন সেটির নাম 'রাহগীর' (১৯৪৯)। 'তেরশ বছর আগে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের সময় থেকে হাল আমল পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে এই কাব্যে।'[৬৩] মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানদের দুঃখের অমারাত্রির অবসান হয়েছে বলে কবির স্থির বিশ্বাস। তিনি এও মনে করেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ফলে মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের দ্বারা নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মাণের সুযোগ পাওয়া যাবে। 'কবি আবেগভরে বলেছেন যে, পাকিস্তানে সাম্য-মৈত্রী-সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ভোগবিলাস ধনের ইতরতা নষ্ট হবে, ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হবে।'[৬৪] কবি তার 'রাহগীর' কাব্যে লিখেছেন :

'মিশাব ধূলায় শাদ্দাদী খানা, কারুণের দৌলত
ধূলির মাঝারে গড়িব মহান সত্যের ইমারত।
খেজুর তলায় দরবারে শাহী, ফকিরী এন্তেজাম
ধূলায় ধরায় শুনাইব বাণী শান্তির পয়গাম।
গড়িব মোরাই মিলন-মৈত্রী সাম্যের হুকুমত
আমরা নিয়েছি আজাদী স্বাক্ষর নয়া চলার পথ।'[৬৫]

পাকিস্তানকে ঘিরে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের চোখে যে স্বপ্নঘোর ছিল রওশন ইজদানীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। পাকিস্তান প্রস্তাবের অনেক পরে বাস্তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তানের সম্ভাব্য

রূপকল্পনা এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কবিতা লিখেছেন তিনি। পাকিস্তানকে তিনি 'স্বপ্নলোক'[৬৬] বলে আখ্যা দিয়েছেন। পুঁথির ঢঙে লেখা 'পাকিস্তানের জঙ্গনামা' (১৯৬৫) কাব্যটি ১৯৬৫ সালে ভারতের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের পাল্টা জেহাদের বর্ণনা দিয়ে রচিত হয়েছে। এই যুদ্ধকে কবি বদরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। 'বদর যুদ্ধের সাফল্যের ওপর যেমন ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল, সেপ্টেম্বর যুদ্ধও তেমনি ছিল পাকিস্তানের কাছে। যুদ্ধে জয়ী হয়ে পাকিস্তানীরা বুঝতে পেরেছে যে তাদের সমস্ত শক্তির উৎস আল্লাহ ও ইমান।'[৬৭] যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দুই পাকিস্তানের মুসলিম জনতা পাকিস্তানের ঐক্যের প্রশ্নে এক হয়ে দাঁড়াবে বলে কবির বিশ্বাস।

'থাকুক যত দ্বন্দ্ব বিবাদ পরস্পরে আন
বাদশা ফকির এক হয়ে যায় শুনলে পাক আজান।'[৬৮]

পাকিস্তানবাদী কবিদের কবিতার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মাহাত্ম্যবর্ণনা এবং তার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করা। কবি জিন্নাহকে 'মুকুটবিহীন হে মহান শাহানশাহ'[৬৯] 'হাবিবে খোদার উন্নৎ'[৭০] 'মোমেন খয়ের খাঁ'[৭১] 'হৃদয়ের মহারাজ'[৭২] প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। জিন্নাহবিহীন পাকিস্তানকে তিনি 'শূন্য গুলিস্তান'[৭৩] বলে আখ্যা দিয়েছেন। কবি মনে করেন, মৃত্যু জিন্নাহকে পরাজিত করতে পারেনি বরং তিনি অমর থেকেই মৃত্যুকে পদাঘাত করেছেন। 'রঙ্গিলা বন্ধু' (১৯৫১) গানের বইয়ের 'কায়েদে আজমের জারি'তে জিন্নাহর মৃত্যুতে সোনার পাকিস্তান এতিম হয়ে গেছে বলে কবি উল্লেখ করেছেন। 'পাকিস্তানের চাষী' গানটিতে দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও চাষীদের জীবনে সুখ-শান্তি রয়েছে, পান্তা খেয়ে তৃপ্ত হয়ে জমিতে লাঙল চালাতে চালাতে তারা মহানন্দে ভাটিয়ালি গান গায় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। "এক বিবেচনায় রওশন ইজদানীকে 'পাকিস্তানবাদী' কবিদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। দেশ বিভাগে যারা 'পাক-বাংলা' সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।"[৭৪]

পাকিস্তান আন্দোলনের বলিষ্ঠ সমর্থক, ইসলামি রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) আশাবাদী ছিলেন যে, পাকিস্তানে ইসলামি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা পাবে এবং ইসলামের পথেই মুসলমানদের মুক্তি আসবে। 'এই মূল লক্ষ অভিমুখেই তার কাব্যচর্চা ধাবিত হয়েছিল।'[৭৫] 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গঠিত ইসলামি সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের তিনি ছিলেন ফ্রেন্ড, ফিলোসফার, গাইড।'[৭৬] 'পাক সাহিত্য মজলিস, 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং আইয়ুব খানের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত লেখক সংঘের সভ্য ছিলেন তিনি। 'পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ হলেও তিনি পাকিস্তানের বাইরে কিছু ভাবেননি।'[৭৭] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামিল হয়ে তিনি ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেন যার সার্থক প্রতিফলন 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪) কাব্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তিনি 'আজাদ করো পাকিস্তান' (১৯৪৫) নামে একটি ক্ষুদ্রকাব্য রচনা করেন যেটি তিনি উৎসর্গ করেন 'ইসলামের জন্য যারা রক্ত দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে'। এই কাব্যের ১০টি কবিতা যথাক্রমে: 'ফৌজের গান', 'আজাদ করো পাকিস্তান', 'ওড়াও ঝাণ্ডা', 'কায়েদে

আজম জিন্দাবাদ', 'নতুন মোহাররাম', 'পথ', 'পাকিস্তানের কবি', 'রাত্রির অগাধ বনে', 'কারিগরি', 'জালিম ও মজলুম'। এছাড়াও 'কায়েদে আজম তিরোধানে'[৭৮] নামে তিনি একটি কবিতা লেখেন। মুসলিম লীগ এবং কায়েদে আজমকে জিন্দাবাদ জানিয়েই তিনি মূলত পাকিস্তান-বিষয়ক কবিতাগুলো রচনা করেন।

পাকিস্তানের মুসলমানদের কবি 'তৌহিদেরি শান্ত্রীদল'[৭৯] ও 'মুজাহিদ'[৮০] আখ্যা দিয়ে ভয়-ডর, দুঃসময়, দুঃখ, মৃত্যুবাধা, পিছনটান, বানতুফান প্রভৃতি বাধাবিপত্তি প্রতিবন্ধতাকে অতিক্রম করে পাকিস্তানকে আজাদ করার[৮১] আহ্বান জানিয়েছেন। 'সাম্যের নতুন গান'[৮২] গেয়ে 'মানুষের নতুন প্রাণ'[৮৩] স্পন্দন সৃষ্টি করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে তাদের লাল রক্তে আজাদীর দিনকে রঙিন করতেও যেন তারা পিছপা না হয়। পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে কবি 'হাজার বছরের আঁধার শেষে..... রাঙা প্রভাত'[৮৪] 'সাহারার বুকে ঝড়ের মতন নামলো কুঅত খোদার দান',[৮৫] 'মোহাররামের চাঁদ',[৮৬] 'ঊষালোক',[৮৭] 'পৃথিবীর মৃতরাত্রি শেষ'[৮৮] বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনকে কবি 'জেহাদ এজিদের সাথে'[৮৯] বলে মনে করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে 'ভাঙবে পাপের সকল প্রচীর।'[৯০] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এটি মুসলমানদের জন্য দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন-নিপীড়ন-জুলুম-বঞ্চনামুক্ত একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হবে। শোষক নামক শাসকেরা হটে গিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে।

'রাজসিক আড়ম্বরে চলেছে যে পথ
এখনো পাশ্বব-গর্বে সে পথের আয়ু
এল শেষ হয়ে; ডাকে মানুষের পথ
নিরন্ন, ক্ষুধিত শীর্ণ মানুষের পথ,
ধর্ষিতা মায়ের রিক্ত ক্রন্দনের পথ।'[৯১]

পাকিস্তান-চেতনার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ ইসলামি আদর্শ অনুসরণ। কবি মনে করেন, এই আদর্শ বাস্তবায়নের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানি মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে। 'পাকিস্তান বলতে তিনি শুধুমাত্র একখণ্ড ভূমিকেই বুঝেননি, বরং পাকিস্তানকে তিনি অনুভব করেছেন স্বপ্ন ও আদর্শের লালনাগার হিসেবে।'[৯২] কবির 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১) কাব্যের অন্যতম বক্তব্য 'ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হাতেমের মতো নিঃস্বার্থ ও সেবাব্রতী মুসলমান কর্মীপুরুষের প্রয়োজন।'[৯৩] তাই হাতেম পাকিস্তান-রাষ্ট্রের জন্য একটি আদর্শ চরিত্র। 'পাখীর বাসা' (১৯৬৫) কাব্যের লক্ষ ছিল শিশুদের মনে পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধ, ধর্মীয় আদর্শ প্রভৃতি জাগিয়ে তোলা। এই কাব্যের 'আজাদ পাকিস্তান', 'আমরা গড়ব পাকিস্তান' প্রভৃতি কবিতা এই লক্ষেই রচিত।

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি আল্লামা ইকবালকে কবি তসলিম জানিয়েছেন 'পৌরুষের প্রজ্ঞা-প্রাণ'[৯৪] সম্বোধন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ মোহাম্মদ আলী স্মরণে 'কায়েদে আজম তিরোধানে'[৯৫] কবিতায় জিন্নাহকে তিনি 'আফতাব', 'সিপাহসালার', 'নিশান-বর্দার', 'কুতুব মিনার' বলে আখ্যা

দিয়েছেন। জিন্নাহর তিরোধানকে কবি 'চাঁদ ডুবে গেল। নিভে গেল আফতাব', 'আলো নেই সম্মুখে', বলে উল্লেখ করেছেন। কবি মনে করেন 'দিশাহারা জাতিকে সে নিয়ে গেছে মুক্তির মঞ্জিলে', 'জাতির কায়েদে একা এনে দিল সেই পাকিস্তান', 'একক সাধনা তার রূপায়িত সাফল্যে একক'। কবি বলেন যে, জিন্নাহর অবর্তমানে তার আদর্শকে সামনে রেখেই মুসলমানদের পথ চলা এবং পাকিস্তান বিনির্মাণ করা উচিত।

ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী কবি তালিম হোসেনের (১৯১৮-১৯৯৯) কবিতায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'পৃথিবীতে ইসলামের প্রসার ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা তিনি কামনা করেন প্রবলভাবে।'[৯৬] তাই 'পাকিস্তান সংগ্রাম তাঁর কাছে ইসলামের অবাধ রূপায়ণের জন্য ক্ষেত্র রচনার সংগ্রাম হয়ে দেখা দিয়েছিল।'[৯৭] পাকিস্তানে ইসলামের তৌহিদবাদ, অর্থনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে মনে করে কবি পাকিস্তান-আন্দোলনের পক্ষে কলম ধরেছিলেন। 'মুসলিম জাগরণের চারণগ্রস্থ হিসেবেই পরিচিত'[৯৮] প্রথম কাব্য 'দিশারী'র (১৯৫৬) ভূমিকাতে স্বীয় কাব্যদর্শন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "একালে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের যে বিচ্ছিন্নধারা পাকিস্তানের অন্তরঙ্গ স্বপ্নে এসে সংহত রূপ পেয়েছিল, তার বাস্তব রূপায়নের পথে প্রেরণা ও উদ্দীপনার সাথে এক অকুণ্ঠ আত্মানুসন্ধানের স্বাক্ষর বিধৃত হয়েছে এই লেখাগুলোতে'। পাকিস্তান পূর্ববর্তী কালে বিভিন্ন অনাচার- অনিয়ম-অসঙ্গতির প্রাধান্য ছিল। 'কবি আশা করেছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সে সব দূরীভূত হবে। ..... জুলুম-পীড়ন-দুর্নীতির পরিবর্তে সাম্য-মৈত্রী-ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তান হবে চির ঈদের ময়দান।'[৯৯] 'দিশারী' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় আদর্শ পাকিস্তানের স্বপ্ন সম্ভাবনা আভাসিত হয়েছে। 'পাকিস্তান' এবং পাক-ওয়াতন' কবিতা এই ধারার উজ্জ্বল উদাহরণ।

'এবার হেথায় জালিমের দিন শেষ
এবার হেথায় মানুষের ইন্‌সাফ;
এ পাক-ওয়াতন চির-মানুষের দেশ
এখানে তাহার তকদীর আফতাব।'[১০০]

কবি মনে করেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের গৌরবময় অতীত আবার ফিরে আসবে। পাকিস্তান হবে ইসলামের জন্য একটি আদর্শ স্থান। বিরুদ্ধতা ও বিরূপতার নাগপাশ ছিন্ন করে পাকিস্তানের আশ্রয়ে ইসলাম ও মুসলিম মুক্তি পাবে। 'ইসলাম হেথায় মুক্তি লভিবে, মুসলিম ফিরে পাবে ইমান।'[১০১] পাকিস্তানকে কবি তাই খোশ আমদেদ জানিয়েছেন, 'দুনিয়ার বুকে ইসলামাবাদ পাকিস্তান।'[১০২] পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি আল্লামা ইকবালের সাথে কবি নিজের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন।'[১০৩] পাকিস্তানকে নির্মাণ ও রক্ষা করার জন্য ইসলামের ইতিহাসের বীরনায়ক খালেদ, মুসা, উমর, আবুবকর প্রমুখকে পাকিস্তানে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। হযরত উমরকে পাকিস্তানে এসে 'নয়া জামারার মিনারে আবার'[১০৪] 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি উচ্চারণের আহ্বান জানিয়েছেন।

পাকিস্তানের অমরতা ও সাফল্য কামনা করে কবি 'দিশারী' কাব্যের 'পাকিস্তান আজাদ', 'দিল আজাদীর দেশ', মুবারক হো জিন্দেগী', 'ভোরের নকীব', 'আব হায়াৎ', 'পূর্ব পাকিস্তান', 'কায়েদে আজম' প্রভৃতি গান রচনা করেছেন।

তালিম হোসেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শাহীন' (১৯৬২) পাকিস্তানি আদর্শবাদ ধারণ করে 'দিশারী' কাব্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই রচিত। বিপুলা পৃথিবীর বিচিত্র জীবনধারাকে তুচ্ছজ্ঞান করে কবি নিজস্ব ভাবজগতকে 'বৃহৎ' বলে মনে করেছেন। আর সেই ভাবজগত হচ্ছে পাকিস্তানি নবজাগরণপ্রসূত

'ইসলামি জীবনদর্শন।
অসীমের প্রেম তাকে টানে
ক্ষুদ্রের আড়ালে ভেঙে বৃহতের পানে
অশেষ সন্ধানে-'[১০৫]

পাকিস্তান-চেতনার কবি তালিম হোসেন শব্দ ও অলংকার প্রয়োগে ইসলামি ঐতিহ্য এবং আরবি-ফারসি ভাষার শরণাপন্ন হয়েছেন। 'খোশ আমদেদ', 'আল্লাহ আকবর', 'হায়াৎ মউত', 'রেজেক', 'দৌলত', 'জালিম', 'তাবেদার', 'তাঞ্জাম', 'উমরাহা' প্রভৃতি আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার 'উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প রচনায় ইসলামী আদর্শমূলক ও মুসলিম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কাব্য উপাদান'[১০৬] তার পাকিস্তানবাদী পরিচয়কে প্রকট করে তুলেছে।

সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান থেকে জন্ম নেওয়া পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে কবি মুফাখখারুল ইসলাম (১৯২১-) বলেছেন "হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্য ইত্যাদি সবই আলাদা। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও মুসলমানরা 'আলাহিদা' জাতি,[১০৭] কারণ 'মুসলমান কোন বিশেষ রক্ত থেকে জন্মে না, জন্মে ইসলাম থেকে।'[১০৮] কবি পাকিস্তানে ইসলামের জাগরণ ও মুসলমানদের সুখশান্তির নিশ্চয়তা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'হে পাক ফউজ' (১৯৫৪) তিনি উৎসর্গ করেছেন 'প্রজ্ঞা-নগরীর একমাত্র তোরণ, জগৎ-প্রসিদ্ধ আসহাবে মুফফার অভিনেতা মুজাহিদের পূর্ণতম ও একতম আদর্শ, সুলতানুল আউলিয়াহাইদরে কারবার, বিশ্ব কবিশ্রেষ্ঠ হযরত আলী মুরতজা' এবং 'তারি আদর্শে উদ্বুদ্ধ' কবির 'ধ্যানলোকের' পাক ফউজ পাকিস্তানের কওমী সিপাহীদিগকে'। পাকিস্তান মুসলমানদের অধিকারের জায়গা। 'পাকিস্তানী সিপাহীদেরকে কবি ইসলামের ত্যাগী নির্ভীক বীর সেনানী বলে মনে করতেন। ...তারাই সত্যিকারভাবে মজলুমের অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে।'[১০৯] কারণ 'এরা এখনো ষড়যন্ত্র বোঝেনি, ইসলামের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করতে চায়নি।'[১১০] এই সৈনিকরা আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে মুসলমানদের জন্য নতুন বাসভূমি সৃষ্টি করতে চায়। পাকিস্তানের মাটিতে 'নতুন জেহাদের' প্রয়োজন 'হায়দরী হাঁক' হাঁকার জন্য এই সৈনিকদের আহবান জানিয়েছেন। 'হে পাক ফউজ' কাব্য ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তার পাকিস্তান-বিষয়ক কিছু কবিতার হদিশ জানা যায়। পাকিস্তানকে 'বুলবুলিস্তান'[১১১]

আখ্যা দিয়ে তিনি 'ইসলামি পাকিস্তানে ত্যাগের মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরতে চেয়েছেন।'[১১২] কবির বিশ্বাস কাবার মধ্যে হজরে আসওয়াদের মতোই মুসলিম বিশ্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবস্থান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে 'ভারত-ভাগ্য-নিয়ন্তা'[১১৩] আখ্যা দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান গড়ার সংগ্রামে সামিল হতে মুসলমানদের প্রতি কবি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। পাকিস্তান যে মুসলমানদের জন্য একটি আদর্শস্থান সে ব্যাপারে কবি নিঃসন্দেহ।

'পাকিস্তান কি তোমাদের?
শুনো গায়িবের সংবাদ;
নবীন কাবার তওয়াব কেন্দ্র
হাজরুল আসওয়াদ।'[১১৪]

পাকিস্তান কায়েম হবার পর তার গন্তব্য নিয়ে কবি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন- 'পথের শেষ কোথায়'? প্রাক্-পাকিস্তান এবং পাকিস্তানোত্তর স্বপ্ন-কল্পনা-সম্ভাবনার মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ দেখে কবি আশাহত হয়ে পাকিস্তানের জনগণকে নতুন বন্দর নির্মাণের আহবান জানিয়েছেন। 'ইসলামী হুকুমতের পরিবর্তে পাকিস্তানে ব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে বেদনাহত হয়েছেন।'[১১৫] আশাহত কবি পাকিস্তানের অপমৃত্যু'[১১৬] হয়েছে বলে মনে করেছেন। মৃত পাকিস্তানে 'এই যদি বেঁচে থাকা হয়/তাহলে মৃত্যু বলে পৃথিবীতে আর কিছু নেই।'[১১৭] পাকিস্তানবাদী অপরাপর কবির মতো জিন্নাহর মৃত্যুতে তিনি স্বভাবতই শোকাভিভূত হয়েছেন। জিন্নাহর মৃত্যু পাকিস্তানের সম্ভাবনার আকাশকে ঘনকৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তিনি বেঁচে থাকলে দক্ষ নাবিকের মতো পাকিস্তান-তরণীকে সঠিক এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারতেন।

'কূলের সমীপে আসিতে আসিতে কূল-হারা হলো তরী
উন্মাদবেগে ছুটে আসে একি অসময়ে কাল-ঝড়ি।
চারদিক হতে ছেয়ে আসে কালোমেঘ,
তুফান এখনো থেমে যায় নাই ছুটেছে ঝঞ্ঝাবেগ।'[১১৮]

একদা 'পাকিস্তানি বাংলা' কিংবা বাংলাভাষার যে পাকিস্তানিকরণের অপচেষ্টা হয়েছিল কবি মুফাখখারুল ইসলাম সেই ধারারই অন্যতম একজন। বাংলাভাষায় প্রচলিত তৎসম, তদ্ভব প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে 'কবি অনিবার্য-ভাবে আরবী-ফারসী উর্দু শব্দ, বাক্যাংশ, উপমা ও রূপকের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং নির্বিচারে প্রয়োগ করেছেন'।[১১৯] তার কোনো কোনো কবিতায় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের এত ব্যাপক ব্যবহার যে সে কবিতাকে বাংলা কবিতা বলে চিহ্নিত করা মুশকিল। 'বস্তুতপক্ষে তাঁর আদর্শ ও ঐতিহ্যবোধ যতখানি তীব্র, শিল্পদৃষ্টি ততখানি প্রখর নয়।'[১২০]

সমকালীন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অনন্যসাধারণ, মেধা, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) সচেতনভাবেই পাকিস্তানি ভাবাদর্শ ধারণ, প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'চল্লিশের দশকের শুরুতে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান

প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও... ছিলেন তার পুরোভাগে।'[১২১] কলকাতার রেনেসাঁ সোসাইটির অনুকরণে ১৯৪৩ সালে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠিত হলে তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠন সম্পর্কে বলেন; "(ক) মুসলমানদের তাহজীব-তমদ্দুন হিন্দুদের থেকে আলাদা, তাই মুসলিম সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ না করে নিজেদের তাহজীব-তমদ্দুন,সমাজ চেতনা ও সমাজ পরিবেশকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করা উচিত, (খ) মুসলিম সাহিত্যিকদের ঐতিহ্য সন্ধান করতে হবে পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে, (গ) ভাষার ব্যাপারেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র অবস্থান নিতে হবে। এই লক্ষ্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার, পুঁথির রূপকল্প ব্যবহার ও সমাজে প্রচলিত মুসলমানী বাংলা ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে।'[১২২] তার প্রথম দিককার কবিতা ছিল প্রধানত ইসলাম বিষয়ক। পাকিস্তান যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানের দেশ সেহেতু 'বিভিন্ন ইসলামী উপকথাকে অবলম্বন করে তিনি সেকালে বাংলা সাহিত্যের নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিলেন।'[১২৩] ইসলামি ধারার কবিতাবলির মধ্যে রয়েছে 'মক্কা মোয়াজ্জমার পথে' (মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ ১৩৫০), 'মোহররম' (মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ ১৩৫০), 'কোরবানী' (মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৫০), 'আদমের প্রতি ইবলিস' (মাসিক মোহাম্মদ, ভাদ্র ১৩৬০) প্রভৃতি।

কাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কবি স্বভাবতই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে তিনি মুসলমানদের বিজয় হিসেবে দেখেছেন। ইসলামের চিরকালীন পথ চলার ধারাবাহিকতা হিসেবে পাকিস্তানের আবির্ভাব। পাকিস্তানের বুকে যেন ইসলামের এক নতুন সূর্যোদয় ঘটেছে। 'মক্কা মোয়াজ্জমার পথে' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

'সঙ্গীন কাঁপে-দীপ্তিতে তার অরুণোদয়
তিমির দীর্ণ সূর্যহীরক আনে অভয়।
প্রাণ-প্রদীপ্ত মুক্তি কিরণে কাফেলা বেঁধেছে সিমা
সত্তার দাবী লাঞ্ছিত করি তুলেছে স্বপ্ন সীমা
কুল মখলুক এক সুরে কহে, আল্লাহু আকবর
আল্লাহু আকবর।'[১২৪]

'মক্কা মোয়াজ্জমার পথে' কবিতার সুরই অনুরণিত হয়েছে 'আমন্ত্রণ' কবিতায়। 'পাকিস্তানের দাবিকে কবি নতুন সৃষ্টির বার্তা হিসেবে কল্পনা করেছেন।'[১২৫] 'আমন্ত্রণ' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

'বিশ্রামহীন প্রহরে আকাশে যে পাখি উড়িয়াছিল
মনের কোনায় এনেছিল সংবাদ
মৃত উড়ায়ে পাখার ঝাপটে সংঘাত এনেছিল
আজ আনিয়াছে প্রাণের রেণুতে সমুদ্র আস্বাদ।'[১২৬]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আনন্দিত কবি পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে 'নতুন দিন',[১২৭] 'শংকাহরণ অভয়মন্ত্র'[১২৮]

বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাকিস্তানের আবির্ভাব যেন দীর্ঘ অমারাত্রির পর ভোরের সূর্যোদয়। এই আনন্দে কেবল মর্তবাসী মুসলমান নয় 'উৎসব করার জন্য বেহেশতের হুরপরী ও স্বপ্নের রাজকুমারীরা মেশক, আম্বর লোবান, সুগন্ধ ফল এবং নানা প্রকার বেহেশতী লেবাসে সজ্জিত হয়েছে, জোহরা সেতারা, মর্ত্যে নেমে এসেছে।'[১২৯] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের বেদনার দিন শেষ হয়েছে।

'বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন-এসেছে নতুন দিন
সোনালী আলোর পাগড়ী খুলেছে, কুয়াশা হয়েছে ক্ষীণ

কলরোল জাগে বাতাসে বাতাসে ভেঙেছে তন্দ্রাঘোর-
নেকাব খুলেছে নতুন কুমারী রাত্রি হয়েছে ভোর।'[১৩০]

'কায়েদে আজম[১৩১] কবিতায় জিন্নাহর মাহাত্ম্যবর্ণনা এবং তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কবি। বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জিন্নাহ পাকিস্তানকে পূর্ণতা দিয়ে গেছেন। জিন্নাহর জীবন রূপকথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়েছে, কল্পলোকের জীবন কাহিনিকেও হার মানিয়েছে। কবির ভাষায় জিন্নাহ মৃত্যুহীন।

ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয়কে পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে ধারণ করার যে প্রয়াস পাকিস্তানপন্থী কবিরা গ্রহণ করেছিলেন, সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন তাদের অন্যতম রূপকার। এমনকী কবিতায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষার ব্যবহার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, চিত্রকল্প নির্মাণেও তিনি পাকিস্তানি ধারার একজন প্রধান কলাবিদ।

পাকিস্তানমোহে একদল তরুণ কবি পাকিস্তান-প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন যাদের কারও কারও কবিতা ছিল তাৎক্ষণিক আবেগপ্রসূত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান রাষ্ট্রদর্শনের অসারতা এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অমানবিক এবং অবিবেচক কার্যকলাপ দেখে এইসব কবি তাদের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। তারা পাকিস্তানমোহবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে প্রগতিশীল সাহিত্য যাত্রায় শামিল হয়েছিলেন। ফলে পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এইসব কবির কবিতা প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে তারা এগুলোকে আর স্বীকার করতে চাননি। এমনকি তাদের কবিতা সংকলন বা কাব্যগ্রন্থে এইসব কবিতার সন্ধানও মেলে না। কেউ কেউ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কবিতা লেখা ছেড়েও দিয়েছিলেন। আরেক ধারার কবিগোষ্ঠী আছেন যারা সচেতনভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কামনা করেছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে পাকিস্তান-আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানপন্থী সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা-পরিচালনার পাশাপাশি তারা পাকিস্তান-বিষয়ক কবিতা রচনায়ও ব্রতী হয়েছিলেন। এঁরা স্পষ্টরূপেই পাকিস্তানবাদী কবি হিসেবে স্বীকৃত। এবং এই স্বীকৃতির মধ্যে কেউ কেউ অহংকারও বোধ করতেন। উপরিউক্ত এই দুই ধারার কবিদের কবিতা নিয়ে একটি সংকলন[১৩২] প্রকাশিত হয়। আরও অনেক পরে এসে কায়েদে আজমকে নিবেদিত একগুচ্ছ লেখা নিয়ে আরেকটি

সংকলন[১৩৩] প্রকাশিত হয়। উভয় সংকলনের অধিকাংশ কবিতাই 'মাহেনও, 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সওগাত', 'নওবাহার', 'সৈনিক', 'পাকিস্তানী খবর', 'পাক-সমাচার' প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত। এই সংকলন দুটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানি ভাবাদর্শ স্বীকার না করলেও কোনো কোনো কবি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশস্তিবন্দনা, তাঁর মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। কেউ কেউ আবার পাকিস্তান ও জিন্নাহকে অভিন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উভয় নিরীখে জিন্নাহকে নিয়ে রচিত কবিতার কবিদের মধ্যে আছেন সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), শাহাদাত হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-১৯৭৯), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৭-১৯৮০), কাজী কাদের নওয়াজ (১৯০৯-১৯৮৩), আ ন ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৭-১৯৭৫), আবদুল হাই মাশরেকী (১৯১৯-), হাবীবুর রহমান (১৯২৩-১৯৭৬), সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৫-), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৬-২০২০), আব্দুল গনি হাজারী (১৯২৬-১৯৭৬), আব্দুল রশীদ ওয়াসেকপুরী (১৯২৬-), মযহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০০৯), জিলুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮-২০১৪), জাহানারা আরজু (১৯৩২-), আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন (১৯৩৪-), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (১৯৩৬-), আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬-), আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮) প্রমুখ।

পাকিস্তানবাদী কবিদের কবিতার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ জিন্নাহর কীর্তিগাঁথা রচনা। মুসলিম জাগরণ তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্যতম কাণ্ডারী জিন্নাহকে ইসলামি ইতিহাসের বীর সেনানী বলেও আখ্যায়িত করেছেন কোনো কোনো কবি। ইসলামের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার তথা ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডয়নের জন্য জিন্নাহর আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি পাকিস্তানের প্রাণপুরুষ। জিন্নাহ-বন্দনার পাশাপাশি তার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশও লক্ষ করা যায় এইসব কবির কবিতায়। সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক জিন্নাহর গুণকীর্তন করে বলেছেন যে, মুসলমান জাতির জীবনে শতাব্দীকালব্যাপী অন্ধকার সরিয়ে নতুন প্রভাত এনেছেন জিন্নাহ। নিস্প্রাণ-নিস্তরঙ্গ মুসলমানদের জীবনে তিনি প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তুলেছেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতির সম্মান বাঁচাতে 'হেলালী নিশান উর্ধে'[১৩৪] তুলে ধরে 'কোরান হাদিস নির্দেশিত পথে'[১৩৫] মুসলমানদের পথ চলার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

'তব তূর্যনাদে জাগিল সকলে
ঘুমঘোর ত্যাজি ছুটে দলে দলে
আল্লাহু আকবর রবে।
ধর্ম ও জাতির ইজ্জত বাঁচাতে
হেলালী নিশান লয়ে প্রতি হাতে
পথ ধরি ছোটে সবে।'[১৩৬]

পাকিস্তানি ভাবাদর্শের অন্যতম অগ্রগণ্য কবি শাহাদাত হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) পাকিস্তান ও জিন্নাহ-প্রসঙ্গ নিয়ে বহুসংখ্যক কবিতা লিখেছেন। 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত এইসব কবিতার মধ্যে রয়েছে 'কারবালা' (মাঘ ১৩৫০), 'আবাহন' (ফাল্গুন ১৩৫২), 'জয়ন্তী' (কার্তিক ১৩৫৩), 'সুন্দর দ্বারে আজ' (বৈশাখ ১৩৫৪), 'যুগ-পথিক' (ভাদ্র ১৩৫৪), 'কোরবানী' (কার্তিক ১৩৫৪), তোমারে সালাম দিক তোমার সন্তান' (চৈত্র ১৩৫৬), ইত্যাদি।[১৩৭] যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হতে চলেছে, সেই বিবাদ-বিসংবাদ ও অস্থিরতায় মুসলমানরা যাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে কবি সেই আহবান জানিয়েছেন তার কবিতায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে কবি এতটাই স্থিরনিশ্চিত যে, 'দুর্যোগের পাড়ি'[১৩৮] কবিতায় পাকিস্তানকে আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আগেভাগেই তিনি মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন'। শাহাদাত হোসের কবিতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অপার সম্ভাবনা, ঐশ্বর্য এবং গর্বের নানান দিক প্রতিভাত হয়েছে। পাকিস্তানের স্বপ্ন, মোহ এবং মায়াকাজল মাখানো চোখে কবি লিখেছেন :

'ভৈরবী ভেরী গরজে গভীর তুর্জে তুবীর তান
কুল-মখলুকে জাগে রোমাঞ্চ জিন্দা পাকিস্তান
সিন্ধি-বেলুচী-বাঙালী-পাঠান
লুর-পাঞ্জাবী জাগে মর্দ্দান
তুঙ্গ তুফানে আরবী দরিয়া নির্ঘোষে আবিরাম
জিন্দা-পাকিস্তান।'[১৩৯]

জিন্নাহর মৃত্যুতে শাহাদাত হোসেন 'বিদায় তসলীম'[১৪০] নামে একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতায় তিনি জিন্নাহর মৃত্যুকে 'মহা বিয়োগের বেদনা বারতা', 'নির্মেঘ নভে সহসা বজ্রপাত', 'মহা-মানবের মহা-তিরোভাব' বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর মৃত্যুতে পাকিস্তানের মুসলমানরা 'এতিম আজকে সর্বহারার হাল'। তাদের সাহস দেবার মতো, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বানচাল করার মতো আর কোনো ত্রাণকর্তা রইল না। তার স্পর্শে করাচী একটি পুণ্যভূমির মাহাত্ম্য লাভ করেছে। 'দুনিয়ার দেনা শুধি' জান্নাতের পথিক চলে গেলেও কবি তাকে 'শাশ্বত' এবং 'অমর' বলে মনে করেন। কবি বিশ্বাস করেন 'মৃত্যু তাহারে সালাম জানায় কীর্তি চরণে লুটে।"

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-১৯৭৯) 'জাতির জনক'[১৪১] কবিতায় জিন্নাহকে 'আযাদী দূত' হিসেবে সালাম জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন জিন্নাহর 'আবির্ভাবে খসে পড়ল গোলামীর জিঞ্জির।'[১৪২] বহু যুগের অন্যায় অত্যাচার-দমন-পীড়নে জর্জরিত মুসলমানদের জিন্নাহ শোনালেন অভয়বাণী। তিনি বিশ্বাস করেন জিন্নাহর নেতৃত্বে 'অবসান হয়েছে দুর্দিনের/আযাদীর সূর্য উঠেছে আকাশে/ সবুজ ঝান্ডা উড়ছে তার পাশে/... সাম্য, মৈত্রী আর বিশ্বাস।'[১৪৩] জিন্নাহর আবির্ভাবকে তিনি 'শতাব্দীর বিস্ময়' এবং মৃত্যুকে 'বেদনাময়' বলে আখ্যা দিয়ে ইতিহাসে তার অমর-অক্ষয় আসন চিহ্নিত করেছেন। পূর্ববাংলার মহিলা কবিদের অন্যতম মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৯) 'কায়েদে আজম

স্মরণে'[১৪৪] কবিতায় জিন্নাহকে 'নির্ভীক সেনানী' বলে সম্বোধন করে, সালাম জানিয়ে বলেছেন যে, জিন্নাহ চিরকাল বিজয়ের রথ নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছেন।

'সে রথের তলে পড়ি ধূলা হল
স্বার্থের কঠিন জাল হিংসার অনল
সে চলার ঘায়ে
মৃত্তিকার বুকে বুকে অংকুর গজায়ে
ফলিয়া উঠিয়া ধানশীষে
মিশে গেছে পরম আশ্বাসে।'[১৪৫]

কাজী কাদের নওয়াজ (১৯০৯-১৯৮৩) পাকিস্তানবাদী কবি না হলেও জিন্নাহর জন্মদিন উপলক্ষে 'পঁচিশে ডিসেম্বর'[১৪৬] নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতায় তিনি জিন্নাহকে মুসলিম-গগনের 'ধ্রুবতারা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। গোটা বিশ্বের মুসলিম জাতি যেন জিন্নাহর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিল। সাম্প্রদায়িক 'দাঙ্গায় ইসলামের অনুসারী পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীরা বেসামাল হয়নি। বরং সামনে অগ্রসর হয়েছে আপন লক্ষাভিমুখে'[১৪৭] এই বিশ্বাস নিয়ে কবিতা লিখেছেন পাকিস্তান-চেতনার কবি আ.ন.ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬)। 'কাফেলা চলিয়া যায়'[১৪৮] কবিতায় তিনি লিখেছেন :

'আল্লাহর রাহে চলে মুসাফির নাহি কোন সঞ্চয়
কণ্ঠে তাহার 'লা শরীক' বাণী নাহি ভয় নাহি ভয়
জখমী দিনের খুন ঝরে পড়ে তপ্ত বালুর গায়
তবু কাফেলা চলিয়া যায়।'

জিন্নাহর জন্মদিন উপলক্ষে তিনি 'তোমারি জন্মদিনে'[১৪৯] কবিতায় জিন্নাহর জন্মকে বলেছেন :

'নতুন দিনের জন্ম-যেন অকস্মাৎ
অন্ধকার ছিন্ন করে সৃষ্টি শতদল
আলোকে আনন্দে মুক্ত-বিস্মিত চঞ্চল
অসংখ্য বর্ণে ও রূপে।'

পূর্ব বাংলার প্রধান মহিলা কবি সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) জিন্নাহকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবিতা লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- 'হে সিপাহসালার', 'হে মশালধারী ', 'হে অমর প্রাণ', 'নির্ভীক মহাপ্রাণ', 'করো নাকো সংশয়', 'তোমার জন্মদিনে', 'স্মরণীয়' প্রভৃতি।[১৫০] এছাড়া 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় পাকিস্তানি ভাবাদর্শপূর্ণ 'নতুনের আশ্বাস' (কার্তিক ১৩৫৪), 'প্রতীক্ষা', 'বন্দিনী মায়মুন' (কার্তিক ১৩৫৭), 'সুফনামা' (পৌষ ১৩৫৭), 'মৃত্যুঞ্জয়ী মুজাহিদ' (কার্তিক ১৩৫৮), 'ঈদ আসে' (জৈষ্ঠ ১৩৫৯), 'যাযাবর পাখি উড়ে যায়' (অগ্রাহায়ণ ১৩৫৯), 'একটি কবিতা' (আশ্বিন ১৩৬০), প্রভৃতি [১৫১] কবিতা প্রকাশের খবর পাওয়া যায়। সুফিয়া কামাল কায়েদে আজমকে 'সত্য পথের

পথিক',[১৫২] 'সিপাহসালার',[১৫৩] 'নায়ক বীর'[১৫৪] 'মহান নেতা'[১৫৫] 'পথের দিশারী'[১৫৬] 'মশালধারী'[১৫৭] 'মুকুটবিহীন সম্রাট'[১৫৮] 'আলোকের দূত'[১৫৯] 'আমীর উল বহর'[১৬০] 'অমৃত উজ্জ্বল প্রাণ'[১৬১] ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। পাকিস্তান পূর্ব মুসলমানদের পরাধীনতাকে কবি 'কারবালা',[১৬২] 'তিমির রাত্রি বন্ধুর পথ',[১৬৩] 'শতাব্দীর শৃঙ্খলাবন্ধন'[১৬৪] বলে উল্লেখ করে তড়িৎ আলোক লয়ে'[১৬৫] জিন্নাহর আবির্ভাবকে মুক্তির বার্তাবাহক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কবি মনে করেন, জিন্নাহর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে ইসলামের নবজাগরণ ঘটবে।

'কারবালা শেষে নতুন করিয়া ইসলামের এই নবোত্থান
মূক মুখে শুনি আবার এখানে নবজীবনের মুক্তিগান।
তোমার মুখের কালাম শুনিল : আজাদ! আমরা আজাদ জাতি,
নিমিষে দাঁড়াল ঝাণ্ডা উড়ায়ে : সমুখে আঁধার গহীন রাতি।'[১৬৬]

সুফিয়া কামালের 'আজাদীর ফরমান'[১৬৭] কবিতায় পাকিস্তান পূর্ব মুসলমানদের বেদনা-বঞ্চনা-অপমানের বিবরণ বিধৃত হয়েছে। তারপর সকালের আলো হয়ে আজাদী এলো। আজাদীর আলোয় সকল বিহবলতা, দ্বিধা, সংকোচ, শংকা কাটিয়ে মুসলমানরা সামিল হলো আজাদীর মিছিলে। সেই মিছিলের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আর তার পেছনে সেনাদলের মতো পাকিস্তানি মুসলমানেরা। দীর্ঘকাল অধিকারবঞ্চিত মুসলমানরা যখন আজাদীর আলোয় নিজেদের স্বরূপ চিনতে পারল তখন তারা আল্লাহর নামে পথ চলতে শুরু করল ভবিষ্যত পাকিস্তান বিনির্মাণের ব্রত নিয়ে।

'সেই 'নার' সেই 'তকবীর' ধ্বনি ভাঙিয়াছে জিন্দান
মুসলিম আজ লাভ করিয়াছে তাই আজাদীর ফরমান।'[১৬৮]

প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৭-১৯৭৫) বাঙালি জাতীয়তাবাদের দৃঢ় সমর্থক হলেও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাবে কিছু কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। সেই সব কবিতার মধ্যে রয়েছে 'কায়েদে আজম'[১৬৯] 'নেই রাত্রি', 'আগামী দিনের স্বপ্ন', 'আর কোনো দেশে', 'অনাগত', 'সংকল্প' প্রভৃতি।[১৭০] এছাড়াও লিখেছেন 'নিশান বরদার' [১৭১] নামক একটি গীতিচিত্র। তাঁর পাকিস্তান চেতনা পুরোপুরি ইসলামি ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ছিলনা। বরং ছিল ফরাসি বিপ্লব প্রভাবিত। কবির কল্পিত পাকিস্তানে থাকবে সকল নাগরিকের সমানাধিকার, থাকবে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সবাই সমানভাবে পাবে স্বাধীনতার স্বাদ। জিন্নাহর পাকিস্তানকে কবি 'একান্ত স্বপ্ন সাধনার মূল্যে পাওয়া... পরম সম্মান'[১৭২] বলে আখ্যা দিয়েছেন। আবদুল হাই মাশরেকী (১৯১৯-) নামে একজন কবির নাম পাওয়া যায় যিনি পাকিস্তানকে বিষয়বস্তু করে 'মাহেনও' পত্রিকায় 'নিশান' (আশ্বিন ১৩৫২), 'পল্লীগীতি' (পৌষ ১৩৫২), 'হে আমার দেশ' (ভাদ্র ১৩৫৮), 'ডাক দিয়ে যাবো' (বৈশাখ ১৩৬১) 'ইতিহাস' (কার্তিক ১৩৫৬) প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন। তিনি মনে করেন

ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের মাটি 'কাবার-হৃদয়'[১৭৩] সদৃশ মাহাত্ম্য লাভ করবে। মযহারুল ইসলাম (১৯২১-২০০৯) কায়েদে আজমকে 'নতুন মাটির স্রষ্টা' [১৭৪] এবং 'মৃত্যু-জয়ী সে এক সৈনিক'[১৭৫] বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাবীবুর রহমান (১৯২২-১৯৭৬) 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'উত্তরায়ণ' (শ্রাবণ ১৩৫২), 'তিনসুর', (ফাল্গুন ১৩৫৩), 'ইন্তেজার', (জৈষ্ঠ ১৩৫৪), 'নতুন সূর্যের ডাকে' (ভাদ্র ১৩৫৪), 'দিন বয়ে যায়' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৭) প্রভৃতি কবিতায় পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন। আজাদী লাভের পর পাকিস্তান ভূখণ্ডে আঁধার কেটে গিয়ে জীবন-জোয়ারের ফোয়ারা ছুটবে, নতুন জীবনচেতনায় পাকিস্তানের বিগতকালের দুঃখ দারিদ্রের অবসান ঘটবে, পাকিস্তানবাসীরা শুচিশুভ্র হয়ে বলিষ্ঠ গৌরব নিয়ে বেঁচে উঠবে এই আশা ও স্বপ্ন ব্যক্ত হয়েছে তার কবিতায়। সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৫-) ইসলামি আদর্শে দেশ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তার কবিতায়। ইসলামের পরশে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো একদা যেমন জেগে উঠেছিল সেই একইভাবে পাকিস্তানও জেগে উঠতে পারে বলে কবির বিশ্বাস।[১৭৬] ইসলামি আদর্শের 'তীব্র দহনে' কবি নিজ অন্তরে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা অনুভব করেছেন। ইসলামি আদর্শের পরশে কবির 'নতুন মাটির বুকে সৃষ্টির অঙ্কুর জাগে।'[১৭৭] কবি ইসলামি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে পাকিস্তানের মুসলমানদের সামনে এগিয়ে যাবার আহবান জানিয়েছেন।

আবদুল গনি হাজারী (১৯২৬-১৯৭৬) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে 'খোশ আমদেদ' জানিয়ে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'এই আজাদী' (ভাদ্র ১৩৫৪), 'সে যে ভুল বুঝিলাম' (অগ্রহায়ন ১৩৫২), 'হে নাবিক' (পৈষ ১৩৫২), 'চিঠি' (মাঘ ১৩৫২), 'মানুষ' (ফাল্গুন ১৩৫২), 'এই বেহেস্ত' (আশ্বিন ১৩৫৪), প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন। আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (১৯২৬-) পাকিস্তান ও জিন্নাহকে সমার্থক করে দেখেছেন। তিনি পাকিস্তানে 'বাদশা-নবাব' বর্জিত 'খোদার রাজ্য' [১৭৮] প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। কবি মনে করেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলমানদের জীবনসূর্য কালো মেঘে ঢাকা ছিল। আলোহারা এই মুসলিম জাতিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আলোর দিশা দেখিয়েছেন জিন্নাহ। 'কাণ্ডারীহারা সীমাহীন পারাবারে'[১৭৯] মুসলিম জাতিকে গন্তব্য তীরের হদিশও দিয়েছেন তিনি। উত্তর কালে লোকসাহিত্য গবেষণার অন্যতম অগ্রপথিক আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৬-২০২০) অনেক তরুণের মতোই পাকিস্তান-স্বপ্নে বিভোর হয়ে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় যেসব কবিতা লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে আছে 'হে বীর সেনানী' (মাঘ ১৩৫২), 'অক্টোপাস' (ভাদ্র ১৩৫২), 'কবরের পাশে কৃষাণী কাঁদে' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৩), 'প্রাণসমুদ্র' (পৌষ ১৩৫৬), 'কাজলদীঘি' (ভাদ্র ১৩৫৯) প্রভৃতি এবং কায়েদে আজম স্মরণ 'মাহেনও' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৃত্যু নেই' (সেপ্টেম্বর ১৯৫২) নামের একটি কবিতা রয়েছে। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল ইসলামের গৌরবময় দিগ্বিজয়ের ইতিহাস, আর লক্ষ ছিল ইসলামি জীবনদর্শন ও আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি। ইসলামি আদর্শপুষ্ট পাকিস্তানি ভাবাদর্শের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নতুন ধারার সাহিত্য রচনার জন্যও তিনি মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের আহবান জানিয়েছেন। এমনকী পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য নতুন ইতিহাস রচনার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে মুসলিম 'বীর সেনানী'র প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

'জাতির নয়নে নোতুন আলো নোতুন প্রদীপ ধরো
হে বীর সেনানী। নোতুন কবিরা নয়া ইতিহাস গড়ো।'[১৮০]

জিলুর রহমান সিদ্দিকীর (১৯২৮-২০১৪) 'পাকিস্তান'[১৮১] কবিতার বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের মুসলমানরা এক সময়ে শাসন ক্ষমতার জোরে 'শ্বেতপাথরের ইমারত'[১৮২] রূপী যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা ধ্বংস হয়ে গেছে। ভিনদেশী দস্যুরা তাদের সকল সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। সেই মুসলিম সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারপূর্বক নতুন পাকিস্তান বিনির্মাণের উদাত্ত আহবান জানিয়ে তিনি লিখেছেন :

'নয়া জামানার শুনছ আজান?
তবে ওঠো আজ হে মুসলমান,
তবে গড়ে তোল নয়া মঞ্জিল-পাকিস্তান।'[১৮৩]

জাহানারা আরজু (জ. ১৯৩২) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সৈনিকদের 'আল হাইদর'[১৮৪] আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের আজাদীকে 'শত সাগরের শত শত ঢেউ'[১৮৫] এর কল্লোল বলে বর্ণনা করেছেন। আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন (১৯৩৪-) পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে নতুন যুগের আভাস দেখতে পেয়েছিলেন। 'কায়েদে আজমকে'[১৮৬] কবিতায় নতুন যুগের অভিযাত্রায় শরিক হবার জন্য পাকিস্তানের মুসলিম জনতাকে আহবান জানিয়েছেন। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (১৯৩৬-) পাকিস্তানকে এক স্বপ্নময় দেশ হিসেবে কল্পনা করে কবিতা লিখেছেন। কায়েদে আজম স্মরণে 'নায়কের নাম'[১৮৭] কবিতায় জিন্নাহকে তিনি 'আলোকের পথে' যাত্রী বল্লে উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬-) 'কায়েদে আজমকে',[১৮৮] আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯), 'ইতিহাস'[১৮৯] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮) 'জন্মদিন প্রতিদিন'[১৯০] জামালউদ্দিন মোল্লা 'প্রভাত-কামনা'[১৯১] প্রভৃতি কবিতায় জিন্নাহকে বিভিন্ন বিশেষণে বিভূষিত করে নতুন নতুন মাহাত্ম্য আরোপ করেছেন।

উপসংহার

ঊনিশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম সমাজে যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে তার প্রভাব বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা কবিতার ওপরও পড়ে। এই সময়ে বাংলা কবিতায় শুভসুন্দর যে ইসলামি ধারা গড়ে ওঠে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সেই ধারাটিকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে জর্জরিত করে। পাকিস্তান-আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে বাংলা কবিতা, বিশেষত পূর্ববাংলার কবিতা, স্বতন্ত্র ধারায় চিহ্নিত হয়ে ওঠে। কবিতার এই পথচলায় সামিল হয়ে একদল কবি পাকিস্তানি ভাবধারাপুষ্ট কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রচারে এই কবিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং সেই লক্ষ্যে তাদের কবিতার বিষয় বক্তব্য নির্ধারণ করেন। এই কবিরা মূলত ইসলামসংশ্লিষ্ট বিষয়কেই তাদের কবিতার উপজীব্য হিসেবে বেছেনেন। ইসলামি বিষয় ছাড়াও পাকিস্তান-আন্দোলন সমর্থন, পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব, পাকিস্তানকে ঘিরে মুসলমানদের স্বপ্ননির্মাণ, পাকিস্তানি শাসকদের গুণকীর্তন, তাদের যুদ্ধবাদী

নীতিকে সমর্থন, জিন্নাহর কৃতিত্ব, ইকবাল-বন্দনা, প্রগতিশীলতা ও কমিউনিজমের বিরোধিতা প্রভৃতি বিষয়বস্তু তাদের কবিতায় প্রাধান্য পায়। ইকবালের কবিতা উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করার মধ্যেও ধর্মীয় এবং পাকিস্তানি চেতনা সক্রিয় ছিল। এই কবিদের বিশ্বাস, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে, ইসলামের বীর যোদ্ধাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, ইসলামের বিধিনিষেধ মেনে, ইসলামের জীবনদর্শনকে অনুসরণ করে মুসলমানদের পথ চলতে হবে, মুসলিম পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে- তাহলেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলমানদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে। এই কবিরা বাংলা কবিতার চিরন্তন প্রবাহ থেকে সরে এসে বিষয়ের খোঁজে, বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে আরব-ইরানের পথে পা বাড়ান, আরবি-ফারসি উপাখ্যান ও ইসলামের পৌরাণিক কাহিনির প্রতি দৃষ্টি দেন। দোভাষী পুঁথির ভাণ্ডার অনুসন্ধান করেন। বাংলা সাহিত্যের বিশাল ও সমৃদ্ধ ভাণ্ডার মুসলমানদের নিজস্ব সম্পদ নয়, ইসলামি ঐতিহ্য পুঁথিসাহিত্য তাদের উত্তরাধিকার বলে কোনো কোনো কবি মত প্রকশ করেন। শুধু বিষয়বস্তু এবং উত্তরাধিকারের খোঁজেই নয়, উপমা-রূপক চিত্রকল্প নির্মাণেও তারা ইসলামি অনুষঙ্গের আশ্রয় নেন। এমনকী মুসলিম লীগ সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে সমর্থন জানিয়ে বা তার সাথে সঙ্গতি রেখে, কবিতায় ব্যাপকভাবে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার এবং ব্যবহৃত শব্দের আরবি- ফারসি উচ্চারণের ঢঙ আনবার জন্য তাদের কবিতায় বিশেষ এক বানানরীতি প্রবর্তন করেন। পাকিস্তান-চেতনার ধারক এই কবিরা বাংলা কবিতাকে সর্বতোভাবে 'পাকিস্তানি' বানানোর কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল 'পাকিস্তানি বাংলা' সৃষ্টি করা। তবে শিল্প বিচারের মানদণ্ডে এই পাকিস্তানি বাংলা বিশেষ সফল হয়নি, ফলে কাব্যমূল্যও পায়নি। মাত্র কয়েকজন বাদে পাকিস্তানবাদী এই কবিদের কেউই তেমন বিশিষ্ট বা গুরুত্বপূর্ণ নন। তাদের কবিতাও বিশেষ উচ্চাঙ্গের নয়। কালের বিবর্তনে এইসব কবি ও কবিতা আজ মূল্যহীন, কবিরাও বিস্মৃত, তাদের কবিতাও দুষ্প্রাপ্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের তোড়ে এই কবিরা সংকুচিত হয়ে পড়েন, পূর্বতন কবিতাকে অস্বীকারও করেন। কেউ কেউ আবার সারাজীবনই পাকিস্তান চেতনায় বিভোর ও অবিচল থেকেছেন। তবে সব মিলিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের তীব্র আলোর ঝলকানিতে এইসব কবিতা ম্লান হয়ে পড়ে। জাতীয় চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা, মানবতাবাদ একটি পর্যায়ে পাকিস্তান চেতনাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। বাংলা কবিতার হাজার বছরের ইতিহাসে পাকিস্তানি চেতনার এইসব কবিতার বিশেষ গুরুত্ব না থাকলেও স্বতন্ত্র ধারার কবিতা হিসেবে এগুলোর একটি জায়গা রয়েছে। সর্বোপরি কবিতাগুলি পাকিস্তান-চেতনার অন্যতম প্রামাণ্য দলিল।

তথ্যনির্দেশ

১. নিতাই দাস, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৮
২. অমলেন্দু দে, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, রত্না প্রকাশন, কলকাতা , ১৯৭৪, পৃ. ৩১০-১১
৩. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৪. মাসিক নওবাহার, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৫৬
৫. সাঈদ-উর রহমান, পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৯০, পৃ. ১৩৮
৬. আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আমার শিল্পী জীবনের কথা, হাসি প্রকাশনী, ঢাকা , ২০০১ পৃ. ৯৬-৯৭

৭. গোলাম মোস্তফা, 'তারানা-ই-পাকিস্তান,' 'কাব্যগ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ,১৯৭১, পৃ. ২৮০
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
১০. প্রাগুক্ত
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
১২. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১৩. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. প্রাগুক্ত
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪
২১. প্রাগুক্ত
২২. প্রাগুক্ত
২৩. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
২৪. মাসিক নওবাহার, অগ্রহায়ণ ১৩৫১
২৫. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
২৬. খুশ-আমদিদ, মাসিক মাহেনও, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯
২৭. প্রাগুক্ত
২৮. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
২৯. সুফী জুলফিকার হায়দার, হুশিয়ার হও সাবধান, মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৫২
৩০. সুফী জুলফিকার হায়দার, 'তকদীর', ভাঙ্গা তলোয়ার, ইসলামিক একাডেমি, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ২২
৩১. প্রাগুক্ত
৩২. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৩৪. দেওয়ান আব্দুস হামিদ, কবি জুলফিকার হায়দার, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ৯৬
৩৫. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
৩৬. সুফী জুলফিকার হায়দার, পাকিস্তান যার আনলো যে গড়লো যারা, ইসলামি একাডেমি, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ২৯
৩৭. বেনজীর আহমদ, বেনজীর আহমদ রচনাবলী, ভুমিকা : শাহাবুদ্দীন আহমদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৬
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৩৯. প্রাগুক্ত
৪০. প্রাগুক্ত
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
৪২. প্রাগুক্ত, নয়াতারানা, পৃ. ২২৯
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. প্রাগুক্ত
৪৭. প্রাগুক্ত
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. ছদরুদ্দিন, দেশ-কাল-পাত্র, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা , ১৯৬৬, পৃ. ৯১
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫
৫১. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
৫২. ছদরুদ্দিন , '১৪ই আগস্ট', সংগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৫১, পৃ. ২৩
৫৩. প্রাগুক্ত
৫৪. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
৫৫. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৫৬. আজহারুল ইসলাম, ছায়াপথ, ইউসুফজী পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ২১
৫৭. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৫৮. আজহারুল ইসলাম, 'পাকিস্তান', 'ছায়াপথ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৫৯. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৬০. আজহারুল ইসলাম, 'রোজ এ পয়দায়েস', 'মাহেনও', পৌষ, ১৩৫৯
৬১. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
৬২. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৬৩. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
৬৪. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৬৫. রওশন ইজদানী, রাহগীর, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৪৯, পৃ. ৩১-৩২
৬৬. প্রাগুক্ত, পাকিস্তান, মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ ১৩৫০
৬৭. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৬৮. রওশন ইজদানী, পাকিস্তানের জঙ্গনামা, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২৩
৬৯. প্রাগুক্ত, 'কায়েদে আজম', মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৫১
৭০. প্রাগুক্ত
৭১. প্রাগুক্ত
৭২. প্রাগুক্ত
৭৩. প্রাগুক্ত, মহাপ্রয়াণে লৌহমানব, মাহেনও, সেপ্টেম্বর ১৯৫০
৭৪. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৭৫. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
৭৬. অধ্যাপক আব্দুল গফুর, 'আতিথ্যে উদার, আদর্শে নিরাপোষ', 'ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি, সম্পাদনা : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৯
৭৭. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
৭৮. শাহেদ আলী (সম্পা), আমাদের সাহিত্য ও ভাবনায় কায়েদে আজম, মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৩
৭৯. ফররুখ আহম্মদ, 'ফৌজের গান', 'আজাদ করো পাকিস্তান', ফররুখ আহমদ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৭৩
৮০. প্রাগুক্ত
৮১. প্রাগুক্ত
৮২. প্রাগুক্ত,'ওড়াও ঝাণ্ডা', 'আজাদ করো পাকিস্তান', পৃ. ৪৭৪

৮৩. প্রাগুক্ত
৮৪. প্রাগুক্ত,'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'আজাদ করো পাকিস্তান',পৃ. ৪৭৫
৮৫. প্রাগুক্ত
৮৬. প্রাগুক্ত,'নতুন মোহাররাম', 'আজাদ করো পাকিস্তান',পৃ. ৪৭৬
৮৭. প্রাগুক্ত,'পথ', 'আজাদ করো পাকিস্তান',পৃ. ৪৭৬
৮৮. প্রাগুক্ত
৮৯. প্রাগুক্ত,'নতুন মোহাররাম', 'আজাদ করো পাকিস্তান', পৃ. ৪৭৬
৯০. প্রাগুক্ত
৯১. প্রাগুক্ত,'পথ', 'আজাদ করো পাকিস্তান',পৃ. ৪৭৬-৪৭৭
৯২. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৯৪. ফররুখ আহম্মদ, 'পাকিস্তানের কবি'. 'আজাদ করো পাকিস্তান' প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯
৯৫. শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
৯৬. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৯৭. তালিম হোসেন, দিশারী, মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৫৬ [প্রচ্ছদে লেখার অংশবিশেষ]
৯৮. হাসান হাফিজুর রহমান, 'আধুনিক কবি ও কবিতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২৫০
৯৯. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
১০০. তালিম হোসেন, 'পাকিস্তান', দিশারী, মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৫৬ পৃ. ৪৩
১০১. প্রাগুক্ত
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১০৩. প্রাগুক্ত, 'হে আল্লামা', পৃ. ৫২
১০৪. প্রাগুক্ত, 'ফারুকে আজম', পৃ. ৬৩
১০৫. প্রাগুক্ত, 'শাহীন', মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ৬
১০৬. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
১০৮. মুফাখখারুল ইসলাম, 'মাশরেকী পাকিস্তানের তমদ্দনী মীরাস', মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬২
১০৯. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
১১০. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
১১১. মুফাখখারুল ইসলাম, 'বুলবুলিস্তান', মাসিক মোহাম্মদী আশ্বিন, ১৩৫০
১১২. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
১১৩. মুফাখখারুল ইসলাম, 'তারানা-ই-পাকিস্তান', মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রাহায়ণ-পৌষ ১৩৫১
১১৪. প্রাগুক্ত
১১৫. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
১১৬. মুফাখখারুল ইসলাম, 'ব্যক্তি', 'মাসিক মোহাম্মদী', ফাল্গুন ১৩৫৮
১১৭. প্রাগুক্ত
১১৮. প্রাগুক্ত, 'কায়েদে আজম মরহুম', মাহেনও, আশ্বিন ১৩৫৭
১১৯. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
১২০. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বাংলাকাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৩৭২, পৃ. ২১৯
১২১. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

১২২. সৈয়দ আলী আহসান, চাহার দশবেশ ও অন্যান্য কবিতা, মোকারবম পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৫, সৈয়দ আলী আশরাফ লিখিত ভূমিকা, পৃ-১২-১৩
১২৩. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
১২৪. সৈয়দ আলী আহসান, কবিতা সমগ্র, শিখা প্রকাশর্নী, ঢাকা, ২০০৯, প. ২৪৫
১২৫. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
১২৬. সৈয়দ আলী আহসান, কবিতাসমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
১২৭. প্রাগুক্ত, 'বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন',মাহেনও, বৈশাখ ১৩৫৬
১২৮. প্রাগুক্ত
১২৯. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
১৩০. সৈয়দ আলী আহসান, 'বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন', প্রাগুক্ত
১৩১. শাহেদ আলী (সম্পা) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
১৩২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবুহেনা মোস্তফা কামাল (সম্পা) পূর্ববাংলার কবিতা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৫৪
১৩৩. শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত,
১৩৪. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'কায়েদে আজম স্মরণে', শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
১৩৭. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
১৩৮. মাসিক মোহাম্মদী, জৈষ্ঠ ১৩৫৩
১৩৯. শাহাদাত হোসেন, 'জিন্দা পাকিস্তান', কাব্য বীথিকা, বন্দে আলী মিয়া (সম্পা.), বিশ্বতোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৬৮, পৃ. ১১৩
১৪০. শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
১৪১. মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৩
১৪২. বন্দে আলী মিয়া, 'জাতির জনক', মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৩
১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
১৪৪. পাক-সমাচার, ডিসেম্বর ১৯৬৩
১৪৫. মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, 'কায়েদে আজম স্মরণে', পাক-সমাচার, ডিসেম্বর ১৯৬৩
১৪৬. শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
১৪৭. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭
১৪৮. মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৯৫৩
১৪৯. শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৫১
১৫১. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭
১৫২. সুফিয়া কামাল, হে সিপাহসালার, মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৩
১৫৩. প্রাগুক্ত
১৫৪. প্রাগুক্ত
১৫৫. প্রাগুক্ত, হে মহান নেতা, মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৪
১৫৬. প্রাগুক্ত, হে মশালধারী, মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৫
১৫৭. প্রাগুক্ত
১৫৮. প্রাগুক্ত, হে অমর প্রাণ, মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৯

১৫৯. প্রাগুক্ত
১৬০. প্রাগুক্ত, করোনা সংশয়, মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৭
১৬১. প্রাগুক্ত, তোমার জন্মদিনে, পাক-সমাচার, ডিসেম্বর ১৯৬৩
১৬২. প্রাগুক্ত, হে অমর প্রাণ, মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৯
১৬৩. প্রাগুক্ত, নির্ভীক মহাপ্রাণ, মাহেনও ডিসেম্বর ১৯৫২
১৬৪. প্রাগুক্ত, স্মরণীয়, পাকিস্তানী খবর, আগস্ট ১৯৬৬
১৬৫. প্রাগুক্ত, নির্ভীক মহাপ্রাণ, মাহেনও ডিসেম্বর ১৯৫২
১৬৬. প্রাগুক্ত, হে অমর প্রাণ, মাহেনও, ডিসেম্বর ১৯৫৯
১৬৭. প্রাগুক্ত, মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৫৪
১৬৮. প্রাগুক্ত, আজাদীর ফরমান, মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৫৪
১৬৯. শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
১৭০. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-২২৯
১৭১. শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
১৭২. সিকানদার আবু জাফর, 'নিশান বরদার', শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
১৭৩. প্রাগুক্ত, ইতিহাস, মাহেনও, কার্তিক ১৩৫৬
১৭৪. মযহারুল ইসলাম, স্রষ্টার প্রতি, শাহেদ আলী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭৩
১৭৫. প্রাগুক্ত, তারেই স্মরণ করি, প. ১৭৫
১৭৬. সৈয়দ আলী আশরাফ, বীর আসোয়ার, মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ ১৩৫১
১৭৭. নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১
১৭৮. আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, মানুষঃ পৃথিবী, মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ ১৩৫৮
১৭৯. প্রাগুক্ত, 'অঙ্গীকার শাহেদ আলী (সম্পা), পৃ. ১৭৮
১৮০. আশরাফ সিদ্দিকী, হে বীর সেনানী, মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ ১৩৫২
১৮১. জিলুর রহমান সিদ্দিকী, মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৫৩
১৮২. প্রাগুক্ত, 'পাকিস্তান', মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৫৩
১৮৩. প্রাগুক্ত
১৮৪. জাহানারা আরজু, 'সেনানী', সৈনিক, ২৭ শ্রাবণ ১৩৫৬
১৮৫. প্রাগুক্ত
১৮৬. মাহেনও ডিসেম্বর ১৯৫৪
১৮৭. পাকিস্তানি খবর, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
১৮৮. মাহেনও ডিসেম্বর ১৯৫৩
১৮৯. প্রাগুক্ত
১৯০. মাহেনও ডিসেম্বর ১৯৫৬
১৯১. মাহেনও ডিসেম্বর ১৯৫৫

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 117-122

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের গল্পে প্রান্তিক মানুষ

সুনন্দা ঘোষ
পিএইচডি গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত
e-mail : sunandaghosh.sonai01@gmail.com

সারসংক্ষেপ

শ্রেণিবিভাগ সমাজের এক অতি পুরনো রোগ। এই রোগ থেকে সমাজের মুক্তি এখনো ঘটেনি। এই শ্রেণিবিভেদের রোগটি ধীরে ধীরে সমাজে পোষা হয়ে গেছে। এই বিভেদের শিকার হয়ে আসছে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের লোকগুলি। সমাজের অবহেলিত, লাঞ্ছিত শ্রেণিটি প্রান্তিক পর্যায়ে পড়ে। ক্ষমতাবান উচ্চবিত্ত লোকের দ্বারা শোষিত হতে হতে তাদের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় তখন গড়ে উঠে তাদের প্রতিবাদ বা বাঁচার লড়াই। কিন্তু ভালো করে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় প্রান্তিক ও ক্ষমতাবান বিষয়দুটি আপেক্ষিক। প্রান্তিক শব্দের সংজ্ঞা সময় অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

উচ্চবিত্ত ও প্রান্তিক মানুষের মধ্যেও শ্রেণিভেদ রয়েছে। যেমন উচ্চবিত্তের মধ্যে যদি কোন ক্ষমতাবান লোক একই বিত্তের অন্য লোককে শোষণের চেষ্টা করে তখন শোষিত ব্যক্তিটি প্রান্তিক পর্যায়ে চলে যায়। শ্রেণিবিভেদের এইরূপ ও প্রান্তিকদের বাঁচার লড়াই এই গবেষণার মূল বিষয়।

মূলশব্দ

প্রান্তিক, শ্রেণিবিভেদ, সমাজ

ভূমিকা

প্রান্তিক মানুষ বলতে সাধারণত সমাজের অকিঞ্চিৎকর বা মূল স্রোতের বিপরীতে কোণঠাসা গৌণ শ্রেণিকে গণ্য করা হয়। যাদের কাজকর্ম সমাজের মুখ্য শ্রেণির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় নিচুতলার মানুষগুলো প্রায় সময় একটি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করে। মূলত উত্তর-আধুনিক চিন্তাধারাতে ধরা পড়েছে Subaltern অস্তিত্ব। এখানে পৃথিবীকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম-বিত্তশালী, দ্বিতীয়-নিরন্ন। সাবলটার্ন সাধারণ শ্রেণির নিচে বসবাস করে। যাদের প্রত্যেক দিনের দিনযাপন সাধারণ শ্রেণির দিনযাপনের সঙ্গে মেলে না। সাবলটার্ন শব্দটি প্রথম প্রকাশের এলে এর অর্থ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের নিচে অবস্থানকারী এক শ্রেণির সাধারণ মানুষ। কিন্তু

পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষণায় জানা যায় প্রান্তিক বা ক্ষমতাবান বিষয়টি আপেক্ষিক এবং প্রান্তিক শব্দের সংজ্ঞা সময় অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ মানুষের যে শ্রেণিগত অবস্থান সেটা ধনী, মধ্যবিত্ত বা প্রান্তিক যেকোনো পর্যায়ে বিদ্যমান। এই শ্রেণিভেদে সূত্র ধরেই কেউ ক্ষমতাবান ও কেউ ক্ষমতাহীন হয়ে যেতে পারে। এই শ্রেণি নির্ণয় নির্ভর করছে 'ক্ষমতা' শব্দের উপর। তাত্ত্বিক দিক থেকে যার নাম দেওয়া হয়েছে আধিপত্যবাদ। আধিপত্য প্রদর্শনের বিষয়টি চিরকাল চালিত হয়ে আসছে সমাজে। গোষ্ঠী জীবন থেকে সমাজ জীবনে প্রবেশ করার সময় থেকে কিংবা গোষ্ঠী জীবন যাপন করার সময় থেকেই আধিপত্য সচল রয়েছে সমাজে। যেমন যে ক্ষমতা খাটাতে পারবে সে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ক্ষমতায় থাকবে এবং সেই গণ্ডির মধ্যে বাকিরা হবে ক্ষমতাহীন বা প্রান্তিক মানুষ। আবার সাধারণ চোখে যাদের প্রান্তিক বলে ধরে নেওয়া হয় সেই দরিদ্র শ্রেণি সব সময় প্রান্তিক স্তরে থাকে না। সেই একই শ্রেণির মধ্যে বিভাজন ঘটে যেতে পারে। এমনকি ক্ষমতাবানেরা ক্ষমতাহীন হয়ে যেতে পারে। ভূমিকা বদল হয়ে যেতে পারে সকলের। প্রান্তিক মানুষের সেই প্রকৃত স্বরূপ জায়গা করে নিতে পেরেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকের কলমে। এক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লেখক লেখিকাদের কলমেও ধরা পড়েছে নিরন্ন মানুষের প্রকৃত সংজ্ঞা। সুতরাং 'প্রান্তিক মানুষের প্রতিবেদন' বিষয়টি আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বেছে নেবো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লেখক জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের দুটি গল্প 'ক্রসিংগেট' ও 'রাঙ্গা ডাইনের বেত্তান্ত'।

উদ্দেশ্য

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত বিংশ শতকের ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম একজন লেখক। তার লেখা বিভিন্ন ছোট গল্পে ধরা পড়েছে খেটে খাওয়া ও প্রান্তিক মানুষের জীবনচিত্র। সমাজের পুরনো অসুখ শ্রেণিবিভেদকে তিনি আধুনিকতার স্পর্শে পুনর্জীবিত করেছেন তাঁর রচনায়। সেই শ্রেণিবৈষম্য ও প্রান্তিক মানুষের বাঁচার লড়াইয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ এই আলোচনার আধার। প্রান্তিক মানুষের অবস্থান রূপায়নে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের গল্পের বিশেষত্ব এই পর্যালোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

প্রান্তিক মানুষের প্রতিবেদন হিসেবে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের আলোচ্য গল্পগুলোর বিশ্লেষণ এর আগে হয়নি।

পদ্ধতি

এই গবেষণা পত্রটি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে লেখা এবং কিছুটা ক্ষেত্র অধ্যয়নের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে এই গবেষণায় নানা বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

'ক্রসিংগেট' গল্পে মালসা চরিত্রটি প্রান্তিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্য বহন করছে। যখন কোনো মালসা পুজোর প্যান্ডেলে কাজ করে দেয়, কোনো মালসা মাতাল হয়ে পড়ে থাকে আবার কোনো মালসা লোকের ফাই-ফরমাশ খাটে ও নিরন্ন ভিখারীর মতো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে খায় এবং রেল লাইনের ধারে বা ক্রসিংগেটে আস্তানা গড়ে তখন প্রতিটি মালসা চরিত্র প্রান্তিক মানুষের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে মালসা একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের নাম নয়। বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক, নিরন্ন বা খেটে খাওয়া মানুষের ছবি এই মালসা চরিত্রে পরিণতি পেয়েছে। রাস্তায় মালসার পাগলামো গালি-মন্দ ইত্যাদি চারপাশের দোকানি ও পথচারিদের আমোদ বাড়ায়। কাজকর্মে একঘেয়েমি কাটানোর জন্য মেথরপট্টির বাচ্চাগুলি পর্যন্ত মালসাকে খেপিয়ে তোলে কৌতুক লাভ করে। লেখকের ভাষায়- "একঘেয়ে কাজ কারবারের মাঝে একটুখানি জিরেন।"[১] আবার কখনো মজা ভোগ করা দোকানিদের মালসা বাপ-মা তুলে গালি দিলে তাকে উল্টো কিল-ঘুষি খেতে হয়। এসবের মধ্য দিয়ে মালসার অসহায় প্রান্তিক স্বরূপটি ফুটে উঠেছে।

সমাজের উচ্চবিত্ত লোকের কাছে পেশায় ড্রাইভারের কাজ করা লোকটি তুলনামূলক প্রান্তিক পর্যায়ের। কিন্তু মালসার হাত থেকে একটি ঢিল গাড়ির উইন্ডশিল্ডে পড়তেই ড্রাইভারের আক্রমণের শিকার হয় মালসা– "মুহূর্তেই ফাটা দাগ পড়ে গেল কাঁচে। ড্রাইভারটাও গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে লাফিয়ে নেমে তেড়ে গেল মালসার দিকে, সঙ্গে হ্যানিম্যান ও দু-চারজন অন্য গাড়ির যুবক যাত্রী। শুরু হলো তাণ্ডব- 'ফুট ক্যালা... ভাগ।'[২] এখানে প্রান্তিকের দলে থেকেও মালসা প্রান্তিক রূপে এবং ড্রাইভার ও অন্যান্যরা ক্ষমতাবান রূপে চিহ্নিত হচ্ছে।

কখনো কখনো এই ক্ষমতাহীন মালসাকে ক্ষমতাবান হতে দেখা যায়। যখন নিরন্ন মালসা খাবারের সন্ধানে ডাস্টবিনের মধ্যে খাবারের উৎস খুঁজে নেয় তখন এক সারিতে থাকা কুকুরগুলো মালসার সঙ্গে পেরে ওঠে না - "কোনো ঘেউ কুকুর তার ধারে কাছে আসতে পারেনি কখনো। কারণটা বোধহয় ওই তাপ্পিমারা চপ্পল, যা দরকারে এতদিন উঁচিয়ে ধরেছে।"[৩] প্রান্তিক অবস্থানে তখন কুকুরেরা আর মালসা ভোগাধিকার পেয়ে ক্ষমতাসম্পন্নের সারিতে উত্তরণ লাভ করেছে- এভাবে তার স্থান বদল হয়েছে।

চারপাশের জীবনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রতিটি মানুষ একটি প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সঠিক জিনিস বেছে নিয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। এই গল্পে প্রান্তিক চরিত্র মালসাও উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তার প্রতিরোধের ছবি ছেঁড়া চটি ছেড়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে– "মানুষের স্বভাব হলো পুরনো জিনিস প্রয়োজন ফুরালে ফেলে দেওয়া– সে একপাটি তাপ্পিহীন চপ্পল পেয়েছে বলেই না আগেরটা ছুঁড়ে ফেলেছে।"[৪] কিংবা "তাপ্পিমারা চপ্পল, যা সে দরকারে এতদিন উঁচিয়ে ধরেছে।– সেটা ওই ঘেয়ো কুকুরগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মালসা কোন ভুল করল না তো!...।"[৫] এক্ষেত্রে তাপ্পিমারা চপ্পলটা মালসার প্রতিরোধের অস্ত্র, সেটা উঁচিয়ে ধরলে শুরু হয় অস্ত্রের ব্যবহার, তৈরি হয় প্রতিরোধের ভাষা। আর সেটা ত্যাগ করলে

প্রতিরোধের সম্ভাবনা কমে যায়, অবস্থান পরিবর্তনের আখ্যান সূচিত হয়– সে তখন ফিরে যায় তার প্রান্তিকায়িত অবস্থানে।

এই গল্পে দিব্যাংশুর চোখ দিয়ে লেখক মালসাকে দেখিয়েছেন। পরিস্থিতির চাপে দিব্যাংশুকেও মালসায় রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। স্ত্রীর নাগরিকত্বের কাগজগুলি দেখে সার্কেল অফিসের লোকেরা সন্তুষ্ট হলে "আপনি থাকছেন ম্যাম"[৬] বলার ইচ্ছের মধ্যে তার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এক্ষেত্রে কাগজই তাদের অস্ত্র। যেমন মালসার কাছে তার চটি, বোতল ইত্যাদি। লেখক তার কলমের জাদুতে মালসা ও সাধারণ লোকদের একটি পর্যায়ে এক করে দিয়েছেন। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেকেরই মালসা বা সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ভূমিকা বদল হয়ে যেতে পারে সকলের। প্রান্তিক অবস্থান থেকে আধিপত্যের কেন্দ্রে আসা যাওয়া এভাবে চলতে থাকে নিরন্তর আমাদের সমাজ তথা ব্যক্তিগত জীবনে- সেকথাই লেখকের বয়ানে ফুটে ওঠে বারবার।

গল্প, কবিতা বা সাহিত্যের যেকোনো বিষয়ের শিরোনাম নির্দিষ্ট বিষয়ের মূল বক্তব্যের পূর্বাভাস বহন করে। সেক্ষেত্রে 'ক্রসিংগেট' শুধুমাত্র একটি গল্পের নামকরণ নয়। ক্রসিংগেট এক মধ্যবর্তী প্রদেশকে চিহ্নিত করছে। যার একদিকে গেলে কেউ মালসার মতো প্রান্তিক হয়ে উঠতে পারে, আবার অন্যদিকে গেলে সমাজের আধিপত্যকামী ভদ্রশ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে। মানুষের অবস্থান যে আপেক্ষিক সেই কথাই প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে।

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের লেখা অন্যতম গল্প "রাঙা ডাইনের বেত্তান্ত"-তে দেখানো হয়েছে প্রান্তিক মানুষের জীবন-গাথার একটি রূপ। এই গল্পে রতি, রাঙামতী প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি। রতি কেড়ে খাওয়া নীতিতে বিশ্বাসী। সে নিজে বিশেষ কিছু করতে না পারলেও দাদার প্রাপ্যতে দখল নিতে ইচ্ছুক- "রতির কাজ ছিল শহরে গিয়ে ফুল বিক্রি করা। কিন্তু বিক্রির পয়সা কোনদিনই সে দাদার হাতে তুলে দেয় নি।"[৭] এভাবে ফুলের চাষে উপেনদের সঙ্গে শরৎ-এর অংশীদারীতে ক্ষতির সম্ভাবনায় রতির কোনো চিন্তা নেই। এমনকি রতির বিরুদ্ধে অভিযোগ সে তার দাদা শরৎকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে-"রতি কে যারা চেনে, তারা আড়ালে বলে, সে- ই বিষ খাইয়ে...।"[৮] এখানে প্রান্তিক চরিত্র রতি ক্ষমতাবানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

নিজ স্বামী অর্থাৎ শরৎ- এর মৃত্যুর পর রাঙামতীর সংসারে অবলম্বন হিসেবে কেউ না থাকায় তার সমাজস্বীকৃত অবলম্বন হয়ে ওঠে রতি। কিন্তু ভোগবৃত্তির প্রকোপে সে রাঙ্গামতীর যোগ্য অবলম্বন হয়ে উঠতে পারেনি বরং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে রাঙামতীর কাছে নিজেকে জাহির করেছে বারবার– "উত্তরে রাঙামতী বলেছিল যে, বুড়ো মাস্টার টাকা দেবেন বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু দেননি- কোন 'গাউলা ব্যানের' খাতায় নাকি ঢুকিয়ে রাখবেন সেটা। রতি এ-কথা বিশ্বাস করল না। প্রথমে ভয় দেখিয়ে তারপর মারধর করে যখন রতি আশ্বস্ত হলো যে সত্যিই রাঙামতীর হাতে টাকা আসেনি, তখন সে আদায় করে নিলো শরীর।"[৯] বা "সদ্য বিধবা রাঙ্গা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোতে হয়ে পড়েছিল

বিহ্বল একে তো দিন-কে-দিন রতির খবরদারি করার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে সমাজও রতিকে রাঙামতির অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।"[১০]

এরপর সামাজিক জীবনে দেখা যায় শরৎ-এর। মালিক শরৎ-এর মৃত্যুর পর শুধু পাঁচশো টাকা হাতে দিয়ে বাকি প্রাপ্য টাকা গ্রামীণ ব্যাংকে রেখে দেওয়ার ভুল প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় করে রাঙামতীকে- "আমার উপেন বলেছে, এই খাতাটা গাঁউলীয়া ব্যাঙ্কে তোমার নামে করে দেবে। কিন্তু সেসব কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলো না। আমি সমস্ত কিছু বাবদ আরো হাজার পঁচিশ তোমার ওই খাতায় রেখে দেব।"[১১] সুতরাং সাংসারিক জীবনে যোগ্য অভিভাবকের অভাব ও সামাজিক শোষণ রাঙামতীকে নিজ পরিবারের মধ্যে প্রান্তিক স্তরে এনে দাঁড় করিয়েছে। জীবনের সমস্ত অবলম্বন হারিয়ে রাঙামতী মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শেষে লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী আদম বাবা হয়ে ওঠে তার একমাত্র আশ্রয়। মানুষ যখন অবলম্বনহীন হয়ে পড়ে তখন প্রতিরোধমূলক শক্তির উৎস হিসেবে যেকোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে শোষণের শিকার হওয়া সমাজে যেমন স্বাভাবিক। তেমনি দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে তারা ঘুরে প্রতিবাদ করতেও জানে। এই গল্পের শেষের দিকে রাঙামতী এতটাই ক্ষেপে যায় যে নিজের দুই সন্তানকে নির্দ্বিধায় মেরে ফেলতে পারে। এবং প্রতিশোধ মেটানোর জন্য উপযুক্ত সময়ে রতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং প্রান্তিক মানুষ যে কথা বলতে পারে, সেই ক্ষমতা রাঙামতীর রতিকে মেরে ফেলার মানসিকতা থেকে তৈরি হয় ও সেই সময়ের জন্য রাঙামতীর প্রান্তিক থেকে ক্ষমতাবানের ভূমিকা বদল ঘটে।

উপসংহার

প্রান্তিক জীবন সম্পর্কে আধুনিক সংজ্ঞার ছাপ আলোচ্য দুটি গল্পে প্রান্তিক চরিত্রগুলির বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিভাত। এখানে মালসা বা রাঙ্গামতী চরিত্র দুটি শুধু শোষিত নয়, প্রয়োজনে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের স্বর তাদের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। লেখকের লেখনি অনুযায়ী গল্পের চরিত্রগুলি প্রান্তিক ও ক্ষমতাবান দুটি পর্যায়েই ভূমিকা গ্রহণ করেছে সময় সাপেক্ষে।

সাধারণত দেখা যায়, আমরা বিভিন্ন সময়ে আধিপত্য খাটাতে চেষ্টা করি অন্যের উপর। এক্ষেত্রে যে ক্ষমতা খাটাতে পারবে সে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ক্ষমতায় থাকবে ও সেই গণ্ডির মধ্যে বাকিরা হবে ক্ষমতাহীন। এই ক্ষমতাহীনেরা তখন প্রান্তিক মানুষ ও ক্ষমতাবানেরা সাধারণ বা উচ্চ পর্যায়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিচিতি জায়গা, সময় ও পরিবেশ অনুযায়ী বদলায়। ফলে প্রায় সব মানুষই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক এক সময় প্রান্তিক মানুষে রূপান্তরিত হয় কিংবা সাধারণ স্তরে উন্নীত হয়। এক্ষেত্রে 'ক্রসিংগেট' গল্পে মধ্যবিত্ত চরিত্র দিব্যাংশু, গাড়ির ড্রাইভার এবং 'রাঙা ডাইনের বেত্তান্ত' গল্পে নিম্নবিত্ত চরিত্র রতি, রাঙামাতীর চরিত্রে ভূমিকা বদল স্পষ্ট ও প্রান্তিক মানুষের আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী চরিত্রগুলি সার্থক। প্রান্তিক মানুষ যে আধিপত্যকামী কেন্দ্রের কাছে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ করে

শুধু -এই ধারণা থেকে সরে এসে লেখক স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন, প্রান্তিক মানুষ প্রতিরোধের ভাষা তৈরি করতে পারে এবং সেখান থেকেও একধাপ এগিয়ে লেখক প্রতিপন্ন করেছেন যে, প্রান্তিক আর আধিপত্যকামী কেন্দ্রীয় অবস্থানের মধ্যে একমুখী নয়, বরং এক আপেক্ষিক সম্পর্কই বিদ্যমান। প্রান্তিক মানুষের অবস্থান রূপায়নে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের গল্পের মূল্যায়ন আমরা এভাবে করতে পারি।

তথ্যসূত্র-

১. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১৪৮
২. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১৫৫
৩. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১৪৮
৪. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১৪৮
৫. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১৪৯
৬. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১৫৩
৭. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১০৪
৮. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১০৫
৯. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১০৬
১০. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১০৬
১১. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), শিকড়ের নথিপত্র, লিপিকা নন্দী (প্রকাশক), পৃষ্ঠা- ১০৫

গ্রন্থপঞ্জি

১. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত (সম্পা.), "শিকড়ের নথিপত্র", লিপিকা নন্দী (প্রকাশক)
২. ডঃ চিত্ত মন্ডল, ডঃ প্রথমা রায় মন্ডল (সম্পা.), "নির্বাচিত দলিত প্রবন্ধ", অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩. গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), "নিম্নবর্গের ইতিহাস", আনন্দ
৪. জহরসেন মজুমদার, "নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন", পুনশ্চ

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 123-158

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের মতুয়াসংগীতের পূর্বাপর ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

সুরঞ্জন রায়

অবসরপ্রাপ্ত সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শহীদ আব্দুস সালাম ডিগ্রী কলেজ, কালিয়া, নড়াইল, বাংলাদেশ
email : suranjan.research@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে নমঃশূদ্র তৃতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এ জনগোষ্ঠীর জাগরণ হয় মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত মতুয়া ধর্মকে কেন্দ্র করে। 'মতুয়া' বলতে সাধারণত মত্ততা ও বিশেষ অর্থে, হরিনামে ও প্রেমে মত্ত হওয়াকে বোঝালেও, এ ধর্মমত বেদবিধি, তন্ত্রমন্ত্র, শৌচাশৌচ, যাগ-যজ্ঞ, সন্ন্যাস, বাণপ্রস্থ, তীর্থ ভ্রমণের প্রতি আস্থাহীন। লোকায়ত ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এ ধর্মমতের দার্শনিক ভিত্তি হলো হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা। অন্যান্য লোকধর্মের মতো এই ধর্মমতের অন্যতম সাধনার বিষয় হিসেবে মতুয়াসংগীতের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিসূত্রে কবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস (১৯০০-৭২) রচনা করেন প্রায় তেইশটি মতুয়াসংগীত। এই মতুয়াসংগীতগুলো রচিত হয়েছে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ, রসরাজ তারক সরকার, কবি অশ্বিনী সরকার, শ্রীপতিচাঁদ, অংশুপতি ঠাকুর, পোলাদ গোঁসাই ও গোবিন্দ গোঁসাইয়ের সুধাময় ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে। বহু ধরনের গানের গীতিকার কবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হয়ে তাঁকে মতুয়া হিসেবে উল্লেখ কতখানি যৌক্তিক সে বিষয়ে আলোকপাতসহ এ প্রবন্ধে মতুয়াসংগীতের সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

নমঃশূদ্র, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ, মতুয়াধর্ম, মতুয়াসংগীত, মতুয়ামেলা, সমাজতত্ত্ব, ক্ষেত্রসমীক্ষা

ভূমিকা

বাংলাদেশে তৃতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের জাগরণ হয়েছিলো মূলত 'মতুয়া' ধর্ম কেন্দ্র করে।[১] এ ধর্মমতের গোড়াপত্তন সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা হয়, রামদাস ব্রহ্মচারীই এ মতের উৎসপুরুষ। তিনি শক্তিসাধক হলেও পরবর্তীকালে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং যশোর (বর্তমান নড়াইল) জেলার লক্ষ্মীপাশা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পাঁচ/ ছয় পুরুষ পরে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) ও শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৪৩)-এর আবির্ভাব।[২] তাঁদের

নিরন্তর চেষ্টায় নিপীড়িত, নিগৃহীত, দলিত নমঃশূদ্রদের মধ্যে শুধু মতুয়া ধর্মের প্রসারই ঘটেনি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংগীত, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও শুরু হয় জাগরণ। এ জাগরণের সূত্রপাতকারী হিসেবে তাঁদের অবদানের পাশাপাশি যাঁরা এ জাগরণকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও দশরথ বিশ্বাস, বর্তমান নড়াইল জেলার জয়পুর গ্রামের তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৫-), বাগেরহাট জেলার লক্ষ্মীখালী গ্রামের গোপাল সাধু (১৩১৯-?),[৩] গোপালগঞ্জ জেলার দুর্গাপুর গ্রামের কবিয়াল হরিবর সরকার (১৮৬৯-১৯৫১), বাগেরহাট জেলার বেতকাটা গ্রামের আচার্য মহানন্দ হালদার (১৯০২-১৯৭২)[৪] ও ডা. সুধীরকুমার বাগচী অন্যতম।[৫] তাঁরা ছাড়া গোলক, হীরামন, বদন, লোচন, রামদাস, গোবিন্দ, বুদ্ধিমন্ত এবং জয়চাঁদও ছিলেন এ জাগরণের অন্যতম সারথি। তাঁদের মতুয়া ধর্মমত প্রচারের সময় স্বার্থবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজপতিরা এ ভাব-আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা হরিচাঁদ ঠাকুরের পার্ষদ ও অনুসারীদের পরিত্যাগ করা সহ 'ম'তো' বলে উপহাস করতেন। এভাবে এ সম্প্রদায়ের নাম হয়েছে 'মতুয়া'।[৬] বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো এ জনগোষ্ঠীর অবস্থান। সূচনাকারী হিসেবে উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ স্মরণীয় হলেও এ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ, কবিগান, অষ্টকগান ও মতুয়াসংগীত রচনায় অসংখ্য মানুষ যে অবদান রেখেছিলেন, তার তুলনা বিরল। বলা যায়, এ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্য থেকে যত সংখ্যক কবিয়ালের সৃষ্টি হয়েছে, সে তুলনায় অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত কবিদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। লোকগবেষক ড. অনুপম হীরা মণ্ডল এ ধারার ১৫০ জন কবিয়ালের নাম ঠিকানা উল্লেখ করেছেন।[৭] আর ড. স্বরোচিষ সরকার আঠারো, উনিশ ও বিশ শতক জড়িয়ে বাংলাদেশ ও ভারত মিলিয়ে ৮৮০ জন কবিয়াল ও জারি শিল্পীর নাম উল্লেখ করেন। তাঁদের মধ্যে মুসলিম কবিয়াল ও জারিগানের শিল্পীর সংখ্যা ১০১ জন।[৮] ধারণা করি, মতুয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যে এক সঙ্গে এত সংখ্যক কবিয়ালের আবির্ভাব যেন বিধিনিয়ন্ত্রিত। তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণির কবি আছেন, যাঁরা এ তালিকাভুক্ত নন, তবে অনেক গানের রচয়িতা। তাঁদের গান কবিয়ালরা আসরে পরিবেশনও করেন। এরকম কবিদের মধ্যে লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস (১৯০০-৭২) অন্যতম। বহুমাত্রিক গান রচয়িতা হিসেবে তাঁর বিখ্যাতি আছে। তিনি মতুয়া ধারার ২৩টি গানের রচয়িতা। এ প্রবন্ধে এ ধারার গানের রচয়িতা হিসেবে প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের পরিচিতি, মতুয়াসংগীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করা সহ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

মতুয়া ধর্মের উদ্ভব প্রসঙ্গ

'মতুয়া' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা কথা প্রচলিত আছে। সাধারণ অর্থে কোনো বিষয়ে নিষ্ঠা, আগ্রহ বা মত্ততাকে মতুয়া বলা যেতে পারে। সে অর্থে জগতের সবাই যেন মতুয়া। কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মানুষকে যখন 'মতুয়া' বলা হবে, বিশেষ করে যাঁরা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতানুসারী, তখন বিষয়টিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। সাধারণভাবে 'মত্ত' শব্দ থেকে 'মতুয়া' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হলেও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৬-১৮৮৬) মাত্রাতিরিক্ত মত্ততার কু-কফল বোঝাতে 'মতুয়ার বুদ্ধি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর ব্যাখ্যায় মতুয়া হলো মতান্ধ– ডগম্যাটিক।[৯] এর বেশি নয়। তবে শব্দটির ভাবগত ব্যাখ্যা নানাভাবে এ ধর্মমতে প্রযুক্ত

হয়েছে। শব্দটি যে ব্যক্তিপ্রেমে মাতোয়ারা না বুঝিয়ে শক্তি ও বীর্যের সাধনায় মত্ততা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে অনেকে এক মত। বিশিষ্ট গবেষক ড. নন্দদুলাল মোহান্ত মতুয়া শব্দটি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, মতুয়া আমার ও তাঁর (ঈশ্বরের) মধ্যে এক বিশেষ সম্বন্ধে যুক্ত। 'ম' অর্থে আমার আর 'তুয়া' কথাটির সারবস্তু হলো তাঁকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে। বিশদ করে বলা যায় 'ম' অক্ষর দ্বারা আপন সত্ত্বাকে আর 'তুয়া' অর্থ দ্বারা আমি ছাড়া সমভাবাপন্ন সমগ্র মানব জাতির নির্দেশক ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে।[১০] এ প্রসঙ্গে 'মতুয়া ধর্মের অভিনবত্ব ও দুর্বলতার সন্ধান' প্রবন্ধে শ্রীঅমর বিশ্বাসের মন্তব্য শোনা যেতে পারে।

> মতুয়া নামকরণের সঠিক ইতিহাস নিয়ে মতান্তর আছে, তবে অনেকে বলেন নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী একটি ধর্মমত প্রবর্তনের কারণে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ও তাঁর ভক্তদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে বর্ণহিন্দুরা নানা রকম বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করে, তাদেরকে সামাজিকভাবে একঘরে করে দেয় এবং নানাভাবে হেনস্তা ও অপমান করতে থাকে।
>
> ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে হরিভক্তদের তারা "হরিবোলা," "মতো" বলতে শুরু করে। আর ঐ 'মতো' নাম থেকেই শেষে হরিভক্তরা 'মতুয়া' নামে আখ্যায়িত হয়। কেউ কেউ আবার বলেন 'মত্ত' শব্দ থেকে মতুয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে।
>
> 'মত' অর্থে এখানে মতবাদ, আর মতুয়া ধর্ম একটি আলাদা 'মত' বা 'মতবাদ' তো বটেই। শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত 'মত' বা মতবাদ গ্রহণ করে যাঁরা প্রেম-ভক্তিরসে মেতে আছেন বা মাতোয়ারা তারাই মতুয়া।[১১]

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় 'মতুয়া' বলতে বুঝিয়েছেন :

> শক্তি ভক্তি প্রেমেতে মত্ত হরিভাবে ভাবময়
> হরি গুরুচাঁদ পথের পাথেয় তাঁরাই মতুয়া হয়।[১২]

শ্রীসন্তোষকুমার বারুই মনে করেন, যিনি হরি নামে মাতোয়ারা, তিনিই মতুয়া।[১৩] তিনি শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

> হরিধ্যান হরিজ্ঞান হরিনাম সার।
> হরিপ্রেমে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যাঁর।

বস্তুত, মতুয়া বলতে মত্ততা বোঝালেও, একটি বিশেষ মতে আস্থা, বিশ্বাস এবং প্রেমকেই বোঝায়। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে মত্ত হওয়া অর্থাৎ তাঁদের ধর্মমত ও জাগরণ মূলক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও এক প্রকার মত্ততা। তবে সব মত্ততা উন্মত্ত, পাগল ও খেপা নয়, এর মধ্যে আত্মহারা, আসক্ত ও কোনো বিষয়ে অনুরক্তিও বোঝায়।[১৪] আবার, অত্যন্ত আসক্ত বা নিবিষ্ট হওয়াও বোঝায়।[১৫] সুতরাং বলা যেতে পারে, এ মত্ততা ভাববিহ্বলতার মত্ততা, এ মত্ততা সংহতির মত্ততা, এ মত্ততা হরিসংগীত ও সাধনার মত্ততা, এ মত্ততা সংঘশক্তির মত্ততা ও এ মতে বিশেষভাবে নিবিষ্ট হওয়াকেই বোঝায়।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর জীবনের একটি বিশেষ পর্বে রাউৎখামার গ্রামে অবস্থান করেন। সেখানে অনেক মানুষকে রোগমুক্ত করা সহ প্রেমধর্মে আবিষ্ট করেন। অতি মানবীয় গুণাবলীর জন্যে হরিচাঁদ হয়ে ওঠেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রাণের স্পন্দন– মুক্তির সোপান, 'পতিতপাবন' ঠাকুর। গৃহী মানুষের কথা ভেবে প্রবর্তন করেন সমকালীন ব্রাহ্মধর্ম ও আর্যসমাজ থেকে স্বতন্ত্র একটি ধর্মমত 'মতুয়া ধর্ম'। এ ধর্মমতে মোক্ষ, মুক্তি বা পরলোক প্রসঙ্গ নেই, আছে নামের মধ্যে পরমানন্দ লাভের চেষ্ট। জাত-পাত, গুরুবাদ ও দীক্ষা প্রথা পরিহার করে অকামনা প্রেম-ভক্তির সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত এ ধর্মমত যাজযজ্ঞ ও বলিপ্রথা বিরোধী। এ মতে গার্হস্থ্য ধর্মে 'এক নারী ব্রহ্মচারী' আচরণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[১৬] শাস্ত্রীয় ধর্মের আচার-প্রথাকে পরিহার করে হরিচাঁদ ঠাকুর আর্ত ভক্তদের রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে যেভাবে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটিয়েছেন তা সনাতন ধর্মের একটি সরলীকরণ রূপ হলেও, এটিই ছিলো জাগরণের অন্যতম মৌল। সনাতন ধর্মমতের ছত্রছায়ায় 'মতুয়া' ধর্ম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ধর্মমত, নাকি বিচ্ছিন্ন মতবাদ সেটিও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সৎসংঘ, কর্তাভজা, সত্যধর্ম, বলাহারি, সাহেবধনী প্রভৃতি ধর্মমতকে যদি সনাতন ধর্মের বৃহত্তর বলয়ের এক একটি উপধর্ম বা গৌণধর্ম, কিংবা লোকধর্ম বলা হয়, তাহলে, বোধ করি, মতুয়াধর্মকে লোকধর্ম বলতে আপত্তি উঠবে না। লোকধর্মের জীবনাচরণ তো কোনোক্রমেই সনাতন হিন্দুধর্মের পরিপন্থী নয়। আর সমাজতাত্ত্বিক পরম্পরায় বিচার করলে দেখা যায়, প্রাচীন কৌমজনেরা ছিলেন ঋগ্বেদের পুরাতন অংশে বর্ণিত 'ঋত'-এর অনুসারী।[১৭] এর সঙ্গে মিশে আছে বাংলার কৌম সমাজের চৈতন্য। সে সুবাদে মতুয়া ধর্মও হবে লোকায়ত ধর্ম। কেননা, 'ঋগ্বেদের মূল ঐতিহ্য লোক ঐতিহ্য বলেই বাঙালি লোকসমাজ তার স্বাভাবিক অংশীদার'[১৮] হিসেবে সেই ঐতিহ্যের ধারক, এবং টিকে আছ লোকসংস্কৃতির মধ্যে। সে রকম কথাই বলা হয়েছে *Encyclopedia of Folklore and Literature* গ্রন্থে।[১৯] আর লোকধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মার্কিন ফোকলোরবিদ Don Yoder' সে রকমই বলেন।[২০]

শাস্ত্রীয় ধর্ম ও লোক ধর্মের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। শাস্ত্রীয় ধর্ম ভাববাদাশ্রিত, ঈশ্বর ও পরকাল তথা স্বর্গ-নরক, পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কারে বিশ্বাসী। পরন্তু, লোকধর্মের অনুসারীরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও শাস্ত্রবিরোধী।[২১] আর, হরিচাঁদ ঠাকুর প্রচলিত ধর্মসাধন পদ্ধতিকে পরিহার করে যে ধর্মসাধনার কথা বলেন তা হাতে কাজ আর মুখে নামের মধ্যে প্রসারিত হয়ে আছে।[২২] মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমার লেখক গবেষক বিরাট বৈরাগ্য, লোকায়ত ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে গানের তথা মতুয়া পদগীতির প্রাসঙ্গিকতা বলতে গিয়ে এ ধর্মমতকে লোকধর্ম বলে উল্লেখ করেন।[২৩] এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল ওয়াহাবের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য।

> লোকধর্মের মধ্যে থাকে স্বচ্ছ মানবতাবোধ, প্রেম, মৈত্রী, ভালোবাসা। স্বার্থপরতা বা হিংসা-দ্বেষের কোনো স্থান নেই এখানে। ... অর্থাৎ ধর্মের নামে কুহক, শাস্ত্রের নামে পুরোহিততন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র, উপাসনার নামে মন্দির মসজিদকে বড় করে তোলা, ঈশ্বরের নামে মূর্তিগঠন এসব লৌকিক সাধকের মনে ধরে নি। ধর্মের ছলে নানা বাহ্য বিষয় থেকে নিষ্ক্রমণের একটা পথ তারা সৃষ্টি করেছিলেন লোকধর্মকে আশ্রয় করে। লোকধর্মের উপাস্য মানুষ। এ ধর্মের অনীহা বা বিরাগ বেদে, কোরআনে, মন্দিরে, মসজিদে, অপদেবতার বন্দনায়, মূর্তিপূজায় ও অলৌকিকে।[২৪]

এদিক থেকে বলা যায়, মতুয়া ধর্ম শাস্ত্রশাসিত সনাতন ধর্মের একটি প্রতিবাদী ও শাস্ত্রবিরোধী ধর্মমত হিসেবে অন্যতম লোকধর্ম। প্রাথমিক পর্যায়ে অলৌকিকভাবে শারীরিক অসুখ নিরাময়কারী হিসেবে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের উজ্জীবন হলেও ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেন এক মূর্ত বিগ্রহ। তিনি ওড়াকান্দি, রাউৎখামার, মোল্লাকান্দি প্রভৃতি গ্রামে মত্ত অবস্থায় যেভাবে হরিকীর্তন করতেন তা দেখে অনেক ভক্ত বুঝে হোক, বা না বুঝে হোক, তাঁকে 'হরিবোলা' বা 'মতুয়া' কিংবা 'মতো' বলে হয়তো তাচ্ছিল্য, উপহাস বা নিন্দা, কিংবা হয়তো নিন্দার ছলে প্রশংসাও করতো। এভাবেই যে শব্দটির উদ্ভব সে প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে বলা হয়েছে :

হরি বোলা দেখে উপহাস করে কত।
সবে বলে ও বেটারা হরিবোলা ম'তো ॥
কেহ বলে জাতিনাশা সকল মতুয়া।
দেশ ভরি শব্দ হ'ল মতুয়া মতুয়া ॥
অন্য কেউ যদি হয় হরি নামে রত।
সবে করে উপহাস অই বেটা ম'তো ॥
অন্য অন্য গ্রাম আড়োকাঁদি, ওঢ়াকাঁদি।
সে হইতে হয়ে গেল 'মতুয়া' উপাধি ॥[২৫]

মতুয়া ধর্মের উদ্ভবের পেছনে ধর্মীয় তত্ত্বের চেয়ে বঞ্চনার ইতিহাসই প্রকট। উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্গের মানুষের ওপর চিরকাল বৈষম্য, বঞ্চনা ও নির্যাতন চালিয়ে আসেনি শুধু, সমাজে সৃষ্টি করেছিলো জল অচল, অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক থেকে জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টায় হরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তন করেন নতুন ধর্মমত, যেখানে বেদবিধি, তন্ত্রমন্ত্র, শৌচাশৌচের প্রতি নেই আস্থা, নেই বৈদিক যাগযজ্ঞ, সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থের মতো বিষয়। এমনকি, তীর্থ ভ্রমণে পুণ্যলাভের বিষয়টি পরিহার করে নিষ্ঠার সঙ্গে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনই এ ধর্মের মূল বিষয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া আন্দোলনের মাধ্যমে নমঃশূদ্র তথা অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়ার ব্রত নিয়েছিলেন। তিনি বিভেদ-সৃষ্টিকারী ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

প্রফুল্লরঞ্জন পরিচিতি

এ ধর্মমতের ছত্রছায়ায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা নানাভাবে নানা কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন– কেউ কবিগানে, কেউ অষ্টক গানে, কেউ মতুয়া সংগীতে, কেউ বা কীর্তন গানে। আর এক শ্রেণির রচয়িতা আছেন যাঁরা কবিগান না গাইলেও কবিগান নিরপেক্ষ ধুয়া গান রচনায় সিদ্ধহস্ত। এই শেষোক্ত ধারায় যাঁরা যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস অন্যতম। মতুয়াধর্মের প্রধান পুরুষকার ও পার্ষদদের নিয়ে গান রচনা করে এ জনগোষ্ঠীর ভাবের দিকটি সমৃদ্ধ করে দিলেও তিনি থেকে গেছেন লোক চক্ষুর আড়ালে। জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার ছোটকালিয়া গ্রামে এক অখ্যাত নমঃশূদ্র পরিবারে। তাঁর পিতার নাম গগনচন্দ্র

বিশ্বাস, মা লক্ষ্মীরাণী দেবী। খুব অভাবের সংসারে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে কিছুদিন লেখা-পড়া করেন। অভাবের জন্যে লেখা-পড়া অসমাপ্ত রেখে তিনি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। কখনও প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক হিসেবে, কখনও প্রধান পণ্ডিত হিসেবে তিনি প্রায় দশটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতা করার পাশাপাশি তাঁর নেশা ছিলো গান রচনা। এভাবে তিনি বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা হিসেবে বৃহত্তর যশোর, খুলনা, বরিশাল, বৃহত্তর ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কবিয়াল বিজয় সরকার (১৯০২-১৯৮৫)-এর গানে

প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বিশাল ভাণ্ডারের শ্রেণিকরণের আভাস পাওয়া গেলেও, মতুয়া সংগীতের প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত। তাঁর মৃত্যুর পরে শোকাহত বিজয় এ গানটিতে বলেন :

ভাব ভাটিয়াল তত্ত্ব আধ্যাত্মিক/ তামসিক আর রাজসিক সাত্ত্বিক
বিরহ বিচ্ছেদ গীতি আরও সামাজিক / আমরা শুনে তার রচিত কমিক
হাসির মঞ্চে আছাড় খাই।[২৬]

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের মতুয়াধর্মবিষয়ক গান মতুয়া ধর্মের জন্যে শ্লাঘনীয় হলেও, বিশেষ অর্থে তা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন। এ গান তিনি অন্তর্গত প্রেরণা অর্থাৎ ভক্তিভাবের উৎসারণ থেকে যেমন রচনা করেছেন, তেমনি মতুয়াধর্মের প্রতি অনুরাগ বশত হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, তারকচাঁদ, অশ্বিনী, শ্রীপতিচাঁদ, শান্তিদেবী, রামকান্ত ঠাকুর, গোলক গোঁসাই, লোচন গোঁসাই, হীরামন, দশরথ, মৃত্যুঞ্জয়, মহানন্দ, রসরাজ, সুধন্যচাঁদ, ব্যারিস্টার পি.আর ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তির প্রতি জানিয়েছেন তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। ৩১/১/১৩৫৪ তারিখে রচিত গানে তিনি এ অবতার ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মনিবেদন করেন :

ভজ ভজ মন শ্রীযশোমন্তের নন্দন।
ভজ হরিপ্রিয়া শান্তিদেবী মাধুর্যে যার পদ্মাসন ॥
ভজ রামকান্ত ঠাকুর, হারে হারে যাহার চরিত্র মধুর
যাহার বরেতে এলেন শ্রীহরি ঠাকুর
যার নিষ্ঠার জন্য ভোগের অন্ন / বাসুদেব করতেন ভোজন ॥
ভজ শ্রীহরি নন্দন হারে হারে ধন্য গুরুচাঁদ রতন
শৈব অংশে জনম যিনি করিলেন ধারণ।
যার আজানু লম্বিত বাহু / বাক্যে সুধা বরিষণ ॥
ভজ শ্রীগোলক গোঁসাই হারে হারে লোচন হীরামন দু'ভাই
দশরথ মৃত্যুঞ্জয়, যাদের তুল্য কেহ নাই।
ভজ মহানন্দ প্রেমানন্দ / রসরাজের শ্রীচরণ ॥
ভজ শ্রীসুধন্যচাঁদ হারে হারে যার পাণ্ডিত্য অগাধ

যাহার ঔরসে জন্মে শ্রীশ্রীপতিচাঁদ।
ভজ ব্যাস্টার পি,আর, ঠাকুরচাঁদ / শশীচাঁদের পুত্রধন ॥
যত যত অবতার হারে হারে আছে জগতে প্রচার
ধন্য কলি যুগে শ্রেষ্ঠ হরিচাঁদ আমার।
এবার প্রফুল্ল কয় সবাকার পায় / করি আত্ম নিবেদন ॥

এ গানে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের বংশের অবতার পুরুষ ছাড়া বাইরের, অথচ মতুয়া ধর্মান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের তিনি তৃতীয় অন্তরায় আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস একজন বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা। এ কারণে তিনি কোন ঘরানার গীতিকার তা নির্ণয় করা একটি জটিল কাজ। আর, ব্যক্তি কবিকে তো গানে বা কবিতার মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। তাই প্রায় ২৫ প্রকার গানের মধ্যে সঠিক অর্থে তিনি কোন মতের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন, তা নির্ণয় করা কষ্টকর। ঠিক সে কারণে তাঁর 'মতুয়া' অভিধা প্রতিপাদন সাপেক্ষে একজন মতুয়াসংগীত রচয়িতা হিসেবে প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের আগে ও পরের গীতিকারদের সংখ্যাভিত্তিক স্থান, মতুয়াসংগীত রচয়িতা হিসেবে তাঁর অবস্থান, মতুয়ামেলা ও মতুয়াসংগীতের সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

এ প্রবন্ধটির গবেষণা পদ্ধতিতে যুগপৎ সাহিত্য, ইতিহাস, সংগীত ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনার সাহায্যে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসমূল হিসেবে মতুয়াসংগীতকে প্রাধান্য দেয়া হলেও, কবিকে মতুয়া বলা যাবে কিনা এ সম্পর্কীত তথ্য সংগ্রহের জন্যে সাক্ষাৎকার, কবির কাছের মানুষের স্মৃতিকথা ও ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্যে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

একজন কবি হিসেবে প্রফুল্লরঞ্জনের গান বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবদ্দশায় প্রথমবার কবি নিজেই *পল্লীগীতি কবি প্রফুল্লরঞ্জনের শারদীয়া পূজা অবদান* নামে এক ফর্মার বই প্রকাশ করেন।[২৭] দ্বিতীয় সংকলনটি *প্রফুল্ল গীতিমালা* নামে প্রকাশিত হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া থেকে।[২৮] এ সংকলনে ২৬৯টি গানের মধ্যে প্রফুল্লরঞ্জনের ভণিতায় কবিয়াল বিজয় সরকারের একটি গান মুদ্রিত হয়। মজার বিষয় এই একই নামে, অবিকল একই রকম মুদ্রণ প্রমাদ সংবলিত একটি সংকলন ১৪০০ সালে বাংলাদেশের বাগেরহাটের ইউনাইটেড প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। প্রথম প্রকাশ আমাদের হাতে না থাকায় জানা যায়নি তখনও 'শ্রীধাম লক্ষ্মীখালী' ও উৎসর্গ হিসেবে 'শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের পাদপদ্মে' কথাগুলো যুক্ত ছিলো কি না। তবে পুনর্মুদ্রণে (ডিসেম্বর, ২০১৬) এ বিষয়গুলো বর্তমান।[২৯] দুটো সংকলনেই বিজয় সরকারের গানটি সংকলিত হয়েছে।[৩০] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের

বাংলার বাউল ও বাউল গান গ্রন্থে 'বীরভূম জেলা হইতে সংগৃহীত' গান হিসেবে প্রফুল্লরঞ্জনের একটি গান প্রকাশিত হয়।[৩১] প্রফুল্লরঞ্জনের অনেক গান কালিয়া থানার পার্শ্ববর্তী জেলা ফরিদপুরেও যে খুব বেশি পরিবেশিত হতো তা বিধৃত হয়েছে পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) *স্মৃতিরপট* গ্রন্থে।[৩২]

কবি ও লোক গবেষক মহসিন হোসাইনের বৃহত্তর *যশোরের লোককবি ও চারণকবি* গ্রন্থে প্রফুল্লরঞ্জনের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ চারটি গান প্রকাশিত হয়।[৩৩] এ জামান সম্পাদিত *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার* প্রথম খণ্ড প্রথম পর্ব গ্রন্থে ১. মনের ভাব যে জনা বোঝেরে, ০২. দিনের শেষে বেহাল বেশে, ০৩. তোমার আসা-যাওয়ার পথের ধারে, ০৪. নদের চাঁদ কামাখ্যায় গেল, ০৫. তুই উড়ে যারে সোনার ময়না পাকিস্তানে যা দেখে আয়, ০৬. অনেক কষ্ট পেয়ে এলাম ইন্ডিয়ায়, ০৭. ঐ যে রূপসা নদীর দীঘল, ০৮. নাইতে আস সোনার কন্যা, ০৯. বিজ্ঞানী রকেট আরোহণে ও ১০. ওগো মা জননী, শোন আজ গানগুলো অনবধান বশত দুইবার ছাপা হয়েছে।[৩৪] একই ব্যক্তির সম্পাদনায় দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডে নিতাইদাস বিশ্বাসের রচিত জীবনী এবং দ্বিতীয় খণ্ডে পাঁচটি গান প্রকাশিত হয়েছে।[৩৫] এছাড়া, এ জামান সম্পাদিত *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার* গ্রন্থে পূর্বোক্ত গানের মধ্য থেকে ১, ২, ৩, ৮ ও ১০ সংখ্যক গান মুদ্রিত হলেও এ জামানের *সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে যশোরের স্পর্শ* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে প্রফুল্লরঞ্জনের জীবনী;[৩৬] আর, মহসিন হোসাইনের *নড়াইল জেলা সমীক্ষা ও স্থাননাম* গ্রন্থে দুটো বিচ্ছেদ ও একটি মুর্শিদি গান।[৩৭] দুলাল রায়ের *কালীগঙ্গা থেকে কালিয়া* উপন্যাসে একটি গান;[৩৮] *লোককবি প্রফুল্ল গোঁসাই*-এর গান শিরোনামে মিজানুর রহমান প্রকাশ করেন ৩০০টি গানের সংকলন।[৩৯] এছাড়া, সুরঞ্জন রায়ের *কালিয়া জনপদের ইতিহাস* গ্রন্থে,[৪০] আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গানের উপর একটি নিবন্ধে[৪১] এবং বিজয় ও প্রফুল্লকে নিয়ে একটি প্রবন্ধসহ[৪২] *কালিঙ্গা* পত্রিকায় একটি গান প্রকাশিত হয়েছে।[৪৩]

বিশ্লেষণ

মতুয়া সংগীতে প্রফুল্লরঞ্জনের অবস্থান

১৯০০ সালে যখন প্রফুল্লরঞ্জনের জন্ম হয়, তখন গুরুচাঁদ ঠাকুরের বয়স চুয়ান্ন বছর। এরপর তিনি বেঁচে ছিলেন প্রায় তেতাল্লিশ বছর। প্রফুল্লরঞ্জন তাঁকে যখন একাধিক গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তখন গুরুচাঁদের বয়স ছিলো ৮৪। আর হরিচাঁদকে নিয়ে গান রচনার সময় (অর্থাৎ ১৮/১১/১৩৭৫ ও ৩/৬/১৩৭৬) গুরুচাঁদ ইহলোক ত্যাগ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর প্রায় ৯০/৯১ বছর পরে প্রফুল্লরঞ্জন তাঁর উদ্দেশে গান রচনা করেন। প্রফুল্লরঞ্জনের জন্মের উনিশ বছর আগে গুরুচাঁদ ঠাকুর ১৮৮১ সালে দত্তডাঙ্গা গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র গাইনের বাড়িতে জনসভা করেন। ১৯৩২ সালে খুলনায় নিখিলবঙ্গ সম্মেলনের সময় প্রফুল্লরঞ্জনের বয়স ছিলো বত্রিশ বছর। এ অনুষ্ঠানে প্রফুল্লরঞ্জন হয়তো গুরুচাঁদ ঠাকুরকে দেখে থাকবেন, অথবা তাঁর সাক্ষাৎও পেয়ে থাকবেন। কেননা, তখন তিনি ছিলেন খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার বয়ারভাঙ্গা বিশ্বম্ভর মল্লিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক।[৪৪] তবে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উদ্দেশে ভক্তি মিশ্রিত

তিনটি গান রচনা করেন (১৪/৪/১৩৩৮, ২২/৪/১৩৩৮ ও ১৯/৭/১৩৩৮ তারিখে) খুলনার সম্মেলনে যোগদানের এক বছর আগে। আর চতুর্থ গানটি রচনা করেন (১৯/১০/১৩৫২ তারিখে) তাঁর মৃত্যুর তিন বছরের মাথায়। তবে মতুয়া মেলা বিষয়ে গান লেখেন ২২/৪/১৩৩৬ তারিখে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের দিকে। তিনি কখনও ওড়াকান্দীর মেলায় গিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে এ বিষয়ক গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অনুরক্তি ছিলো। এ অনুরক্তির প্রধান কারণ হিসেবে জয়পুরের কবি রসরাজ তারক সরকারের প্রভাবের কথা বলা হয়। কিন্তু মতুয়া সংগীত শুধু নয়, তাঁর অন্যান্য গান রচনার ক্ষেত্রে রসরাজের কোনো প্রভাব ছিলো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।[৪৫] যদিও ড. স্বরোচিষ সরকার প্রফুল্লরঞ্জনকে তারক সরকারের ভাবশিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৬] তারক সরকারের উদ্দেশে প্রফুল্লরঞ্জনের রচিত পাঁচটি গানের মধ্যে মতুয়া সংগীত হিসেবে ননী গোপাল দাসের গ্রন্থ থেকে একটি গানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন মতুয়া বিশেষজ্ঞ ড. বিরাট বৈরাগ্য।[৪৭] এ গ্রন্থে ননী গোপাল প্রফুল্লরঞ্জনকে 'টোনার কবি' বলে যে ভুল করেছেন[৪৮] ড. বৈরাগ্য ননী গোপাল দাসকে অনুসরণ করে সেই একই ভুল করে প্রফুল্লরঞ্জনের গ্রাম একবার টোনা (পৃষ্ঠা ১৫৬), একবার (১৭৮ পৃষ্ঠায়) 'কালিয়া থানার অধীন ছোট কালিয়া' গ্রাম বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।[৪৯] মনে হয় দুই প্রফুল্লর অভিন্নতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন। এ গানগুলো লোকধারার হলেও প্রফুল্লরঞ্জনের গানে তারকচন্দ্রের প্রভাব তো নেই, অনুরূপভাবে প্রভাব নেই রূপচাঁদ গোঁসাইয়ের (১৮৬৫-১৯৩১), কবিয়াল হরিবর সরকারের ও কবি অশ্বিনীকুমার সরকারের (১৮৭৭-১৯২৭) রচিত মতুয়া সংগীতের। তবে এ সময়ের মতুয়া সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে শ্যামচাঁদ পাণ্ডে (১৮৮৬-১৯৪৪) রচিত 'পাখি' বিষয়ক একটি গানের সঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জনের ও বিজয় সরকারের গানের কিছুটা ভাবগত সাদৃশ্য আছে।[৫০] তবে বেশি সাদৃশ্য আছে লালন শাহের গানের।[৫১]

এ সকল মতুয়া পদকর্তাদের মধ্যে রূপচাঁদ, হরিবর, অশ্বিনীকুমার প্রসঙ্গ *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* ও *শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া, আরও অনেক গবেষণা গ্রন্থে মতুয়া পদকর্তা প্রসঙ্গ উল্লিখিত হলেও, কালিয়া জনপদের পল্লিকবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের মতুয়া বিষয়ক গানের কথা আদৌ উল্লিখিত হয়নি। ড. বৈরাগ্য তাঁর *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা* গ্রন্থে প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বিভিন্ন শ্রেণি ও মতুয়া ধর্মাদর্শ সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ :

> তিনি ছিলেন চিরকুমার ব্রহ্মচারী, মতুয়া ভক্ত ও মতুয়া ধর্ম প্রচারক। ... তিনি বিচিত্র ভাবের সঙ্গীত রচনা করেছেন। একদিকে শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদের মাহাত্ম্য, মতুয়া ধর্মাদর্শ ও সাধনতত্ত্ব এবং অন্যদিকে সমকালীন জীবন-বাস্তবতা, সর্ববিষয়ে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর সংগীতগুলি এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। জানা যায় তিনি পাঁচ হাজারের বেশী গান রচনা করেছেন।[৫২]

প্রফুল্লরঞ্জনের গান প্রথম মুদ্রিত হয় ঠাকুরনগর থেকে প্রকাশিত *মতুয়াসঙ্গীত* ও *শ্রীগোবিন্দ সঙ্গীত* সংকলন গ্রন্থে।[৫৩] ড. বৈরাগ্য সে রকমই মন্তব্য করেন। কিন্তু কোন সালে ও কোন বিষয়ের কয়টি গান প্রকাশিত হয়েছিলো সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলেননি। ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ি থেকে কবি অশ্বিনী গোঁসাই

রচিত *শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত* গ্রন্থে ১০৮টি গান প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থটি *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* প্রকাশের আগে, অর্থাৎ ১৩২৩ সালের [১৯১৭ খ্রি.] আগে প্রকাশিত হলেও এটি ছিলো মতুয়া সাহিত্যের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ রসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের *শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন*। গ্রন্থটি ১৩০৭ সালে [১৯০০ খ্রি.] প্রকাশিত হয়।[৫৪] *শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত* গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে গানের সংখ্যা ছিলো ১৫৫টি। বর্তমান সংস্করণে প্রফুল্লরঞ্জনের গানের ক্রমিক সংখ্যা ১৭৩। তাঁর গানটি ঠিক কোন সংস্করণ থেকে *শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিলো তা জানা যায় না। যে গানটি এ গ্রন্থে মতুয়া সংগীত হিসেবে সংকলিত হয়েছে, সেটি শুরুতে অর্থাৎ ১৯/৭/১৩৩৮ তারিখে রচনার সময় 'গুরুচাঁদ' শব্দটি ছিলো না। ছিলো 'গুরুধন'কে নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা। গানটির প্রথম পঙ্‌ক্তি 'তোমার চরণতলে গুরুধন রাখ আজ আমারে।' মতুয়া সংগীত হয়ে ওঠায় 'গুরুধন' শব্দটি বদল করে 'গুরুচাঁদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাজটি কবিকৃত না অন্য কারো সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। গানটির আদি ও অকৃত্রিম রূপটি জানার উদ্দেশ্যে কবির হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

তোমার চরণতলে গুরুধন রাখ আজ আমারে।
আমায় ফিরায়ো না কাঙ্গাল বলে ভাসায়ো না সায়ারে ॥
নাম শুনেছি করুণাময় অনাথ জনার আশ্রয়,
তাই জেনে বিপুল ভরসায়, এলেম তোমার দুয়ারে ॥
চাই না গো মান চাই না মানিক, চাই না বিষয় বিত্ত খানিক,
আমি জন্মাবধি পথের পথিক ব্যথী হারা সংসারে ॥
কালো মেঘের বারির আশায়, চাতক যেমন মেঘ পানে চায়,
তোমার শীতল ছায়া পাবার আশায় চেয়ে আছি কাতরে ॥
প্রফুল্ল কয় দিবানিশি থাকব চরণ ছায়ে বসি
কভু চোখের জলে মিশিয়ে হাসি দিব তোমায় আদরে ॥

শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত গ্রন্থে এ গানটির অন্তরাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া, কিছু শব্দের পরিবর্তনও করা হয়েছে। যেমন, রাখ=রেখ, ফিরায়ো না=ফিরাইওনা, ভাসায়োনা=ভাসাইওনা, সায়ারে=সাগরে, অনাথ=অধম, জনার=জনারই, মানিক=মানী, বিত্তখানিক=বিত্তখানি, ব্যথী=ব্যথিত, বারির=বারি, ছায়ে=ছায়ায় প্রভৃতি। মূল গান থেকে 'তোমার,' 'আমায়,' 'কভু' বাদ গিয়ে যোগ হয়েছে 'আমি' সর্বনাম পদটি। এই সংগীতে কবি যে ভাষায় আত্মনিবেদন করেছেন মতুয়াসংগীতের জগতে তাঁর সমান্তরাল গান খুব কমই দেখা যায়। তিনি মতুয়াসংগীতের অন্যতম রচয়িতা হিসেবে প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা সত্যি দুর্লভ। ড. বৈরাগ্য তাঁর গানের সংখ্যা পাঁচ হাজার বলে উল্লেখ করলেও আমরা ক্ষেত্রানুসন্ধান ও প্রফুল্লরঞ্জনের উত্তর পুরুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রায় এক হাজার গান সংগ্রহ করতে পেরেছি।

প্রফুল্লরঞ্জনের মতুয়া সংগীতে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ

মতুয়াসংগীতের কেন্দ্রভূমিতে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ থাকলেও এ মতের অন্যান্যদের নিয়েও বিবর্ধিত হয়েছে মতুয়া সাহিত্য। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবকে (১৪৮৫-১৫৩৩) নিয়ে যেমন জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিলো, তেমনি করে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে নিয়ে রচিত হয়েছে জীবনী সাহিত্য। শুধু জীবনী সাহিত্য নয়, মতুয়া সংগীত, ভক্তিগীতি, অষ্টকগান, কবিগান ও যাত্রাপালার উৎস ভূমিতেও আছে তাঁদের অবস্থান। শুধু হরিচাঁদকে নিয়ে রচিত জীবনী গ্রন্থের মধ্যে : ১. *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* (১৩২৩), ২. *শ্রীশ্রীহরিঠাকুর* (অপ্রকাশিত), ৩. *শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর* (১৩৫০), ৪. *পরম পুরুষ হরিচাঁদ* (১ম ও ২য় খণ্ড), ৫. *ছোটদের হরিচাঁদ* (১৩৯৬), ৬. *যুগাবতার শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর* প্রভৃতি। আর, গুরুচাঁদকে নিয়ে রচিত জীবনী সাহিত্য : ১. *শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত* (১৩৫০), ২. *যুগনায়ক গুরুচাঁদ* (১৩৮২), ৩. *শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ* (১৩৮৭) প্রভৃতি। হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদকে নিয়ে রচিত হয়েছে *শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ চরিত সুধা* (১৩৫১)। ইংরেজি ভাষায় হরিচাঁদের জীবনী রচনা করেন প্রফেসর পি.এল.দাস, শ্রীভগবানচন্দ্র বিশ্বাস (অনুবাদ) ও কলকাতা হাইকোর্টের উকিল নিরোদবিহারী রায়। যথাক্রমে তাঁদের গ্রন্থগুলোর নাম : ১. *Sri Sri Harichand Thakur- Suprem Deity (1980),* ২. *Sri Sri Hari Thakur (1983) Translated,* ৩. *Sri Sri Harichand Thakur of Orakandi- An Analitical Study (1980)*। এ ছাড়া, মতুয়া ভক্ত-সাধকদের মধ্যে রচিত হয়েছে ১. কবি রসরাজ তারক সরকার, ২. গোপাল সাধু, ৩. গোলক পাগল, ৪. বিপিনচন্দ্র গোস্বামী, ৫. অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, ৬. তিনকড়ি মিঞা, ৭. রামতনু বিশ্বাস, ৮. মহানন্দ হালদার, ৯. বিধুভূষণ বিশ্বাস ও ১০. নারায়ণচন্দ্র মৈত্র প্রমুখের নিয়ে জীবনী গ্রন্থ।[৫৫]

কবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস হরিচাঁদকে নিয়ে তিনটি গান রচনা করেন। এ গানের প্রথমটিতে হরিচাঁদ প্রেমধর্মের অবতার হিসেবে পাপী-তাপী সবার মধ্যে যে প্রেম বিতরণ করেছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন উঁচু নিচু সব জাতের মানুষকে, মূলত সে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আসলে প্রেমের ধর্মই তো তাই। তিনি বিশ্ব হিতের জন্যে নিঃস্ব মানুষের দোরগড়ায় নেমে এসেছেন। বংশ ও কুলের গৌরবে যারা ছিলো অহংকারী, তারা তাঁর আবির্ভাবে এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। বলা যায়, অবতার হিসেবে হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মকাণ্ডের প্রশস্তি যেন এ গানটি। গানটি রচিত হয়েছিলো ৩/৬/১৩৭৬ তারিখে প্রফুল্লরঞ্জনের জীবনের শেষ দিকে।

এসেছে কাঙ্গালের হরি ওড়াকান্দী গাঁয়
সাথে প্রেম এনেছে আজি দিতে সব জনায়।
তোরা দুঃখী তাপী সবাই পাবি আয়রে ছুটে আয় ॥
অধর্মকে দমন করে ধর্মের মান রাখিতে
যুগে যুগে আসে প্রভু ধূলির ধরণীতে
প্রভু এবার এলো বিশ্বহিতে নিঃস্বের আঙ্গিনায় ॥ ...
কে করে কার জাতের বিচার কে ধনী কে মানী
এক বাজারে এসে সবার হচ্ছে জানা জানি।
এবার ঠাকুরের অমৃত বাণী শুনে প্রাণ জুড়ায় ॥

পরের গানটিতে হরিচাঁদের জন্মের বড় কারণ যে শুধু ধর্ম সমন্বয় নয়, ধর্ম সংস্থাপন করা ও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে জাত পাতের ব্যবধান দূর করে একটা বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করা, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি ওড়াকান্দিতে যে লীলা করেন তা যেন একটা 'গোলা' স্বরূপ; সেখানে পুণ্যার্থীরা স্নানের উদ্দেশে 'মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে' সমবেত হয়। গানটির রচনার তারিখ ১৮/১১/১৩৭৫।

শুভ মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে
আমার শ্রীহরিচাঁদ নেমে এলো ধরণীতে।
এবার প্রেমে মেখে নামধন আনলো প্রেমের মহাজন
সবারে সমানভাবে দানিতে ॥
বারুনী যোগ এলো পুণ্য প্রভায়
সেই যোগের সুযোগে প্রভু এলো ধরায়।
ঐ যে সুপ্রসন্ন গ্রহগণ বহে মধু সমীরণ,
ধরা ভাসে পুষ্প বৃষ্টিতে ॥
... ...
প্রফুল্ল কয় এই নিম্ন দেশে
একটা গোলা ফেলে গেলো লীলা শেষে
সেই গোলায় ডোবার তরে, ভক্ত নারী নরে
ছোটে শ্রীধাম ওড়াকান্দীতে ॥

ওড়াকান্দি গ্রামে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের আগমনের ফলে এ এলাকায় যেন প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিলো। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে ভাসিয়ে দিয়ে যুগের উপযোগী ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে ধরায় নেমে এসেছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন গার্হস্থ্য ধর্মের মহিমা, হরি নামের মাহাত্ম্য। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হরি নামের বন্যায় শান্তিপুর ও নদীয়া যেমন করে ভেসে গিয়েছিলো, ওড়াকান্দিও অনুরূপভাবে ভেসে গেছে।

সোনার মানুষ এলো পুষ্পবৃষ্টি হলো ওড়াকান্দি গাঁয়।
জগৎ ভাসলো প্রেম বন্যায়।
তোরা কে যাবি প্রাণ জুড়াবি আয় তার সুশীতল ধারায় ॥
যুগের উপযোগী ধর্ম করিতে প্রচার,
কতবার এসেছে ধরায় দয়াল অবতার
প্রভু এবার করতে পতিত উদ্ধার নেমে এসেছে ধূলায় ॥
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম প্রেমে সুশোভন,
অসংখ্য বন্ধনের মাঝে রয় হৃদিরঞ্জন

এবার জীবে পেল তার আস্বাদন হরিচাঁদের করুণায় ॥

... ...

হরি নামের ধ্বনি শুনে রিপুগণ পালায়

ডঙ্কা শুনে শঙ্কা পেয়ে শমন দূরে যায়,

প্রফুল্ল কয় প'ড়ে গোলায় কলি হাবু ডুবু খায় ॥

পূর্বোক্ত গানের মতো এ গানেও 'গোলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হরিনামে ওড়াকান্দি গ্রামে যে গোলা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে পড়ে কলি যুগ যেন হাবুডুবু খাচ্ছে।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের আন্দোলন নমঃশূদ্র জাতির জন্যে একটি শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। তিনি এ জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়, আর শিক্ষিত করার জন্যে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি এ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন বাগেরহাট মহকুমার মোল্লাহাট থানার দত্তডাঙ্গায় একটি জনসভা করেন। ১৯০৭ সালে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোককে রাজকার্যে নিয়োগের জন্যে তিনি ফরিদপুরে পূর্ববঙ্গের লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করে মানপত্র প্রদানসহ এ জাতির উন্নয়নে সহায়তা করার জন্যে অনুরোধ করেন।[৫৬] এ সুবাদে বলা যায় গুরুচাঁদ ছিলেন পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে জাগরণমন্ত্রে এগিয়ে নেবার পথিকৃৎ। এত সামাজিক কাজ করা সত্ত্বেও তিনি সমাজকর্মী না হয়ে, হয়ে উঠেছেন পতিতজনের উদ্ধারকারী 'যুগাবতার'। কবি প্রফুল্লরঞ্জন তাঁর চরণে নিজের প্রাণ সঁপে দেবার ও দাসখতে নাম লিখে দেবার প্রত্যাশায় যে আর্তি প্রকাশ করেছেন তা অনন্য।

আমার গুরুচাঁদের চরণে প্রাণ সঁপে দিব রে।

প্রাণ সঁপে দিব মন সঁপে দিব দাসখতে নাম লিখে দিব রে ॥

সুকোমল দেহখানি, পূর্ণ প্রেমের পরশ মণি

আমি পরশ করে পরশ মণি সোনা হয়ে যাব রে ॥

নাম নিতে যার ভাবাবেশে, নয়ন জলে বয়ান ভাসে,

কাজ কী আমার গৃহবাসে তার কাছে ছুটে যাব রে ॥

তৃষাতুরা হরিণীর প্রায় ঘুরব না আর মরীচিকায়

তার সুশীতল করুণা ধারায় আমার কালিমা ধুইব রে ॥

প্রফুল্ল কয় কারো মানায় ফিরব না আমি যাব সেথায়,

আমার মনের মানুষ সেই রসময় তারে মনের কথা কব রে ॥ (১৪/৪/১৩৩৮)

গুরুচাঁদকে কবি একজন অবতার পুরুষের মতো দেখেছেন। তাঁর অদর্শনে তিনি যে কতখানি কাতর হয়ে পড়েন সেটি এ গানটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

এসে কোন গুণে মোর গুরুচাঁদ মন হরে নিল রে।

মন হরে নিল ধন হরে নিল আমায় কাঙ্গাল করে দিল রে ॥

মোহন মুরতি সাজে এসেছিল স্বপন মাঝে
আমি না জাগিতে ত্বরিত সাজে, আন্ধারে মিশিল রে ॥
মণিহারা ফণিনীর প্রায়, প্রাণ বাঁচানো হল রে দায়
ইহার ওষুধ আমি পাব কোথায় যাতনা বাড়িল রে ॥ (২২/৪/১৩৩৮)

নিচেয় প্রদত্ত গানটিতে ভক্ত হৃদয়ের অসম্ভব আর্তি প্রকাশিত হয়েছে। পরশ পাথরের ছোঁয়ায় লোহা যেমন সোনা হয়ে যায়, তেমনি গুরুচাঁদের পদরেণুর স্পর্শে দেহটা সোনা হয়ে ওঠার জন্যে কবি প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি যেন 'পতিত পাবন' হিসেবে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন।

দয়াল গুরুচাঁদ পরানের ধন / তোমার শ্রীচরণে আজ করি এই নিবেদন
তোমার কৃপাসিন্ধু জলে প্রেম পরিমলে / ডুবায়ে দাও এ দেহ-মন ॥
তোমার ভক্তজন মাঝে লভিতে ঠাঁই / এমন যোগ্যতা আমার কিছুই নাই,
তোমার ভক্তপদ ধূলি যেন মাথায় তুলি / ধন্য মানি এই জীবন ॥ ...
প্রফুল্ল কয় এলে তুলে নিতে / পতিত জনে পারের তরণীতে
এবার আমার হেন পতিতে হবে ঠাঁই দানিতে / দয়াময় পতিত পাবন ॥

ওড়াকান্দিতে গুরুচাঁদের আবির্ভাব যেন প্রেমসাগরে চাঁদ ওঠার মতো। দুষ্টজনকে দমন আর শিষ্টজনের পালনের উদ্দেশ্যে সপারিষদ[৫৭] তাঁর আগমন তৎকালীন বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও যশোর জেলার নিম্ন শ্রেণির মানুষের জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ। পারিবারিক বলয়ের মধ্য থেকে আত্মীয় অনাত্মীয় ও সমাজের যারা অস্পৃশ্য বলে নিন্দিত ছিলো, তিনি তাদের মধ্যে ভেদাভেদের রেখা ঘুচিয়ে দিয়ে প্রেমবন্যায় একাকার করে দিয়েছিলেন। প্রফুল্লরঞ্জনের গানে এ রকম একটি বোধের প্রকাশ ঘটেছে।[৫৮]

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর ছাড়া প্রফুল্লরঞ্জন রসরাজ তারক সরকার, শ্রীপতিচাঁদ, অংশুপতি ঠাকুর, পোলাদ গোঁসাই, গোবিন্দ গোঁসাই প্রমুখ মতুয়াবৃন্দের উদ্দেশে গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি তারকচন্দ্রের উদ্দেশে পাঁচটি, গোবিন্দ গোঁসাইকে দুটি ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে একটি করে গান রচনা করেন।

রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার

তারকচন্দ্রের জন্ম সম্পর্কে *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে* একটি বয়ান উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় ও

দশরথের আদেশে *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* রচনার প্রসঙ্গ। মৃত্যুঞ্জয় ও দশরথ বলছেন :

শীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।/ লেখ লেখ যাহা তোর উঠিবে কলমে ॥
যা দেখিস যা শুনিস তাহাতে লিখিবি।/ না দেখিলি না শুনিলি কেমনে পারিবি ॥
কোন ঠাঁই লিখিতে হইলে কিছু সন্ধ।/ আরোপে দেখিল হরি চরণারবিন্দ ॥
অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে অত্রানন্দ।/ হৃদয় আসিয়া লেখাইবে হরিচন্দ্র ॥[৫৯]

এভাবে আদিষ্ট হয়ে কবিগানের শিল্পী তারকচন্দ্র লীলামৃতের রচনাকার হয়ে ওঠেন। তাঁর *মহাসংকীর্তন* মতুয়াধর্মের একটি আকর সংগীত গ্রন্থ হিসেবে ইতঃপূর্বে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর পিতা কাশীনাথ সরকার কর্তাভজা মতে দীক্ষিত হলেও তাঁদের পরিবারে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সম্মিলন হয়েছিলো।[৬০] এবং এর মধ্যে তারকচন্দ্রের বড় হয়ে ওঠা। তিনি কবিগানের আসরে নিজের রচিত যে গান পরিবেশন করতেন তা ১৯০০ সালে *মহাসংগীত* নামে প্রকাশিত হয়। এটি মতুয়া সাহিত্যের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।[৬১] কবিগানে তিনি অভিনবত্বের সূচনাকারী। খিস্তি খেউর বর্জন করে পাঁচালি অংশে বাউল আঙ্গিকের গান পরিবেশনের রীতি প্রচলন করেন তিনি।[৬২] এ প্রসঙ্গটি কবিয়াল নিশিকান্ত সরকার একটি গানে উল্লেখ করেছেন।[৬৩] তাঁকে নিয়ে শুকচাঁদ সরকার একটি ধুয়া গানে[৬৪] আর, সঞ্জয় সরকার (মল্লিক) মতুয়া সংগীতে বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে কবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস কবির বহুমাত্রিক কাজের জন্যে যেভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তা অভিনব ও শ্লাঘনীয়, এবং সেটা তাঁর গান ও *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* রচনার জন্যে।

রসরাজের আগমনের ফলে কবিগানের জগতে যে অভিনব ধারার, এবং মহাসংকীর্তনের প্রভাবে মহাভাবের যে দ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছিলো তা ছিলো অভাবিত। তিনি নবভাবে উদ্বোধিত একজন অবতার পুরুষ হিসেবে ব্যথিতের বেদনা দূর করে নিরাশার বুকে যে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন সেটিই ছিলো তাঁর অমর কীর্তি। প্রফুল্লরঞ্জনের ২/৩/১৩৫৩ তারিখে রচিত এ গানটি সেই অভিব্যক্তির সূচক।

আমার রাই রসরাজ এলো রে/ সেই রাস রসরাজ এলো রে
ঐ যে ভাব সাগরে তুফান তুলে দিলো।
সেই ভাব সাগরে প্রেমের তুফান / উজান বহিলো ॥
পূর্ণিমাতে সাগরেতে লাগলো চাঁদের টান
পাগল হাওয়ার পরশ পেয়ে ছুটে এলো বান,
আমার নটরাজের ললিত গান/ তরঙ্গ তুলিলো ॥

কবি রসরাজ তারকচন্দ্রকে প্রফুল্লরঞ্জন একটি গানে 'কবিদের চূড়ামণি' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কবি বলেন যে, তিনি ছিলেন ত্রেতার কবি বাল্মীকি ও দ্বাপরের বেদব্যাস। কলি যুগে তাঁর অমর কীর্তি স্বরূপ *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* ও *মহাসংকীর্তন*। এ প্রসঙ্গে তাঁর গান :

তুমি কবি বাল্মীকি ছিলে ত্রেতায় / লিখিলে রামায়ণ অমর ভাষায়
তুমি দ্বাপরেতে বেদব্যাস, / সুধীজন বিশ্বাস, কবি রসরাজ এইবারে ॥
শ্রীহরিলীলামৃত লিখিয়া, / অমর হয়েছ মরণ জিনিয়া,
যতো ভক্ত চকোরগণে, সুধা আস্বাদনে / সাঁতার খেলে সুখের পাথারে ॥

রসরাজের তিরোধানের পরে তাঁর ভক্তবৃন্দ প্রতি বছর তাঁর জন্মভিটা জয়পুর গ্রামে মেলার আয়োজন করে। সেখানে আলোচনাসহ গানের অনুষ্ঠান হয়। বাৎসরিক এ রকম একটি অনুষ্ঠানে প্রফুল্লরঞ্জন

সপারিষদ হাজির হন। সেখানে তাঁর গান পরিবেশিত হয়েছিলো। কবির বিশ্বাস জয়পুরবাসীর 'পুণ্য প্রভাব' জনিত কারণে জয়পুর গ্রাম তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে, আর মহামানব রূপে আবির্ভাব হয়েছে তারকচাঁদের।

ওরে আয় তোরা কে যাবি রে / আমার কবি রসরাজের আনন্দ বাজারে।
এবার হলো রে জয়পুর গ্রাম সুপবিত্র তীর্থধাম / পাক ভারতের মাঝারে ॥
এদেশবাসীর ছিলো পুণ্য প্রভাব / তাই মহামানবের হলো আবির্ভাব
আবার এদেশের মাটি খাঁটি হতে খাঁটি / মাথায় উঠলো ধূলির আকারে ॥

তারকচন্দ্র সুধা দান করতে অবতীর্ণ হলেও সুধার আকর ছিলেন শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর। সেই ভাণ্ড থেকে নাম রূপ সুধা পাত্রের বিচার না করে তৃষাতুরকে পরাণ ভরে বিতরণ করেছেন। তাঁর রচিত *শ্রীহরিলীলামৃত* ও *মহাসংকীর্তন* গ্রন্থদ্বয় হরিচাঁদের লীলা মাহাত্ম্যের আকর। কবি তাঁর দূষিত মন নিয়ে পূজার ফুলে শুধু কীট দর্শন করেছেন এবং বিতর্ক বিচার ও আত্ম অহঙ্কার জনিত কারণে যথার্থ মানুষ তাঁর চির অচেনা রয়ে গেল বলে এ গানে খেদ প্রকাশ করেছেন।

এবার হরিনামের সুধা দানিতে / আমার তারক রসরাজ এলো অবনীতে।
তার স্বর্ণকান্তি দেহখান দেখলে জুড়ায় মনপ্রাণ /ভাল লাগে ভালবাসিতে ॥
সুধার আকর আমার শ্রীহরি, / তারক নিয়াছে তাই ভাণ্ড ভরি,
ঐ যে ডাকে জনে জনে পরম যতনে,/ কণ্ঠ ভরে পান করিতে ॥ ...
প্রফুল্ল কয় আমার দূষিত মন, / আমি পূজার ফুলেতে করি কীট দরশন
মজে বিতর্ক বিচারে, আত্ম অহঙ্কারে / মানুষ পারলাম না চিনিতে ॥

১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলেও লোহাগড়া থানার জয়পুর গ্রামে তারকচাঁদের মেলা বসতে অসুবিধা হয়নি। প্রফুল্লরঞ্জনের ১৮/৬/১৩৭৬ তারিখে রচিত গান ও অন্য গান তারকচন্দ্র সরকারের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে (অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ তারিখ) কালিয়া জনপদের মির্জাপুরের পুলিনচন্দ্র বালা ও জিতেন্দ্রনাথ বালা পরিবেশন করেন। তাঁরা এমনভাবে পরিবেশন করেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী অভিভূত হয়ে পড়ে। সে অনুষ্ঠানে প্রফুল্লরঞ্জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর এ গান শোনার ক'বছর পরে অংশুপতি ঠাকুর সব গান মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করার কথা বলেন। কিন্তু কবি রাজী হননি।[৬৫] তাঁর গান প্রকাশিত হয়নি, বা প্রকাশ করতে পারেননি বটে, কিন্তু দারুণভাবে সমাদৃত হয়। এ গানটি তারকচন্দ্র সরকারের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

হরিনামের তরীখানি পার ঘাটায় আনিয়া রে
পরম দয়াল তারকচাঁদ, ওই রয়েছে বসিয়া।
এবার যোগাযোগ ঘটেছে ভাল আয় ঘাটে চলিয়া ॥ ...
এই তরী এই গোনের খবর যারা যারা পেলো,
হাটের গোল মিটায়ে তারা ঘাটে চলে এলো,

তারা তরণীতে উঠে গেলো ভক্তি কড়ি দিয়া ॥
প্রফুল্ল কয় হুঁসে বেহুঁস ওরে মন ব্যাপারী
রঙ্গমহল আবগারী দোকান এই বেলা ফেল সারি
তোর নাম ধরে ডাকে কাণ্ডারী আয় ত্বরা ছুটিয়া ॥

শ্রীপতিচাঁদ

শ্রীপতিচাঁদ শ্রীগুরুচাঁদের দ্বিতীয় সন্তান সুধন্যচাঁদের (১৮৭১-১৯২৮) কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে (১৯০০ খ্রি.)। গুরুচাঁদ তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব দেন তাঁকে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর মহাসংঘের সমর্থিত ব্যক্তিরা ওড়াকান্দি ধামকে ভক্তশূন্য করার যে ষড়যন্ত্র করেন শ্রীপতিচাঁদ সেই ষড়যন্ত্র থেকে ওড়াকান্দিকে মুক্ত করেন নি শুধু, এ কাজে জীবনের একটি বড় অংশ ব্যয় করেন। ৩০/১/১৩৫৪ তারিখে রচিত এ গানটিতে প্রফুল্লরঞ্জন শ্রীপতিচাঁদের চরিত্রের বিশেষ দিকের প্রতি আলোকসম্পাত করেন।

যুগাবতার এই যুগে শ্রীপতিচাঁদ বড় সুসংবাদ হলো কী আহ্লাদ!
তোরা চল সজনী ওড়াকান্দী পুরাইব মন সাধ ॥

অশ্বিনীকুমার সরকার

অশ্বিনীকুমার সরকার মতুয়া ধর্মান্দোলনের একজন বিশিষ্ট কবি। জন্ম খুলনা জেলার গঙ্গাচর্ণা গ্রামে ১৮৭৭ সালে। পিতা কার্তিকচন্দ্র সরকার মাতা অম্বিকা দেবী ছিলেন মতুয়া ধর্মে দীক্ষিত। তিনি যুগপৎ কবিগান ও মতুয়া সংগীতকার হিসেবে মতুয়া সাহিত্যে একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে আছেন। তাঁর *শ্রীশ্রীহরি সংগীত* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯১৭ সালে। এ গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ হয় ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ৯ অগ্রহায়ণ (১৯৫৬ খ্রি.)। এ সংস্করণে শ্রীশ্রীশচীপতি ঠাকুর বলেন :

> অগতির গতি পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্ম ভরসা করিয়া বহুদিন অপ্রকাশিত শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত পুনরায় মুদ্রিত করা হইল। এই গীতিমালা শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের ভক্ত সম্প্রদায়ের ও দেশবাসীর আদরের বস্তু। এই সংস্করণে শ্রীশ্রী ঠাকুরের লীলা সম্বন্ধীয় কয়েকটি কীর্ত্তন সন্নিবেশিত হইল। এই সঙ্গীত পুস্তক বহুদিন যাবৎ অপ্রকাশিত থাকায় ঠাকুরের ভক্তদের প্রাণে যে গভীর নিরাশার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রশমিত হইলে আমার এই চেষ্টা সার্থক মনে করিব।[৬৬]

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশনার সময় প্রফুল্লরঞ্জনের বয়স ছিলো ১৭ ও ষষ্ঠ সংস্করণের সময় ছিলো ৫৬ বছর। বোধ হয় ষষ্ঠ সংস্করণ থেকে তাঁর গুরুচাঁদ বন্দনা সংগীতটি এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। তিনি অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসকে 'কবি অশ্বিনী প্রেমিক রতন' বলে উল্লেখ করে একটি ইতিহাসের খণ্ডাংশ গানের স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। গানটির আস্থায়ী :

কবি অশ্বিনী প্রেমিক রতন / আমি ভক্তিভাবে তোমার / করি চরণ বন্দন।
তোমার গুণের পেয়ে পরিচয় / সবাই গোঁসাই কয় / তুমি পরম শ্রদ্ধাভাজন ॥

অংশুপতি ঠাকুর

শ্রীপতিচাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান অংশুপতি ঠাকুর। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি ওড়াকান্দি ধামের গদিসমাসীন এবং শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশনের সভাপতি হন। তাঁর মৃত্যুর পরে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ অমিতাভ ও কনিষ্ঠ পদ্মনাভ মিশনের সভাপতি হন এবং প্রায় ৫৭ বছর পরে ১৯৮৯ সালের এক সভায় শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ মিশনের মধ্যে 'মতুয়া' শব্দটি যোগ করেন। অংশুপতি ঠাকুরের গুণপনায় ওড়াকান্দির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিলো এবং ঠাকুর বংশের উত্তরসূরি হিসেবে গুরুচাঁদের অমিয়ভাব সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি ছিলো না। ১৭/৩/১৩৭৭ তারিখে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে প্রফুল্লরঞ্জন যেভাবে অংশুপতি ঠাকুরকে উন্মোচন করেছেন, বোধ করি, তা মতুয়া সংগীতের একটি বিশিষ্ট দিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

> এবার দীন হীনের দিন ফিরেছে / আমার অংশুপতি ঠাকুর ধরাতে এসেছে।
> আর ভয় নাইরে নাই ভয় আরাধনার হলো জয় / প্রেমের ঠাকুর ডাক শুনেছে ॥
> শ্রীহরিবংশে যার জনম ধারণ, / মহাসাধক সেই মহাজন,
> তার প্রেম ভক্তি দানিবার আছে পূর্ণ অধিকার,/ আরো কুলধর্মের গুণ রয়েছে ॥

পোলাদ গোঁসাই

যে-সকল মনীষী সরাসরি মতুয়া সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, অথচ মতুয়াধর্মকে অমান্য করতেন না, তাঁদের মধ্যে পোলাদ গোঁসাই ও গোবিন্দ গোঁসাই অন্যতম। বাকসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন পোলাদ গোঁসাই। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে তিনি ১৯৫০ সালের দিকে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার উত্তরদিকে আড়ংঘাটার পূর্ব-দক্ষিণে বীরা নামক গ্রামে একটি মন্দির স্থাপন করেন। সেখানে গৌর-নিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠাসহ আশ্রম নির্মাণ করেন।[৬৭] সেই মূর্তির পূজার্চনা করতেন তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি। তিনি সাধক হলেও কোনো দেবতার পূজা করতেন কিনা তা অজানা। এ প্রবন্ধে প্রফুল্লরঞ্জনের গানকে মতুয়া সংগীত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হলেও, পোলাদ গোঁসাই ও গোবিন্দ গোঁসাই প্রকৃত অর্থে মতুয়া মতের মানুষ ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পোলাদ গোঁসাই ছিলেন নিতাই-গৌরের ভক্ত বা তাঁদের মূর্তির প্রতিষ্ঠাকারী, আর গোবিন্দ গোঁসাই ছিলেন রাধাগোবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠাকারী। তাঁরা মতুয়াধর্মমত বা বৈষ্ণব ধর্মমতকে কখনও অবহেলা করেননি। *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* গ্রন্থে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরকে অনেকবার 'মহাপ্রভু' বলা হয়েছে।[৬৮] আর তিনি নমঃশূদ্র পরিবারের সন্তান হিসেবে নিজেকে চৈতন্যদেবের অবতার বলে ঘোষণা করেন। নাম মাহাত্ম্য প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শ্রীচৈতনের যোগ্য উত্তরসূরি।[৬৯] জনৈক গবেষক হরিচাঁদ ঠাকুরকে একজন ধর্ম-সংস্কারক মনে করেন। বিশেষ অর্থে তিনি ছিলেন একজন বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কারক। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অনাচার ও আর্থ-সামাজিক অবিচারের সংস্কার করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের ভালো দিকগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের উদার ও মানবিকতার বিষয় গ্রহণ সাপেক্ষে এ ধর্মমতের সৃষ্টি করেন।[৭০] বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে ও হরিচাঁদ ঠাকুরকে চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার হিসেবে গ্রহণ করায় 'মহাপ্রভু' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। তাই পোলাদ গোঁসাই ও

গোবিন্দ গোঁসাইয়ের বিশ্বাস ও ভক্তির ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের নিয়ে রচিত গান মতুয়া সংগীত হতে কোনো বাধা নেই। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর পোলাদ গোঁসাই বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করতেন। এই পরিভ্রমণের এক পর্যায়ে তিনি নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে কালাকর্তার ও গোবিন্দনগর গ্রামে শরৎচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে কয়েকবার উপস্থিত হন। এর এক পর্যায়ে প্রফুল্ল-পোলাদের দেখা হয়ে থাকবে।[৭১] প্রফুল্লরঞ্জন তাঁর মধ্যে মর্মের সন্ধান পেয়েছিলেন বলে, এমন অকৃপণভাবে 'প্রাণের দরদিয়া,' 'চেতন মানুষ,' 'দরদী বন্ধু' 'সোনার মানুষ' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেন। তিনি মানুষের প্রেমে এত বেশি মাতোয়ারা ছিলেন যে, তাঁকে ঘর ছেড়ে আসতেই হতো। সেই প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এ-পার বাংলার শাহপুর, কৃষ্ণনগর, দেড়ুলী, রূপরামপুর, শলুয়া ও রংপুর গ্রামসহ বৃহত্তম অঞ্চল, আর ও-পার বাংলার নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম। পোলাদ গোঁসাইয়ের উদ্দেশে রচিত এ গানে প্রফুল্লরঞ্জনের পর্যবেক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এমন সোনার মানুষ এলোরে /এমন চেতন মানুষ এলোরে
আমার পোলাদ গোঁসাই প্রাণের দরদিয়া।
তারে মন দিলে মন মানুষ মেলে চরণে ধরিয়া ॥
সোনার দেশে এলো মানুষ নিয়ে প্রেমের দান
প্রেম বন্যায় ভাসাইল জাতি কুল মান
পরের তরে মান অভিমান দিয়াছে ছাড়িয়া ॥

গোবিন্দ গোঁসাই

জুড়ন বিশ্বাসের দীক্ষা পরবর্তী নাম গোবিন্দ গোঁসাই।[৭২] 'গোবিন্দ গোঁসাইয়ের আশ্রম' নামে খুলনা জেলার গাজীরহাট অঞ্চলের সোনাকুড়ি গ্রামে একটি আশ্রম আছে। তাঁর জন্ম হয়েছিলো বৃহত্তর যশোর জেলার লোহাগড়া থানার চরদৌলতপুর গ্রামে। পিতা মাধব বিশ্বাস, মা মুক্তকেশী দেবী। ছোটবেলা থেকে 'চণ্ডাল' অভিধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রত্যাশী ছিলেন তিনি। সাধক হলেও নড়াইল জেলার কড়োলা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন 'কৃষ্ণলতা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।' গোবিন্দ গোঁসাইয়ের জীবনে কৃষ্ণকথা মৌল হলেও তিনি বেদ, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* প্রভৃতির সাহায্যে সমন্বয়বাদী চেতনায় মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন বলেই এতদাঞ্চলের মানুষের মনের মণিকোঠায় একটি পাকা আসন পেতে আছেন। তিনি যেভাবে নানা রকম জনকল্যাণকর কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে প্রফুল্লরঞ্জনের এ গানটিতে। গানটি রচনার তারিখ ১৪/১০/১৩৭৫।

দয়াল গুরু ধন গোবিন্দরে / তোমার চরণ ধূলার তলে
রাখো আজ আমারে।
আমি বড় আশা করে দন্তে তৃণ ধরে / এলাম তোমার দুয়ারে ॥
তুমি বিশ্ব প্রেমের বাণী শুনাতে, / নামিয়া এসেছ এই ধরাতে,
তোমার শ্রীমুখের বাণী / ঘুচায় মনের গ্লানি
শমন পলায় শিঙ্গার হুংকারে ॥

এ গানটি মূলত গোবিন্দ গোঁসাইয়ের জীবনচর্যার অভিজ্ঞান। তিনি আপন ভেবে যে সেবা প্রদান করতেন সে বিষয়ই বিধৃত হয়েছে এ গানে। গোঁসাই গোবিন্দের প্রেমচেতনা এমনই যে, তিনি যেন পৃথিবীর তাবৎ মানুষের মধ্যে প্রেমসুধা বিলিয়ে দেবার জন্যে আবির্ভূত। তিনি পরিবারহীন হলেও সবার পরিবারই তাঁর পরিবার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বিবেচনা না করে সব মানুষের হিতের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এমন একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষের উদ্দেশে প্রফুল্লরঞ্জনের দ্বিতীয় গান। গানের ভাষিক উপস্থাপনার আর্তি কারুণ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

গোসাই গোবিন্দ এসেছে এবার / বিশ্ব হিতের লাগিয়া।
ঐ যে দান এনেছে হৃদয়খানি / প্রেমের সুধায় ভরিয়া ॥
যে সে মানুষ নয় এ মানুষ, যে সে মানুষ নয়,
এই রূপে এসেছে সেই গোবিন্দ দয়াময়,
অতি পবিত্র ভাবে পরিচয় / পাই চরিত্র দেখিয়া ॥

মতুয়া মেলা ও উৎসব

মেলা ও উৎসব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এর রূপান্তর-প্রক্রিয়া ও বিকশিত হওয়ার বিষয়টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এর সঙ্গে যাদু-বিশ্বাস, আচার-ক্রিয়া, ধর্মীয় উপাদান, অর্থনৈতিক বিষয় ও বিশ্বাস-সংস্কারসহ কোনো স্পর্শকাতর বিষয়ও যুক্ত থাকা অস্বাভাবিক নয়। মেলা বা উৎসবের বাড়তি প্রাপ্তি হিসেবে যুক্ত হয় আনন্দময়তা, ঐতিহ্যের অংশ, সামাজিক সংহতি প্রভৃতি।[৭৩] ওড়াকান্দির বারোনির মেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। মেলাটি বারোনির হলেও প্রফুল্লরঞ্জন একে মতুয়ার মেলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই মতুয়া মেলা ও উৎসব বলতে বোঝানো হয়েছে, ওড়াকান্দিতে প্রতি বছর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে যে মেলা বসে তাকেই। শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের সাধনক্ষেত্র হিসেবে ওড়াকান্দি মতুয়াদের কাছে তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে। এ মেলা একদা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান সফলাডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হতো। হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে সেখানে অংশগ্রহণও করতেন। ১৮৭৯ সালে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর ওড়াকান্দিতে এ মেলা স্থানান্তরের প্রস্তাব দিলে পরের বছর গুরুচাঁদ ঠাকুর এ মেলা ওড়াকান্দিতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।[৭৪] শুধু এ মেলার নয়, প্রত্যেক মেলার উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেও এর ব্যবহার (Use) ও ক্রিয়ার (Function) ম্যাক্রো ও মাইক্রো পটভূমিতে (Context) পরিবর্তন আসতে পারে। সে পরিবর্তন হতে পারে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী লোকসমাজের মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, হতে পারে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, বিনোদনের, ধর্মীয় কিংবা আন্তধর্মীয় মিথ ক্রিয়ার। আবার, কখনও সামাজিক সংহতির, কখনও প্রতিবাদের বিষয় নিয়েও মেলা কেন্দ্রিক পরিবর্তন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।[৭৫] ওড়াকান্দির মেলাকে কেন্দ্র করে সে রকম কোনো প্রতিবাদ মূলক কিছু না হলেও সামাজিক সংহতির বিষয় সূচিত হয়েছে এবং ভক্তবৃন্দের অনেকে মেলাকে বৃত করে রচনা করেছেন অসংখ্য গান। কবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসও ওড়াকান্দির মেলাকে নিয়ে তিনটি গান রচনা করলেও

গানের মধ্যে জাতিগত সংহতিতে মিলবার বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। এতদিন যেখানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ছিলো ভিন্নতা, মতুয়া মেলায় উৎসবের আনন্দেই হোক, কিংবা

সংহতির প্রশ্নেই হোক, সমপাংক্তেয় হয়ে খাবার খাওয়া হচ্ছে। প্রফুল্লরঞ্জনের গানের প্রতিপাদ্যও তাই। তাঁর গান তিনটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। গানের ভাষার লালিত্যময় উপস্থাপনে শুধু মেলার বিষয় তিনি বর্ণনা করেননি; এর অন্তরালে হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্মের উদারতার নানাদিকও বর্ণিত হয়েছে। প্রথম গানটি এ বিষয়ের নান্দনিক প্রকাশ। গানটির প্রথম পংক্তিতে ওড়াকান্দি গ্রামেরই প্রাধান্য সূচিত হলেও শেষদিকে মেলা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, এবং এ গানের ভেতরে কাঙ্গালের হরির জীবনাচরণের দিকটি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

ওড়াকান্দী প্রভুর আগমন
যত ব্যথিত তাপিত চির নিপীড়িত / তারাই পেলো আগে শ্রীচরণ ॥ ...
ঐ দেখ মতুয়ার মেলায় / ব্রাহ্মণ শূদ্রে এক সাথে খায় গো
এমন কি আর হয়েছে কখন?
এবার নামের আকর্ষণে নামীর আগমনে / ক্ষেত্র তীর্থের হলো সম্মিলন ॥
প্রফুল্ল কয় চল ত্বরায়, / যাই সবে মতুয়ার মেলায় গো
এসেছে আজ বড় শুভক্ষণ / আজি মিলিবে মিলাবে বড় শান্তি পাবে
ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥

ওড়াকান্দির মেলা এমনই একটি আয়োজন যে, সে প্রেমের মেলায় মিলবার জন্যে মানুষের আগ্রহের অন্ত নেই। স্বপ্নের মধ্যেও এ মেলায় যাবার জন্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

ওড়াকান্দী প্রেমের মেলা আয় সবে যাই ছুটিয়া / আমার স্বপন মাঝে কে আসিয়া
গেল বলিয়া আয় চলিয়া / আমার মন নিলো সে হরিয়া ॥
জুড়াতে তাপিত ধরা এল নব রসের গোরা /গোপন করা ধন লইয়া
সাধে ব্রহ্মাদি যার লাগিয়া / ধ্যানে বসিয়া কত সাধিয়া
তাই জীবে দিতে এল যাচিয়া ॥

এ গানটি যথার্থ মেলা বিষয়ক। দ্রব্য সামগ্রী এ মেলার মৌল নয়, এ মেলার আসল বিষয় হলো মানুষ এবং তার বহুমাত্রিক ধর্মাচরণের সমন্বয়। ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের ২২ তারিখে রচিত এ গানটি প্রফুল্লরঞ্জনের অন্য রকম অভিব্যক্তির দ্যোতনা। তখন কবির বয়স মাত্র ২৯ বছর।

কে তোরা মেলা দেখতে যাবি আয়
সে মতুয়ার মেলা বিষম লীলা / ভিড়ের ঠেলায় ঢোকা দায় ॥
শৈব শাক্ত গাণপত্য মতুয়ায় নাই আর অন্ত
যে যাহার অনুরক্ত সে তাহারে খুব বাড়ায়

শুধু দ্বেষা দ্বেষী কমি বেশী / এই নিয়ে আসর জমায় ॥
সংসারটা অসার দেখে কেউ চুল দাড়ি রেখে
সর্বাঙ্গে তিলক মেখে পরিব্রাজক হয়ে যায়
ঘুরে ফিরে ধীরে ধীরে / পুনরায় সংসার পাতায় ॥

কবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এত সংখ্যক সাধক, অবতার পুরুষ ও মতুয়া মেলা বিষয়ে যে গান রচনা করেছেন, সে গানের শৈলী বা আবয়বিক পরিধির মধ্যে শব্দগত, ভাবগত এমনকি প্রকাশরীতিগত সাদৃশ্য থাকলেও গানগুলো যে-মনন শক্তি ও চেতনা শক্তি দ্বারা লালিত, সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাঁর চৈতন্যের নান্দনিক প্রকাশ এ গানগুলো যেন এক একটি দ্যুতিময় হীরকখণ্ড, যা কোনো না কোনোভাবে আলো বিকিরণ করবেই। তবে একজন মতুয়া হিসেবে তিনি গান লিখেছেন, না, গান লিখে মতুয়া ধর্ম ও সম্প্রদায়ের হয়ে উঠেছেন, সেটি আলোচনার দাবি রাখে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে এ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে, সে গানই হোক বা কবিতাই হোক, বা অন্য কোনো বিষয়,– রচনা করলে তাঁরা মতুয়াত্ব হারাবেন, না মতুয়া সম্প্রদায়ের অধিভূক্ত হবেন, সে বিষয়ের আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

প্রফল্লরঞ্জনের পূর্বাপর

মতুয়াসংগীত মতুয়া ধর্মান্দোলনের একটি বিশেষ ধারা। এ ধারায় গান লিখেছেন অসংখ্য কবি। কেউ প্রফুল্লরঞ্জনের পূর্বে কেউ পরে। পূর্ববর্তী রচয়িতাদের মধ্যে ড. বিরাট বৈরাগ্যকৃত বয়ঃক্রমের তালিকা অনুসারে প্রফুল্লরঞ্জন দশম। এঁদের মধ্যে আছেন : মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, দশরথ বিশ্বাস, রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার, রূপচাঁদ গোস্বামী, হরিবর সরকার, সুধন্যকুমার সরকার, অশ্বিনীকুমার সরকার, শ্যামচাঁদ পাণ্ডে ও রসিকলাল মিস্ত্রী প্রমুখ। প্রফুল্লরঞ্জনের পরে আছে ৩৩ জন কবির নাম। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবির সংখ্যা ৩৮ জন, এবং তৃতীয় পর্যায়ের সংখ্যাটি অনধিক ৭৭ জন।[৭৬] ড. বৈরাগ্য প্রণীত সর্বমোট ১৫১ জন মতুয়া সংগীত রচয়িতা ছাড়াও তালিকা বহির্ভূত আরও অনেক মতুয়া ঘরানার কবি বর্তমান। যাঁদের গান লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে।[৭৭] মতুয়া ধারার গান বাংলার লোকায়ত ধারার সৃষ্টি হলেও, এ গান অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মাধ্যমে বিবর্তিত ও বিবর্ধিত হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমদিকে এ গান ছিলো মৌখিক ও শ্রুতি নির্ভর। ক্রমশ লিখিতরূপে মানুষের কাছে রক্ষিত খাতায় এ গান পাওয়া গেলেও, মুদ্রিত হয়েছে অনেক পরে। এমনও হয়েছে এই গানের রচয়িতাদের মৃত্যুর পরে, এমনকি শতবর্ষ পরেও গানগুলো মুদ্রিত হয়নি। শিল্পের বিচারে মানসম্মত হওয়া সত্ত্বেও, লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। কারণ হিসেবে বলা যায়, রচয়িতার মুদ্রণ বিষয়ে অজ্ঞতা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা। তাছাড়া, শিল্পের বিচারে কালোত্তীর্ণ না হতে পারা, অথবা ঠিক সময়ে এ ধারার মানুষের হাতে না পড়া। এমনও হতে পারে, এ গানের রচয়িতাগণ বাহ্যবোধে এ গানগুলো মুদ্রণের দায় আছে বলে মনে করেননি। তবে, এরকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম। যাহোক, নানা কারণে অমুদ্রিত প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস এ দলের শীর্ষে অবস্থান করলেও, তিনি প্রায় হারিয়ে যাওয়া একজন কবি। তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়কর বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে প্রায় কেউ-ই অবহিত নন। বিভিন্ন জনের কাছে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে থাকা কিছু গানের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন জনের গ্রন্থে বা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছেন বটে, কিন্তু তা খুবই স্বল্প পরিসরে।[৭৮] তিনি কয়েকটি মতুয়া সংগীতের রচয়িতা, এবং সেগুলো কবিয়াল বিজয় সরকারের চেয়ে সংখ্যায় প্রায় ছয় গুণ।[৭৯]

ড. বৈরাগ্য মতুয়া ধারার গানকে 'ধর্ম সাধন গীতি' ও প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসকে 'মতুয়া ভক্ত ও মতুয়া ধর্ম প্রচারক' এবং 'শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, মতুয়া ধর্মাদর্শ ও সাধনতত্ত্ব এবং সমকালীন জীবন-বাস্তবতা, সর্ববিষয়ে' সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮১] এ কথা অযথার্থ নয়। কিন্তু এমন অনেক কবি আছেন, যাঁরা মতুয়া ধর্ম ও সম্প্রদায়, এমনকি, শ্রীহরি-গুরুচাঁদ সম্পর্কীত গান রচনা করেছেন; এবং তাঁদের সৃষ্টি কর্ম এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, তাঁরা বিশেষ যে কোন ধারার লেখক তা নির্ণয় করা কষ্টকর। প্রফুল্লরঞ্জনের বেলায় বিষয়টি অপ্রযুক্ত নয়। আর, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা গান রচনা করলেই যে মতুয়া সম্প্রদায়ের লোক হয়ে যাবেন, বোধ করি, এমন ভাবনা অবান্তর। তবে এ কথা সত্যি যে, বঙ্গদেশে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যত সংখ্যক কবিয়ালের উদ্ভব হয়েছে, অন্যান্য সম্প্রদায় সেদিক থেকে অনেক পিছিয়ে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি মনে করা হয়, কবিয়ালগণ কবিগানের প্রয়োজনে যে ধুয়া গান রচনা করেন, তা সবি মতুয়া ধর্মাশ্রিত। তাহলেও সৃষ্টি হবে একটি ভ্রান্তি। আসলে কবিয়ালবৃন্দ মতুয়াধর্ম ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখেননি তা নয়; তবে কবিগানের প্রয়োজনে তাঁরা যে ধুয়া গান রচনা করেন, তার সবই মতুয়া ধর্মাশ্রিত নয়। 'কবিগান' কবিয়ালদের যুগপৎ গান ও কবিতার সৃষ্টি। তার সঙ্গে আছে বিতর্কও। এই বিতর্কের জন্যে কবিগানের নামান্তর হয়েছে 'কবির লড়াই'।[৮১] এত সব নিয়ে যে কবিগান তাকে ড. বৈরাগ্য মতুয়া ধর্মাশ্রয়ী গান হিসেবে ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুমান'-এর বরাত দিয়ে বলেন :

> কবিগানের ধারা থেকেই মতুয়া পদগীতি সাহিত্যের উদ্ভব– কবি রসরাজ তারক চন্দ্র সরকার, কবি চূড়ামণি হরিবর সরকার, প্রেমিক কবি অশ্বিনীকুমার সরকার, মনোহর সরকার, মধুসূদন সরকার প্রমুখ কবিগণের আসরে বিতর্কিত বিষয়ের অনুষঙ্গে ছুট বা ধুয়া গান হিসাবে উপস্থিত মত মতুয়া মাহাত্ম্য বিষয়ক পদ রচনা ও পরিবেশন করতেন বলে জানা যায়। অনেক ক্ষেত্রে কবিগানের আগমনী, সখী উক্তি, বিরহ, বিচ্ছেদ, গোষ্ঠ, ভোর প্রভৃতি পর্যায়েও মতুয়া ভক্ত লোককবিগণ মতুয়া ভাবাদর্শমূলক পদগীতি আসরে পরিবেশন করতেন বা করে থাকেন। একে মতুয়া পদগীতি সাহিত্যের আদিরূপ বা উৎস বলে ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন।[৮২]

কবিগানের শিল্পিবৃন্দ বা কবিয়ালরা যে মতুয়া সংগীত রচনা করেননি তা নয়। তবে এঁদের সংখ্যা খুবই কম। আর মতুয়া পদ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ড. বৈরাগ্য যে-সকল স্বনামধন্য কবিয়ালের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা কবিগানের যে নিয়মে বা প্রকরণে ডাক, মালশি, সখীসংবাদ, গোষ্ঠ প্রভৃতি পরিবেশন করতেন, সে বিষয়ে ড.স্বরোচিষ সরকার কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর গবেষণা গ্রন্থে বিশদ উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন তখন কবিগানের সূচনা সংগীত হিসেবে পরিবেশিত ডাকের বিষয় ছিলো 'কালী' বা 'দুর্গা' বিষয়ক গান, মালশির 'আদ্যাশক্তি,' ভোর-গোষ্ঠের বিষয় 'বৈষ্ণবীয়,' সখীসংবাদের

ছিলো 'রাধাকৃষ্ণ' প্রসঙ্গ।[৮৩] আর, ড. বৈরাগ্য উল্লিখিত হরিবর সরকার, মনোহর সরকার ও মধুসূদন সরকারের পরিবেশিত ডাক, তারকচন্দ্র সরকারের মালশি ও সখীসংবাদে যে সকল বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার বিষয় ছিলো 'রাধাকৃষ্ণ' ও 'কালী' প্রসঙ্গ;[৮৪] কখনও মতুয়া বা মতুয়া ধর্মের কোনো প্রসঙ্গ নয়। আর, মতুয়া ধারার পদাবলির প্রথম রচয়িতা তারকচন্দ্র সরকার হলেও, কবিগানে তিনি কী ধরনের ধুয়া পরিবেশন করতেন তা আজ অনুমান করা সম্ভবপর নয়। তবে অন্যান্য কবিয়ালদের মতো কবিগানের 'কবি বা লহর কবি' অংশে তাঁর রচিত একটি বিষয় ছিলো 'পাশাখেলার কবি'।[৮৫] বিষয়টি সম্পূর্ণ মহাভারতীয় উপাখ্যান।

মতুয়াসংগীত রচয়িতার অভিধা

এবার দেখা যাক, মতুয়া ধর্মাশ্রয়ী না হয়েও যাঁরা মতুয়াসংগীত লিখেছেন তাঁরা কী হিসেবে অভিহিত হবেন। প্রসঙ্গটি নিয়ে মধ্য যুগে অনেক মুসলিম কবির বৈষ্ণব পদাবলি রচনার বিষয়টি একটু ফিরে দেখা যেতে পারে। পদাবলি রচনার কারণে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, রমণীমোহন মল্লিক ও ব্রজসুন্দর সান্যাল এঁদের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি,' আর, অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' বলে উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে ব্রজসুন্দর সান্যালের মত : 'তাঁহাদের ধর্মমত কি ছিল তাহা অভ্রান্তিরূপে জানিতে না পারিলেও তাঁহারা যে প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণবধর্মানুরাগী ছিলেন তাহাতে সংশয় করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না এবং এই জন্যই আমরা তাঁহাদিগকে মুসলমান বৈষ্ণবকবি বলিয়া অভিহিত করিতে সাহসী হইলাম।'[৮৬] অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১০২ জন মুসলমান পদকর্তার প্রায় সাড়ে চারশো পদের উল্লেখ করে পদ রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা বৈষ্ণব হয়ে উঠেছিলেন, না মুসলমান, সে প্রসঙ্গে বলেন :

> গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ পুরুষ চৈতন্যদেবকে যাঁহারা বন্দনা করিয়াছেন, চৈতন্যদেবের প্রতি যাঁহারা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ব্যতীত আর কি বলিব? কৃষ্ণলীলার পদসমূহকে কোন কোন স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু গৌড়লীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপকের বিশেষ অবকাশ নাই। গৌরলীলা পদরচক মুসলমান কবিদিগকে বৈষ্ণবভাবাপন্ন না বলিবার মত কোন যুক্তিই পাইতেছি না।[৮৭]

মধ্যযুগে পদাবলি এমন যুগপ্লাবি আবেদন সৃষ্টি করেছিলো যে, অনেক মুসলমান কবিও এ ধারায় স্বচ্ছন্দে পদাবলি রচনা করলেও তাঁরা বৈষ্ণব কবি হয়ে ওঠেননি। ড. আহমদ শরীফ বৈষ্ণব শব্দ পরিহার করে 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য,' আর, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'মুসলমান পদকর্তা' হিসেবে উল্লেখ করেন। আসলে বৈষ্ণব পদাবলি ছিলো একটি ধরণ বা শৈলী বিশেষ। এ শৈলীতে মুসলমান কবি পদাবলি লিখলে যেমন বৈষ্ণব কবি হয়ে যাননি, অনুরূপভাবে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা মতুয়া ধর্মাশ্রয়ী না হয়েও, মতুয়া সংশ্লিষ্ট গান রচনা করলে তাঁরা মতুয়া হয়ে যাবেন না। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) *ব্রজাঙ্গনা*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* লিখে 'বৈষ্ণব কবি,' আর কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) শ্যামা সংগীত রচনার জন্যে 'শাক্ত কবি' হয়ে যাননি; প্রফুল্লরঞ্জকে

সেই ধারার কবি বলা যেতে পারে। তিনি একাধারে চৈতন্যদেব, রাধাকৃষ্ণ, ভাব, ভাটিয়াল, বিচ্ছেদ, দেহতত্ত্ব, আঞ্চলিক ভাষায় অসংখ্য গান ছাড়া রচনা করেন শাক্তপদাবলিসহ বৈচিত্র্যপূর্ণ গান। এ নিবন্ধে মতুয়া সংগীত হিসেবে তাঁর ২৩টি গানের উল্লেখ করা হলেও তিনি বিশেষ কোনো ধর্মমতের পক্ষপাতী ছিলেন কিনা৮৮ সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যতদূর জানা যায়, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ, আর, তাঁর নির্দিষ্ট কোনো ধর্মমত মানেই ছিলো 'মানবতাবোধ' ও মানুষের সেবা। সে রকম মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে একটি গানে।[৮৯] তবে একজন কবি হিসেবে তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, অবতার পুরুষ ও মেলা বা উৎসব বিষয়ে যেমন, তেমনি অন্য বিষয়েও লিখেছেন অসংখ্য গান। এর মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রসঙ্গে যেমন লিখেছেন, তেমনি অবতার পুরুষ প্রসঙ্গেও লিখেছেন কয়েকটি গান।[৯০] আর, সৎসংঘে দীক্ষিত না হয়েও শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুরকে (১৮৮৮-১৯৬৯) নিয়ে রচিত একটি গানে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।[৯১] এ রকম সর্ববাদিসম্মত একজন মানুষ হয়েই তিনি কবি, আর কবি হিসেবে ছিলেন সর্বমতে শ্রদ্ধাশীল। আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যে প্রফুল্লরঞ্জন গুরু-শিষ্যের প্রশ্ন-উত্তরে সাধনতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পারমার্থিকতত্ত্ব, কর্মযোগ, বস্তুভেদ, গুহ্যার্থ, দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, পঞ্চ ম-কারতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে পনেরো জোড়া গান রচনা করেন এবং দেহতত্ত্বের গানের মধ্যে 'যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে' কথার সূত্রে পারমার্থিক মুক্তির পথ অন্বেষণ করেন,[৯২] এ রকম একজন আলাদা প্রফুল্লরঞ্জনকে 'মতুয়া' বলার মধ্যে কেমন যেন একদেশদর্শিতার প্রকাশ ঘটে। তাই আমাদের মনে হওয়া অনুচিত নয় যে, এরকম একটি বোধ থেকে তিনি মতুয়াধর্ম বিষয়ে সংগীত রচনা করেও ঠিক মতুয়া সম্প্রদায়ের কবি হয়ে উঠেননি।

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর গানের বৈচিত্র্যের জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থে কম-বেশি উল্লিখিত হয়েছেন। এ জাতীয় উল্লেখের অর্থ, তাঁর গান নান্দনিকতা, শৈলী ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনন্য সৃষ্টি, এবং অনন্ত সম্ভাবনার আকর। তাঁর আগের কবিদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও দশরথ বিশ্বাস *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* গ্রন্থের সূত্রে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। প্রসিদ্ধি পেয়েছেন রমণী গোঁসাই (১২৭২-১৩৩৮), হরিবর সরকার, সুধন্যকুমার ঠাকুর, অশ্বিনীকুমার সরকার, শ্যামচাঁদ পাণ্ডে, রসিকলাল মিস্ত্রী এবং মহানন্দ হালদার। তাঁরা যে অর্থে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এবং হয়ে উঠেছিলেন মতুয়াধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিভূ, অসম্ভব প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও, প্রফুল্লরঞ্জন সে অর্থে স্থানিক পরিসরে আঁটকে আছেন গানের বিপুল সম্ভার নিয়ে। উপর্যুক্ত কবিদের মধ্যে অনেকের শ্রীধাম ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ি বা শ্রীধাম ঠাকুর নগর থেকে একাধিক গানের বই প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে রূপচাঁদ গোস্বামীর *রূপসঙ্গীত* (১৯৮০ সালে শ্রীধাম ওড়াকান্দি ও ১৯৮৪ সালে শ্রীধাম ঠাকুর নগর থেকে), হরিবর সরকারের *মহাবারুণী*, *দ্বাদশ আজ্ঞা*, *অষ্টাধিক শতনাম*, সুধন্যকুমার ঠাকুরের *শ্রীশ্রীহরিসংকীর্তন*, অশ্বিনীকুমার সরকারের *শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত*, শ্যামচাঁদ পাণ্ডের *শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ পদাবলী* (১৯৬৮), রসিকলাল মিস্ত্রীর ভক্ত *প্রেম সঙ্গীত* (১৩৭৫) ও মহানন্দ হালদারের শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ *চরিত*, *শ্রীশ্রীহরি-গুরুচাঁদ গুণগীতি ও শ্রীশ্রীহরিচাঁদের দয়ার ফসল* প্রভৃতি। প্রফুল্লরঞ্জন সে রকম কোনো আনুকূল্য না পেলেও, হারিয়ে যাননি।

প্রফুল্লরঞ্জনের মতুয়া সংগীতে সমাজতত্ত্ব

প্রফুল্লরঞ্জনের রচিত মতুয়াসংগীতের আছে সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব। কেননা, সমাজতত্ত্ব সমাজজীবন বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যা জড়িয়ে আছে, তা সবই সমাজতত্ত্বের বিষয়। একটা উদাহণের সাহায্যে বিষয়টি বলা যেতে পারে। হাট থেকে সব্জি কিনে রান্নার সাহায্যে সেগুলোকে যেমন গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়; অনুরূপভাবে সমাজজীবন থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী হলো সমাজতত্ত্বের কাঁচামাল। এই কাঁচামাল আর সমাজতত্ত্ব এক বিষয় নয়। একটি অবিমিশ্র উপাদান, অন্যটি উপাদান নিঃসৃত তত্ত্ব, যা মননশীলতায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে।[৯৩] অন্য কথায়, মানব সমাজের উৎপত্তি, গঠন ও উৎকর্ষবিধান সম্পর্কীয় নিয়ম-কানুন বা প্রণালি সমাজতত্ত্বের বিষয়। আর, যাকে আমরা লোকসংস্কৃতি বলি তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, শিল্প ও সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়। এ-সব বিদ্যার সমন্বয়ে লোকসংস্কৃতি বা লোকসাহিত্য হয়ে উঠেছে বহুবিদ্যানির্ভর (Multidisciplinary) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চর্চার অন্যতম বিষয়। সমাজবিজ্ঞানের মতো লোকসাহিত্যের আছে নিজস্ব তত্ত্ব। ঠিক সেজন্যেই এ দুটি বিদ্যা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে তত্ত্ব নিয়ে নিজের উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তি নির্মাণ করে না শুধু, এর সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি (intellectual) ও অনুসন্ধান প্রবণতা (New trend) যুক্ত হওয়ায় এ বিদ্যা হয়ে উঠেছে বহুবিদ্যার সক্রিয় ও উদ্ভাবনাময় প্রয়োগে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের শাখা। এদিকে লক্ষ্য রেখে ফোকলোর তাত্ত্বিক রিচার্ড বাউম্যান বলেন : Folkore in its origin, was part of broad intellectual effort to comprehend social life and social transformation within a unified frame of reference. (Bauman, 1989, p.177)[৯৪] এই লোকসাহিত্য ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর এই সামাজিক সম্পদ নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য। যার মূলে আছে ব্যক্তি প্রতিভা। মানুষের জন্ম, সামাজিক জীবনযাপন, সমাজ কাঠামো, সমাজ বিষয়ক তত্ত্ব, চেতনা, মূল্যবোধ সাহিত্যের মধ্যে প্রতিভাত হলেও, সাহিত্যিকের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে পরিবেশ চেতনা, জীবন-চেতনা ও শিল্প চেতনা। তাই বলা যায়, সাহিত্যকে হতে হয় সমাজ-মানসের প্রতিনিধি, অর্থাৎ চূড়ান্ত অর্থে সাহিত্য একটি বিশুদ্ধ সমাজকর্ম– মানুষ যার ফল ভোগ করবে। সমাজতাত্ত্বিকের সেই সিদ্ধান্তটিতে বলা হয়েছে : The first and the most significant reason for the relationship between society and literature is the fact that man created the literature and he is a social animal।[৯৫] তাই একজন প্রফুল্লরঞ্জন প্রথমত, সমাজের মানুষ, দ্বিতীয়ত, একজন কবি ও গান রচয়িতা হিসেবে তিনি যে-সকল মানুষের বিষয় তাঁর গানে উপস্থাপন করেছেন, তাঁদের জীবনে অবতারত্ব আরোপ করা হলেও, তাঁরা শ্রেণি মানুষের পরিপন্থী নন। তাঁরাও জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিম্ন বলয় থেকে জীবনের এক বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছিলেন বলেই তো তাঁদের উদ্দেশে প্রফুল্লরঞ্জনের গান রচনা। তাঁদের জীবনগাঁথা স্বরূপ এ গানগুলো সামাজিক মানুষের আদর্শ হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে বলে একদিকে এ মতুয়াসংগীত যেমন সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তা হয়ে উঠেছে সমাজতত্ত্বের বিষয়ও। আর মতুয়া সংগীতের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি, যাঁদের অবতার বলা হয়েছে, সেই হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ

সামাজিক শোষণ, অপশাসন, অনিয়ম ও বঞ্চিত মানুষের পক্ষে ছিলেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। তাঁরা সামাজিক কলুষতা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অবৈধ যৌনাচার, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ ও শ্রমজীবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দিয়েছেন এগিয়ে। ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর শ্রেণির মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে গিয়ে এক সময় আধ্যাত্মিক নেতায় পরিণত হন। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের, যারা অবহেলার শিকার, উনিশ শতকের প্রথমদিকে হরিচাঁদ ঠাকুর তাদের ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। তিনি সামন্তপ্রভু-ঔপনিবেশিক শক্তি, সামাজিক বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে নিরন্ন মানুষের পক্ষে যেমন কথা বলেন, তেমনি ক্ষুধা-দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের দৈনন্দিন উপযোগিতার কথাও ভেবেছেন ও মানুষগুলোকে ব্যবসায় এবং শিক্ষায় প্রাণিত করেছেন। তাঁর এ কর্মকাণ্ড সবই সামাজিক তথা সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের অঙ্গীভূত। প্রফুল্লরঞ্জন মতুয়া সংগীতের মধ্যে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদসহ অন্যান্যদের যে সপ্রেম মানবীয় বোধ ও সামাজিক আন্দোলনের অর্থাৎ 'কে করে কার জাতের বিচার কে ধনী কে মানী / এক বাজারে এসে সবার হচ্ছে জানা জানি।/ ... কুলের অভিমানে যারা ছিল দূরে দূরে / নামীর আকর্ষণে গাইলো নাম এক সুরে' পরিবেশনের মধ্যে যে জাতি-বর্ণ-গোত্র-ধনী-মানী-জ্ঞানীর ভিন্নতাবোধ দূরীভূত হয়ে সবাই সমতার প্রশ্নে মতুয়া হয়ে উঠেছেন, সংঘ ও সংগঠনের প্রশ্নে বিষয়টি কোনোক্রমে সমাজতত্ত্বের সীমানা বহির্ভূত নয়।

সমাজতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি মানববিদ্যার দুটি স্বতন্ত্র শাখা হলেও, এদের সঙ্গে ঐক্য আছে নৃবিজ্ঞানের। সমাজতত্ত্বের অন্যতম শাখা হিসেবে নৃবিজ্ঞানের প্রথম ধারাটি মানুষের জৈব বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রকৃতি বিষয়ক। দ্বিতীয় ধারার বিষয় সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology)। এ ধারায় মানুষের অর্জিত ব্যবহার (Learned Behaviour), আচার-আচরণ তথা মানুষের গোটা সাংস্কৃতিক জীবনের অধ্যয়ন।[৯৬]

সাম্প্রতিক কালে নৃবিজ্ঞান মানবজীবনের সামগ্রিক অধ্যয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এমনকি, এ বিষয়ের মধ্যেও যৌথভাবে ইতিহাসের অনুধ্যান খুবই প্রাসঙ্গিক।[৯৭] গবেষণার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব একটি অন্যটির পরিপূরক। এর মূল দিক এক রকম মনে হলেও, উপাদানগত দিক থেকে ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির অনেক কিছু না নিয়েও সমাজতত্ত্ব তার বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে লোকসংস্কৃতির দ্বারস্থ হতে হয়। এ রকম ঐক্য ও ভিন্নতা নিয়ে সমাজতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন। 'মতুয়াসংগীত' লোকসংস্কৃতির একটি অবস্তুগত উপাদান হিসেবে সামাজিক আন্দোলনের একটি ইতিহাস হয়ে উঠেছে। এই ইতিহাসে ব্যক্তিক প্রসঙ্গযুক্ত হলেও, বিধৃত হয়েছে সংগীতের মাধ্যমে। এই ইতিহাসই সমাজতত্ত্বের উপাদান।

কথাটির সত্যতা তখনই অনুভব করা যায়, যখন কোনো লেখক বা সাহিত্যিক একটি বিশেষ সময়, বা ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন পর্বকে, অনেক বছর পরে হলেও, তাঁর কথায় বা গানের সুরে ধারণ করেন, এবং রূপ-রস-গন্ধে পূর্ণ করে সৃষ্টি করেন সাঙ্গীতিক সৌকর্য। এই সৌকর্যই হলো সাহিত্যের মৌল,

আর সেই সময় ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাই সমাজের দর্পণ। লোকসংগীতের মধ্যেই আছে সমাজ, সমাজের ইতিহাস, ভাঙাগড়া, উত্থান-পতন, শ্রেণিসংঘাত, বিরোধ ও দ্বান্দ্বিকতার গতিশীল বিশ্লেষণ। সংগীতের এই বিশ্লেষণ ধারার মধ্যে আছে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদনের পারস্পারিক সম্পর্ক। এই উৎপাদনশক্তি বলতে সংগীত রচনা, উপস্থাপনা, সুর সৃষ্টি, যন্ত্রের ব্যবহার বোঝালেও সমাজতত্ত্বের আলোকে কোনো সংগীতকে বা লোকসংগীতকে বিচার করতে গেলে তার সমাজ কাঠামো ও পারিপার্শ্বিকতার বিচার আবশ্যক। কারণ সংগীত পরিবেশনের স্থানকাল শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নতুন উপলব্ধিতে সুরে ও ভাষায় যেভাবে একাত্ম হয়ে যায়, তাতে সংগীত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বিকাশ চক্রবর্তীর মন্তব্য শোনা যেতে পারে :

> সৃজনশীলতা, সুরের মাধুর্য, সৌন্দর্যসৃষ্টি, কল্পনাশক্তির কাছে আবেদন প্রভৃতি সবকিছুকে ধরে নিয়েই বলা যায় যে, সঙ্গীত তার পারিপার্শ্বিক প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না এবং এজন্যই বিশেষ কোনো সঙ্গীতের সৃষ্টি, বিকাশ ও অবলুপ্তি নির্দিষ্ট স্থান-কালের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সাস্কৃতিক বিষয়ের মতো সঙ্গীতও তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে এবং স্থানকালের সীমাকে অতিক্রম করেও যেতে পারে; তবে কোনোভাবেই তারে ছিন্নমূল বলা যায় না। সমাজ নিরপেক্ষভাবে নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টিকে সঙ্গীতের একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হলে সঙ্গীতের সামাজিক চাহিদার বিষয়টা কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' প্রবীণ শ্রোতার স্মৃতিমেদুরতার তন্ত্রীতে আজও আঘাত করে কিন্তু এই জাতীয় গান নতুন করে আর তৈরি হতে পারে না। আর্থ-সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে গম্ভীরা গান এখনও রচিত হয় যদিও 'স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা/ দিব তবে মাণিক কলা/ নইলে আইঠ্যা কলা' তৈরি হয় না। সমাজ-মানস তথা সমকালীন আবেগের সাথে একাত্ম হতে না পারলে সঙ্গীতের দর্শন ও তার সাঙ্গীতিক প্রকাশের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি দৃঢ় হয় না।[৯৮]

সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে সংগীতের পুনঃসৃষ্টির গুরুত্ব বিবেচনার বিষয়। কিন্তু শতক বা অর্ধশতক বছর পরের পরিবেশনা, পরিবেশনের স্থান-কাল-সময়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঐ সংগীতে যে নতুন মাত্রা, নতুন দ্যোতনা সৃষ্টি হয়, তখন তাকে পুনঃসৃষ্টি বলা হয়। যেমন 'তোমার চরণতলে গুরুচাঁদ, রাখ আজ আমারে,' 'এসেছে কাঙ্গালের হরি ওড়াকান্দী গাঁয়,' 'এবার হরিনামের সুধা দানিতে/ আমার তারক রসরাজ এলো অবনীতে,' 'কবি অশ্বিনী প্রেমিক রতন,' 'এমন সোনার মানুষ এলোরে/ এমন চেতন মানুষ এলোরে/ আমার পোলাদ গোঁসাই প্রাণের দরদিয়া' প্রভৃতি মতুয়া সঙ্গীত যখন বর্তমান সময়ে পরিবেশিত হয়, তখনই হয় পুনঃসৃষ্টি। শুধু লোকসঙ্গীতের বেলায় নয়, যে-কোনো সঙ্গীতের, বিশেষ করে মতুয়াসঙ্গীতের সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিচার্য গানের 'জন্ম এবং পুনর্জন্ম'। সেদিন যে মনস্কতায় গান রচিত ও পরিবেশিত হতো, শত বা অর্ধশত বছর পরের পরিবেশনায় সে গানে সূচিত হয় নতুন মাত্রা। এই নতুন মাত্রার বৈগুণ্যে রচনাকার, সুরকার এবং কালীক পরিবেশনা ও উপস্থাপনের বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয়।

উপসংহার

নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর জাগৃতি মূলত শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর হলেও, এ জনগোষ্ঠীর আছে গানের সম্ভার। আর আছে বৃহৎ সংখ্যক কবিয়াল। তাঁদের রচিত গানকে মতুয়াসংগীত এবং তাঁদেরকে মতুয়া বলা হলেও সব কবিই মতুয়া নন ও তাঁদের সব সংগীতই মতুয়াসংগীত নয়। তাঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনার বৃহৎ সম্ভারকে শুধু মতুয়াসংগীত বললে কবিদের বহুমাত্রিকতা সীমিত হয়ে একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মতুয়া ধর্মমত আজকের দিনেও সমানভাবে জাগরণের একটি বিশেষ উপায় তাতে সন্দেহ নেই। এযাবৎ মতুয়াসংগীতের জগতে যে সকল কবি বিশেষ অবদান রেখেছেন, প্রফুল্লরঞ্জন তাঁদের অন্যতম। ধর্মীয় বলয়মুক্ত এ কবি শুধু গানের শৈলী ও ভাবসম্পদের জন্যে বেঁচে থাকবেন লোকসংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান হিসেবে। প্রফুল্লরঞ্জনের মতুয়াসংগীত শুধু সংগীতই নয়, এর আছে সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব। কেননা, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান প্রভৃতির মেলবন্ধন স্বরূপ এ গান রচনার প্রসাদগুণে একাধারে সমাজের ও সাহিত্যের বিষয় ছাড়াও লোকসংস্কৃতিরও একটি বিশেষ সম্পদ। ঠিক এ কারণে, লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে এ গানে যেমন লোকমানসের প্রতিফলন হয়েছে, তেমনি প্রকাশ হয়েছে ভক্তিভাবের। সেদিক থেকে প্রফুল্লরঞ্জনের এ মতুয়াসঙ্গীত সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান।

উল্লেখপঞ্জি

১. বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিম প্রথম বৃহত্তর, অতঃপর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মাহিষ্য সম্প্রদায়, আর নমঃশূদ্র তৃতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে মাহিষ্য ছিলো ২৩,৮১,২৬৬ জন, নমঃশূদ্র ২০,৯৪,৯৫৭, রাজবংশী ১৮,০৬,৩৯০, কায়স্থ ১৫,৫৮,৪৭৫ ও ব্রাহ্মণ ছিলো ১৪,৪৭,৬৯১ জন;
সুরঞ্জন রায়, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উৎস অনুসন্ধান : একটি পর্যালোচনা,' *গণমুক্তি*, দশম উদ্যোগ, মার্চ ২০০৯, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংখ্যা, পৃ. ২৩

২. কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল সম্পাদিত, 'মতুয়া ধর্ম-আন্দোলন কী এবং কেন,' *মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গ*, কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০১০, পৃ. ৬

৩. মতুয়া সাধক গোপাল সাধুর একাধিক জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থগুলো : ১. *শ্রীশ্রীগোপাল চাঁদ লীলামৃত* ১ম খণ্ড (১৩৯০), ২. *শ্রীশ্রীগোপাল চাঁদ লীলামৃত* দ্বিতীয় খণ্ড (অপ্রকাশিত)। রচনা করেন জগবন্ধু মিশ্র। ৩. *সোনার মানুষ গোপাল সাধু* ১ম খণ্ড (১৯৯২) ও ৪. *সোনার মানুষ গোপাল সাধু* ২য় খণ্ড (অপ্রকাশিত)। রচনা করেন আচার্য মহানন্দ হালদার; বিরাট বৈরাগ্য, *মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১২০

৪. মহানন্দ হালদার মতুয়া ধর্মের একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ। তাঁর জীবন ও অবদান সম্পর্কে গদ্যে-পদ্যে চারটি জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ১. শ্রীনিতাই চাঁদ মণ্ডল– *আচার্য মহানন্দ হালদার* (গদ্যে), ২. শ্রীসুকুমার হালদার– *কবিশেখর আচার্য মহানন্দ হালদার* (গদ্যে), ৩. শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ হালদার– *মহানন্দ জীবন গাঁথা* (গদ্যে কিন্তু অপ্রকাশিত) ও ৪. কুমুদবিহারী বৈদ্য– *মহর্ষি মহানন্দ চরিত সুধা* (পদ্যে); বিরাট বৈরাগ্য, পৃ. ১২৫

৫. নরেশচন্দ্র দাস, *নমঃশূদ্রসম্প্রদায় ও বাংলাদেশ*, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮

৬. অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলার ভাবান্দোলন ও মতুয়া ধর্ম*, ঢাকা, গতিধারা, ২০০৭, পৃ. ২২০

৭. তদেব, পৃ. ১২১-১২৬

৮. স্বরোচিষ সরকার, কবিগান : *ইতিহাস ও রূপান্তর*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৩৪৭-৪২২

৯. যতীন সরকার, 'বাঙালির লৌকিক ধর্মের মর্মানুসন্ধান,' *গণমুক্তি*, ৯ম উদ্যোগ, মার্চ ২০০৮, বাংলার লোকধর্ম সংখ্যা, পৃ. ৪৪

১০. কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল সম্পাদিত, পৃ. ৬

১১. *তদেব*, পৃ. ৯৩

১২. *তদেব*, পৃ. ৯৩

১৩. শ্রীসন্তোষকুমার বারুই, *প্রশ্ন উত্তরে মতুয়া ধর্ম*, বর্ধমান, ২০১৬, পৃ. ১১

১৪. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৯৪৯

১৫. রাজশেখর বসু সংকলিত, *চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান*, ঢাকা, জিজ্ঞাসা, পৃ. ৪৫০

১৬. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর সম্পাদিত, *সমাজ জাগৃতি গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া আন্দোলন*, কলকাতা, নিখিল ভারত প্রকাশনী, ২০১৬, গ্রন্থ প্রসঙ্গে দু'একটি কথা, পৃ. ১০

১৭. ধর্মের প্রধান অর্থ কর্তব্যকর্ম, দ্বিতীয় ধর্মের ফল, তৃতীয় অর্থে বস্তুর স্বভাব, গুণ, শক্তি বোঝায়; চতুর্থ অর্থ 'ঋত' বা নিয়ম। নিয়ম ও শৃঙ্খলার দ্যোতক হলো ঋত;
অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ১৬-১৭
'ঋগ্বেদে যে 'ঋত' শব্দটি আছে তা যেমন 'ধর্ম'-এর প্রতিশব্দ, তেমনি 'সহজ'-এরও। বিশ্বের প্রাকৃতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলাই হচ্ছে 'ঋত'। এই 'ঋত' আর 'সহজ' অভিন্ন; যতীন সরকার, 'বাঙালির লৌকিক ধর্মের মর্মানুসন্ধান,' *গণমুক্তি*, ৯ম উদ্যোগ, পৃ. ২৯

১৮. যতীন সরকার, *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭, পৃ. ১৬৭

১৯. "As folk religion exists between official religion and traditional folkculture, it exists in relation to and intension with organized religions." *Encyclopedia of Folklore and Literature*, Edited by Mary Ellen Brown and others, ABC-CLIO Santa Barbara, California, 1998, P. 216. উদ্ধৃত : ড. আবুল হাসান চৌধুরী, 'লোকধর্মের সংজ্ঞা,' *গণমুক্তি*, পৃ. ৮

২০. Folk religion is the folk-cultural dimension of religion, or the religions dimension of folk-culture. This can include active/creative as well as passive/ survivalist elements, it also certainly can suggest the element of tension existing between folk and official levels of religion in the complex society.
Don Yoder, *Discovering American Folklife*,U.S.A. Stackpole Books, 2001, p. 80. তদেব, পৃ. ৮

২১. ড. আবুল হাসান চৌধুরী, 'লোকধর্মের সংজ্ঞা,' *গণমুক্তি*, পৃ. ৮

২২. স্বরোচিষ সরকার, 'মতুয়া ধর্ম : অনুসারীদের যাপিত জীবন ও ধর্মদর্শ,' *গণমুক্তি*, পৃ. ৭৬

২৩. 'মতুয়া সাহিত্য সাহিত্যের ইতিহাসে আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। ধর্মান্দোলনের অঙ্গ হিসাবে "পদ-পদার্থ" রচনা বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট ঐতিহ্য। বাংলার লোকায়ত ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্য অধিকতর ব্যাপক। বাংলার লোক সমাজে বিভিন্ন সময় প্রবর্তক কেন্দ্রিক যে সমস্ত লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে তাদের প্রত্যেকেরই ধর্মান্দোলনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল নানারূপ সাহিত্য সৃষ্টি, বিশেষত সঙ্গীত রচনা, যেগুলিকে "লোকায়ত পদাবলী" নামে চিহ্নিত করা যায়।' বিরাট বৈরাগ্য, পৃ. ১৪১

২৪. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ১৪

২৫. তারকচন্দ্র সরকার, *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*, গোপালগঞ্জ, ১৪০৬, পৃ. ৬৭

২৬. বিজয় সরকার, *বিজয় গীতি*, কলকাতা, লোককবি প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১৭২-৭৩

২৭. প্রফুল্লরঞ্জন চিঠিতে লেখেন : 'পল্লীগীতি কবি প্রফুল্লরঞ্জনের শারদীয়া পূজা অবদান নাম দিয়া ১৬ পৃষ্ঠার এক ফর্মা বই ছাপিতে দিয়াছি। এক হাজার বই ছাপা হইবে। এই বই আগামী ২৭ শে আশ্বিন শনিবার পাওয়া যাইবে।' চিঠি লেখার তারিখ : ২১ আশ্বিন ১৩৫৭

২৮. প্রফুল্ল গোঁসাই, *প্রফুল্ল গীতিমালা*, বগুলা, শিল্পমালা, নদীয়া, প্রকাশ ১৪০০

২৯. প্রফুল্ল গোঁসাই, *প্রফুল্ল গীতিমালা*, বাগেরহাট, শ্রীধামলক্ষ্মীখালী, পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৬

৩০. দ্রষ্টব্য : বিজয় সরকার, *বিজয়গীতি*, কেউটিয়া, লোককবি প্রকাশন, ২য় প্রকাশ ১৪০৪, পৃ. ৩৭-৩৮

৩১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৩য় সংস্করণ ১৪০৮, পৃ. ১০৩৮-৩৯

৩২. জসীমউদ্‌দীন, *স্মৃতিরপট*, ঢাকা, পলাশ প্রকাশনী, ৫ সংস্করণ ২০০০, পৃ. ১২১

৩৩. মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লেককবি ও চারণকবি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৯৮, পৃ. ১১৩-১৬

৩৪. এ জামান সম্পাদিত *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার* প্রথম খণ্ড প্রথম পর্ব, যশোর, প্রথম প্রকাশ ৯ মে ১৯৯৫

৩৫. এ জামান সম্পাদিত *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার* প্রথম খণ্ড, যশোর, ২৭ আগস্ট ১৯৯৯, পৃ. ৯১-৯২

৩৬. এ জামান, *সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে যশোরের স্পর্শ*, যশোর, প্রথম প্রকাশ ৩০ এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ৭৫-৭৬

৩৭. মহসিন হোসাইন, *নড়াইল জেলা সমীক্ষা ও স্থাননাম*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ২০০১, পৃ. ২০৬-০৭, ২২৩-২৪

৩৮. দুলাল রায় *কালীগঙ্গা থেকে কালিয়া*, ঢাকা, আজকাল প্রকাশনী ২০০৪, পৃ. ৪৪
'আষাঢ়ের সেই ফিরে রথের দিনে/ও প্রিয়া গো তোমায় আমায় প্রথম জানাজানি।/তোমায় আমায় নিয়ে কতো হলো কানাকানি।/মেলা দেখতে গেলে সেদিন টিপটিপে মেঘ মাথে/নীলশাড়ীখান পরা ছিল ছুট্টি ছিল সাথে,/দাঁড়িয়ে ছিলে রথ তলাতে নিখিল রূপের রানী।/একটি পয়সার কাঁচা গুয়া আরাক পয়সার পান/দুই পয়সাতে কিনলে ঠাকুর জগন্নাথের পান/এক দেখাতে দুইটি পরাণ বাধলো টানাটানি।'

৩৯. শেখ মিজানুর রহমান সম্পাদিত, *লোককবি প্রফুল্ল গোঁসাই*-এর গান, ঢাকা, শ্রাবণী প্রকাশন ২০১৫

৪০. সুরঞ্জন রায়, *কালিয়া জনপদের ইতিহাস*, ঢাকা, র‍্যামন পাবলিশার্স ২০১৬, পৃ. ২৮৪, ৩২৭-২৮

৪১. সুরঞ্জন রায়, 'কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষার গান : লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন,' *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল* ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩, পৃ. ৯১-১১

৪২. সুরঞ্জন রায়, 'বিজয় সরকার ও প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বৈচিত্র্য ও বিষয় সমতা,' *শিল্পকলা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা*, ত্রিত্রিংশ বর্ষ, ১ম ও ২য় যুক্ত-সংখ্যা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ২০১৫ খ্রি., পৃ ২১-৪৬

৪৩. *কালিঙ্গা*-১৪২১

৪৪. প্রভাতকুমার মল্লিক, 'বিশ্বম্ভর মল্লিক ও তাঁর বিদ্যালয়,' *কিশলয়*, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, বয়ারভাঙ্গা বিশ্বম্ভর মল্লিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় বার্ষিকী,পৃ. ১৪-১৫

৪৫. মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ১১৩

৪৬. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর*, পৃ. ৩৮৩

৪৭. বিরাট বৈরাগ্য, পৃ. ১৫৬

প্রফুল্লরঞ্জন কৃত পাণ্ডুলিপি থেকে গানটির একটি শুদ্ধ রূপ উদ্ধৃত হলো :

কবি রসরাজ তারক চাঁদ রে আমি শত কোটি প্রণাম জানাই আজ তোমারে।
তুমি কবি চূড়া মণি কাব্য রসের মণি প্রেমের পরশ মণি সংসারে ॥
তুমি কবি বাল্মীকি ছিলে ত্রেতায় লিখিলে রামায়ন অমর ভাষায়
তুমি দ্বাপরেতে বেদব্যাস, সুধীজন বিশ্বাস, কবি রসরাজ এইবারে ॥
শ্রীহরিলীলামৃত লিখিয়া, অমর হয়েছ মরণ জিনিয়া,
যতো ভক্ত চকোরগণে, সুধা আস্বাদনে সাঁতার খেলে সুখের পাথারে ॥
দেশে দেশে গেয়ে কবিগান, সবারে করেছ কতো আনন্দ দান
তোমার হরিবর মনোহর, ছিলো কবি সুধাকর জগৎ মাতালো কবির ঝঙ্কারে ॥
কে বলে তুমি নাই গোসাই কীর্তিমানের কভু মরণ নাই
তুমি মহাসংকীর্তনে নাচ অনুক্ষণে, আছ লীলামৃত মাঝারে ॥
প্রফুল্ল কয় শুন অধম তারণ, তব কাছে এই আকিঞ্চন,
তোমার পতিত তারণ নায় তুলে এই অভাগায় নিয়ে যেয়ো ভবসাগর পারে ॥

৪৮. ননী গোপাল দাস, *কবি রসরাজ তারক গোঁসাই*, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ১৭৫

৪৯. বিরাট বৈরাগ্য, পৃ. ১৫৬ ও ১৭৮

৫০. তদেব, পৃ. ১৭৪; গানটির উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

সাধ করে মোর পোষা পাখি শিকল কেটে উড়ে গেছে।
আমি কেন বিদেশে বেড়াই ঘুরে, কোন দেশে মোর পাখি আছে ॥
পাখি আমার থাকতো ঘরে, দিবানিশি হরি বলে, তাপিত অঙ্গ জুড়াইয়েছে।
সে অবধি উড়লো পাখি হরিনাম শুনিনা কারো কাছে ॥ ...
পাখির সঙ্গ ধরবো ছিল আশা, প্রেম তরুলতায় বাঁধবো বাসা,
প্রেম পিপাসা রয়েছে। আমার স্বভাব দোষে সকল নাশে,
আশা তরুর মূল ভেঙ্গেছে ॥

৫১. ... আগে যদি যেত জানা, / জঙ্গলা কভু পোষ মানে না,
ওর সঙ্গে প্রেম করতাম না, / এখন আর না দেখি উপায় ॥
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ৫৬৬

৫২. বিরাট বৈরাগ্য, পৃ. ১৭৯

৫৩. তদেব, পৃ. ১৭৯

৫৪. তদেব, পৃ. ১৫০

৫৫. তদেব, পৃ. ১০৯-১০

৫৬. মহানন্দ হালদার, *শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত*, বাগেরহাট, ২০১০, পৃ. ২০৬-১৯

৫৭. গুরুচাঁদ ঠাকুরের পারিষদবর্গের মধ্যে বিপিন, যাদব ঢালী, যাদব বিশ্বাস, নেপাল, তারিণীচরণ (ডাক্তার, কৃষ্ণপুর), যজ্ঞেশ্বর, শ্রীবিধু চৌধুরী, রামতনু বিশ্বাস (পদ্মবিলা), শ্রীদেবীচরণ, ধনঞ্জয় (পাতলা), শ্রীরাইচরণ (বাসুড়িয়া), যাদব মল্লিক, অশ্বিনী গোঁসাই, গোপাল গেঁসাই, রমণী গোসাই, বাবুরাম, মাধবেন্দ্র, সনাতন, বিচরণ, শ্রীষষ্ঠীচরণ, চণ্ডীচরণ, হরিবর, জগদীশ, কুমারেশ, হরিপাল, অক্ষয় চক্রবর্তী, মহেশ বেপারী, শ্রীনাথ মণ্ডল, শ্রীমাধব, সূর্যনারায়ণ, হাদান, বদন রায়, তপস্বী রাম, দেবীচাঁদ, তারকচাঁদ, মহানন্দ প্রমুখ।
তদেব, পৃ. ২৩৪

৫৮. গানটি : প্রেম সাগরের চাঁদ উঠিল/ ওড়াকান্দী শ্রীগুরুচাঁদ।
এমন চাঁদ যে দেশে এলো/ তারাই জানে চাঁদ ধরা ফাঁদ ॥
দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনে/ যুগে যুগে আসেন প্রভু জীবের কল্যাণে
এবার লয়ে পার্ষদগণে/ দিতে এলেন ভক্তি প্রসাদ ॥
শুদ্ধ চিত্ত গৃহীর যে স্বভাব,/ দারা পুত্র কন্যা নিয়ে দেখালেন সেই ভাব।
যার নাম নিলে হয় লালিত্যভাব / রূপ দেখে হয় মনে আহ্লাদ ॥
জাতি ধর্মের গণ্ডী ভেদাচার, / প্রেম বন্যায় ডুবাইয়া করলেন একাকার
এবার ঢেউ লেগে সেই প্রেম বন্যার/ভাঙ্গলো এপার ওপারের বাঁধ ॥
বাক্য সুধা শ্রী অঙ্গের বাতাস/ গোলকচাঁদ হীরামন পেলো সঙ্গে ক'রে বাস।
চকোর রসরাজের পুরিল আশ / প্রফুল্ল তুই আঁধারে কাঁদ ॥ (১৯/১০/১৩৫২)

৫৯. তারকচন্দ্র সরকার, *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*, ওড়াকান্দি, ১৪০৬, পৃ. ৩৬

৬০. ননী গোপাল দাশ, *মায়ের বরপুত্র কবি-রসরাজ তারক গোঁসাই*, নড়াইল, ১৯৯৮, পৃ. ৭

৬১. নন্দদুলাল মোহান্ত, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, কলকাতা*, ২০০২, ভূমিকা

৬২. স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের কবিগান : উত্তরাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য,' *বাংলা একাডেমী বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৪১

৬৩. 'কবিগানের নবজাগরণ/ তারকচন্দ্রের প্রবর্তন/ এই পূর্ব বাংলায়। ... কবিগানের সুপ্রভাত/ ধূলায় স্বর্গের পারিজাত/ ফুটালো তারক রসরাজ।/ কবিগান সেই পর্ব হতে/ নূতন এক ভাবস্রোতে/ করছে উত্তুঙ্গে বিরাজ।' বিরাট বৈরাগ্য, পৃ. ৫৩৯

৬৪. অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলার ভাবান্দোলন ও মতুয়া ধর্ম*, পৃ. ১৯৬

৬৫. সাক্ষাৎকার : নিতাইদাস বিশ্বাস (৮০), পিতা : অর্জুনচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম : ছোটকালিয়া, নড়াইল। তারিখ : ১১.০৯.২০১৭

৬৬. অশ্বিনীকুমার সরকার, *শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত*, ওড়াকান্দি, ১৩৬২, ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

৬৭. পূর্ণচন্দ্র রায়, *শ্রীশ্রীপোলাদ লীলামৃত*, প্রথম প্রকাশ ১৭ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ১৫৭

৬৮. শুধু *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*-এর সূচিপত্রে ১১ বার 'মহাপ্রভু' শব্দটির প্রয়োগ মনে করিয়ে দেয় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। আর হরিচাঁদ ঠাকুর যে চৈতন্যদেবের অংশ সে বিষয়ে লীলামৃতে উল্লিখিত হয়েছে :
...এ সময় গৌরাঙ্গ করিল অঙ্গীকার। /তোমাকে ছাড়িতে মাতা শক্তি কি আমার ॥
শোধিতে নারিব মাতা তব ঋণভার। /জন্মে জন্মে তব গর্ভে হ'ব অবতার ॥

ধর্ম সংস্থাপন আর জীবের উদ্ধার। /এরূপে লইব জন্ম আর দুইবার ॥...
আর এক জন্ম বাকি রহিল প্রভুর। /এই সেই অবতার শ্রীহরি ঠাকুর ॥
তারকচন্দ্র সরকার, *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*, পৃ. ৩-৪

৬৯. বিরাট বৈরাগ্য, দ্র. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীকৃত ভূমিকা, পৃ. (ix)

৭০. দেবাশিস মণ্ডল, 'মতুয়া ধর্ম-আন্দোলন কী এবং কেন' *মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে*, পৃ. ৫

৭১. সাক্ষাৎকার : নিতাইদাস বিশ্বাস (৮০), পিতা : অর্জুনচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম : ছোটকালিয়া, নড়াইল। তারিখ : ১২.০৯.২০১৭

৭২. অরবিন্দ বাগচী, যিনি একটানা চৌদ্দ বছর কৃষ্ণলতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে করনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তিনি *গোবিন্দ স্মৃতি* নামে ১১১ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। (খুলনা : ১৪০৭)। গ্রন্থাকার এ গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি :

লুকায়েছ তাই খুঁজিছি তোমায়/ দেখিতে তোমার খেলা,/ পূজিতে চরণ নয়ন জলে/ জুড়াতে জীবন জ্বালা।/ নিরাশ হয়েছি পাইনি তোমা/ হয়েছি দিশে হারা,/ রিক্ত হস্তে ফিরে যাব বুঝি/ হয়েছি জীর্ণজারা।/ ভেবেছি জীবনে হলনা দেখা/ ডুবে যায় মোর বেলা,/ একটু পরে নাবিবে আঁধার/ ফুরাবে মর্ত্য খেলা।/ তবু চেয়ে রই কোথা তুমি আছ/ যদি বা দেখা পাই,/ তোমারই ধন তোমাকে অর্পিব/ আমার যে কিছু নাই।/ অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব মিটিল/ দেখিলাম তোমায় আমি,/ লুকাও নাই গুরু, ভক্ত হৃদয়ে/ দাঁড়ায়ে হাসিছ তুমি।/ ভক্ত ছাড়া নহে কো তুমি/ ভক্তাধীন তুমি জানি,/ ভক্তের হাতে তাইতো অর্পিলাম/ তোমারি স্মৃতি খানি।

৭৩. শামসুজ্জামান খান, *আধুনিক ফোকলোর চিন্তা*, ঢাকা, নবরাগ প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৩৮

৭৪. স্বরূপেন্দ্র সরকার, 'মতুয়াদের মেলা,' *ধানশালিকের দেশ*, ২৫:২, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৯৮

৭৫. শামসুজ্জামান খান, পৃ. ৪০

৭৬. বিরাট বৈরাগ্য, পৃ. ১৪১-৪৩

৭৭. বর্তমান নিবন্ধকারের কাছে এরকম মতুয়াধারার তিনজন কবির গান সংরক্ষিত আছে

৭৮. এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য : সুরঞ্জন রায়, 'কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষার গান : লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন,' *বাংলাদেশ আইবিএস জার্নাল*, পৃ. ৯২

৭৯. এ যাবৎ কালের উল্লেখ থেকে জানা যায়, বিজয় সরকার মাত্র চারটি মতুয়া সংগীত রচনা করেন। তাঁর গানের মুখ পদগুলো :

1. আমার হরিচাঁদের অপার লীলা দেখে যা তোরা
সে যে অপরূপ রূপের ছবি দেখলে যায় না পশরা।
2. বিপদের কাণ্ডারী রে আমার কাঙ্গালের বান্ধব রে ঠাকুর
হরিচাঁদ মোর জীবনের ধন।
3. কবে শ্রীধাম ওড়াকান্দি যাব রে
ওরে আমার পরাণ কান্দে হরিচাঁদ বলে ও
4. ওড়াকান্দি শ্রীধাম আজি, নবযুগের আনন্দ ভবন
এল প্রপঞ্চের মঞ্চ পরে– প্রপঞ্চাতীত মানুষ রতন।

চতুর্থ সংখ্যক গানটি বিজয় সরকারের কোনো রচনাবলির মধ্যে পাওয়া যায়নি। গানটির সন্ধান পাওয়া গেছে বিরাট বৈরাগ্য সম্পাদিত *মতুয়া স্মরণিকায়*;

বিরাট বৈরাগ্য সম্পাদিত, *মতুয়া স্মরণিকা*, প্রথম প্রকাশ ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ.৪৯-৫০

৮০. বিরাট বৈরাগ্য, পৃ. ১৭৯

৮১. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, ঢাকা, বিভাস ২০১০, পৃ. ১২

৮২. তদেব, পৃ. ১৪৩

৮৩. স্বরোচিষ সরকার, *কবিগান : ইতিহাস ও রূপান্তর*, পৃ. ১২-১৮

৮৪. তদেব, পৃ. ২৬৭, ২৭২-৭৩, ২৮৬

৮৫. তদেব, পৃ. ৩০৩-০৪

৮৬. ব্রজসুন্দর সান্যাল, *মুসলমান বৈষ্ণব কবি*, ভূমিকা দ্রষ্টব্য। উদ্ধৃত : ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৮০, পৃ. ১৭২-৭৩

৮৭. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পৃ. ২৯; উদ্ধৃত : ওয়াকিল আহমদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, পৃ. ১৭৩

৮৮. এ বিষয়ে দুজন বয়সী ব্যক্তির মতামত। প্রথমে নিরোদবিহারী শিকদারের। তিনি ১৯৪৬ সালে ফরিদপুরের রামদিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করেন। তিনি প্রফুল্লরঞ্জন সম্পর্কে বলেন যে, তিনি ছিলেন খুব ন্যায্যবাদী লোক। ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস করতেন না। সাক্ষাৎকার : নিরোদবিহারী শিকদার (৮৮), প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ইন্দুহাটী নেপালচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাতলা, তেরখাঁদা, খুলনা। তারিখ : ২৭.০১.২০১১

প্রফুল্লরঞ্জনের স্নেহভাজন নিতাইদাস বিশ্বাস বলেন যে, তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেছেন। সেখানে ভাগবত আলোচনার পাশাপাশি তাঁর গানও পরিবেশিত হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে আঁধারের রূপ দেখে দেখে তাঁরা কালিয়াতে ফিরতেন। তাঁর গানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অনেক কষ্ট করতেন তিনি। তিনি মতুয়া, বৈষ্ণব, পোলাদ গোঁসাই, গোবিন্দ গোঁসাই, এমনকি জয়পুরে রসরাজ তারকচন্দ্রের জন্ম ভিটায় গেলেও কখনও এঁদের মত গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন অদীক্ষিত। ধর্মের কোনো নিয়ম মানতেন না। সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি কাপড় পরতেন। মাথায় বেশি চুল ছিলো না। তবু লোকে কেন যে তাঁকে 'গোঁসাই' বলে সেটাই খটকা। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর গান পরিবেশিত হোক এ রকম ইচ্ছে থেকেই গানের শিল্পীদের নিয়ে হাজির হতেন। ধর্ম বলতে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী এবং সংস্কারমুক্ত একজন মানুষ। সাক্ষাৎকার : নিতাইদাস বিশ্বাস (৭৯), অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছোটকালিয়া, কালিয়া, নড়াইল। ২৯.০৯.০২০১৭ মহানবমী

৮৯. ডাকলে যেজন কাছে এস পুজো খায়
জাগ্রত সেই নর নারায়ণ অঞ্জলি দাও তারি পায় ॥
শুন বলি মর্মকথা মানুষ বর্তমান দেবতা
শোনে কথা, বোঝে ব্যথা, হাসে, কান্দে, নাচে গায়–
বিধি দিয়ে মনের মায়া, গড়েছে মানুষের কায়া,
পেয়ে মানষের শীতল ছায়া সকল জ্বালা দূরে যায় ॥

প্রিয় হতে প্রিয় জানি মানুষেরে ডেকে আনি,
ধুয়ে দিয়ে পা দুখানি মুছাও অঞ্চলের সীমা
সাজায়ে দাও বরণডালা, দিয়ে গন্ধ কুসুমমালা
উলু দাও সব কুলবালা সাক্ষাৎ ঠাকুর বেদিকায় ॥
যা জোটে তাই ভক্তি ভরে সাজাও ভোগের থালার পরে,
মেখে মেখে নিজ করে খাওয়াও যেমন খাওয়ায় মায়;
সেবায় শান্তি সাধুর বচন, পূজা তো সেবার আয়াজন,
তুষ্ট হলে মানুষের মন, দেবগণে ঘন্টা বাজায় ॥
কোন যুগে ছিল সংসারে, আজ গেছে কোন স্বপন পারে
ডাক দিলে না আসে ধারে কী ফল তাদের সাধনায়?
প্রফুল্ল কয় তাদের কাছে, যা ছিল তা আজও আছে
যে বাতাস ভারা দিয়াছে লেগে আছে মানষের গায় ॥

৯০. মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রসঙ্গে আলাদা করে রচনা করেন ২২টি গান। শাক্তপদাবলি লেখেন ২৬টি। ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদ, মনশিক্ষা মিলিয়ে লেখেন ২৩০টি গান। – প্রাবন্ধিক

৯১. শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর সম্পর্কে রচনা করেন :
চির সুন্দর মনোহর প্রিয়তম / নমো নমো বিভু নমো নমো
নিখিল ঈশ্বর তুমি নিরুপম ॥ ...
প্রফুল্ল কয় প্রিয় শুধু এই নিবেদন / ভাব রসে ডুবাইয়া রাখো মোর তণুমন,
কামনারে কর পদ সেবিকাসম ॥

৯২. এ জাতীয় গানের সংখ্যা ৫৮টি। – প্রাবন্ধিক

৯৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং ২০১৫, পৃ. ২৭৮-৭৯

৯৪. শামসুজ্জামান খান, পৃ. ১৪৬-৪৭

৯৫. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮৫

৯৬. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, *নৃবিজ্ঞানের রূপকথা*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৬, ১৮; উদ্ধৃত : নাজমুল হক, *উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ৮

৯৭. *Radcliff Brown, Method in Social Anthropology*, Chicago, 1954. p. 22. উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ৯
It will be only an integrated and organized study in which historical studies sociological studies are combined that we shall be able to reach a real understanding of the development of human society.

৯৮. *লোকশ্রুতি*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ. ৮০

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

English Section

Contents

- Rabindranath's Painting : A Quest for Modernism in Art
  Sharif Atiquzzaman 161-166
- Substantiating the 'Female' Sexuality as well as Prostitution beyond the Mere Sexual 'Thing'
  Rupsa Mukherjee Banerjee 167-181
- Demystification of Islamic Fundamentalism and Patriarchy in Tahmima Anam's Novels from a South Asian Feminist Perspective
  Dr. Sabreen Ahmed 182-193
- Challenges of Mental Wellbeing of Digital Native Adolescent : Promotion of Mental Health
  Dr. Mrinal Mukherjee 194-213
- Study of Socioeconomic Status of Fishermen by the Riverside Areas of River Nabaganga and Kaliganga at Jhenidah of Bangladesh
  DR. Bidhan Chandra Biswas 214-219
- Usage of ICT in Medical Libraries of Bangladesh with Special Reference to icddr,b Library: An Investigation
  Md. Harun-Or-Rashid Khandaker, Md. Shafiur Rahman, Muhammad Hossam Haider Chowdhury, Farzana Sultana & Dr. Md. Nazim Uddin 220-246

Volume -2, Issue-1, 2020

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 161-166

Rabindranath's Paintings : A Quest for Modernism in Art

Sharif Atiquzzaman
Professor of English, Vice Principal, Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh
email:sharifatiquzzaman@yahoo.co.uk

Abstract

Rabindranath's paintings, the last harvest of his genius, were first exhibited across Europe, Russia and the United States in the 1930s. The distinctive features of his artworks played an important role in transforming Indian art. Picking up the brush late in life, he created more than 2500 artworks and proved himself a prolific painter. Different in many ways, Tagore's paintings that included distorted figures, heads, beasts, snakes, flowers, masks, mysterious landscapes, etc., were the first attempts made in India to welcome various expressions of European modernism, and these have stood the test of time. Imagination had a greater role in his art that discarded academic rendition. This essay focuses on the uniqueness Tagore created through his paintings though he lacked technical excellence essential for artistic achievement and on the challenges he met in an attempt to change the taste of Indian art connoisseurs who usually loved naturalistic criteria of colonial art.

Keywords

Rabindranath Tagore, art, modernism, nationalism

Introduction

When Rabindranath Tagore sailed in with painting in 1928, he was sixty-eight, a very unusual age to plunge into a new creative medium, but Tagore, in doing so, took centre stage as the pioneer of modernism in the history of Indian arts. But it was not his first try at engaging himself in painting. It is Nandalal Basu who made us know that once Tagore, in his youth, dabbled in paintings but he could not continue for long due to his too much devotion to literature and music. But the spark in him did not die down as he would live in an atmosphere of art and culture in *Jorashanko* where Gunendranath, Jotirindranath, Gagonendranath and Abanindranath, four prominent figures of the art-world were brought up. Among them, Abanindranath was the leading artist who dominated the Bengal art world with his thought and vision.

Trends of Early Indian Arts and Changes under the British Imperialism

The earliest tradition of Indian art was mainly produced by the Indus valley civilization. They created small terracotta and bronze figures of humans and animals. The rise of Buddhism paved the way for the art based on religious themes, basically in the form of stone and bronze sculptures. Simultaneously, experiments with the creation of vast temples carved in stone and decorated with Greek influenced columns continued. Hinduism was a main focus of Indian art for centuries in India. Islam drew importance under the Mughal emperors during the 16th century, and art production gained new momentum for getting their patronage.

The establishment of the British Empire in the 18th century and the subsequent westernization of India prepared the ground for a radical change of artistic taste, and a new trend of art emerged. The British colonial rule had a great impact on Indian art. Under British Imperialism, painting in India took on many western characteristics throughout the 18th and 19th centuries. Toward the end of the 19th century, rising nationalism attempted a conscious revival of Indian art.

The Bengal School and Its Narrow Nationalism

The *Bengal School of Art* arose in the early 20th century as a progressive and nationalist movement reacting against the western academic art styles; instead, it encouraged a revival of paintings such as the Mughal miniatures. When more artists started using western ideas of composition, perspective, and realism to illustrate Indian themes, others rebelled against these styles. It was led by Abanindranath Tagore though he had his initial art training with European artists and supported by Ernest Benfield Havell, the then principal of Calcutta Art School. Havell was against western art style practised at that time in India and encouraged students to imitate Mughal miniatures. This caused controversy among many people:

> Havell was accused of taking retrogressive steps, and was feared to have hurt the progress of art in India. The Englishman, on the other hand, vehemently believed that a blatant western training would only ruin true Indian sensibilities, talent and thought. The cosmopolitan, liberal Tagore family along with Sister Nivedita and the art historian Coomaraswamy joined Havell to take up the task of protecting the 'cultural uniqueness' of the Indian people.[1]

Though Abanindranath built up an ideal partnership with Havell, and closely studying Mughal miniature paintings developed gradually his own style, he himself believed the term 'revival' terrifying. He had the true realisation that a past trend could not revive.

> Though he was immensely impressed by the Mughal art, the absence of emotion and feeling in the works of Mughal artists worried him. Let us not forget that Abanindranath was not only extremely sensitive, he was a talented writer, besides being highly erudite. He needed something more profound and lasting to make his art meaningful. This in fact is the first time that we encounter a twentieth century modernist concern.[2]

It was Rabindranath Tagore who felt the concern more deeply than that of Abanindranath Tagore. He neither supported his nephew nor vehemently protested against what he was doing in the name of Indian experience and sensibilities, but he felt that Indian art could get a modern complexion through a process of acculturation.

Tagore's Concept of Art

In 1920-21, Rabindranath, as a part of Europe and America tour, went to Paris where he had had the opportunity to watch the masterpieces of the Impressionists, Post-impressionists, Cubists, and Surrealists, and the close observation worked up a great enthusiasm for him, and it trimmed up the flickering wick of his aspiration to be an artist in the final phase of his life, and he started painting seven or eight years after his return from Europe. And it was contrary to all expectations that, when Tagore began to work, great Indian artists were stuck to the naturalistic or realistic trend of art. They were busy with painting landscapes or seascapes, portraits and mythology based works with ornamentation. Rabindranath Tagore adopted the styles of European modernism, mixed it with the Indian-tradition and gave a new vivacity to its rich heritage. 'As he remained an outsider, his self-exploration would find its own logic and structure within the waves of European modernism.'[3]

When Abanindranath Tagore established the **Society of Oriental Art** in 1907 to defend the tradition of Indian art, the west experienced at least five great influential art movements during the first quarter of the Twentieth-century. Fauvism (1905), Cubism (1907), Futurism (1909), Dadaism (1916) and Surrealism (1924) came into existence and brought about a change in the European tradition of art. But Abanindranath, Nandalal Basu and others renowned painters during that time were busy with painting landscapes, portraits and mythological gods and goddesses. The experiment of the cubists to draw figures by using geometrical patterns – lines, curves, triangles, rectangles, squares, circles, ellipses etc.; the fauvists' radical use of unnatural and vivid colours that separated colour from its usual representational and realistic role, giving a new meaning to the colours; the Dadaists' refusal to the established convention and the quest of beauty in ugliness; and the surrealists' aspiration to visualize dream images brought revolutionary changes and newness in the European art. But no little impact of these art movements was on the Indian artworks. They tried to build up the national character of Indian art relying only on the old tradition of art without giving any new expression to it.

> Tagore was profoundly aware of the new notions of art taking shape in twentieth century Europe. He was aware of the dialogues which recognized the context of art in other cultures and the subsequent interest of the European artists with African art, art from Oceania and the Americas. Art in Europe was shifting drastically from academism when the tribal and other non-European art appealed to creative minds revealing the

> inadequacy of cultural supremacy of Europe. A new frame of historicism was developed in European writings accepting the domain of tribal or archaic art as an alternative idiom. Tagore shared these thoughts in *Jorasanko*, while forming *Bichitra* to dialogue with folk arts.[4]

Rabindranath realised that as long as Indian art would fail to come out of the naturalistic, two-dimensional and ornamental trend, it would not get modern as well as international character. The artists that were renowned at that time did not feel the urge to give the Indian-art a modern touch. On the contrary, they advocated conventionality in the name of defending orientalism in art. Some critics liked to call it a part of nationalist struggle. 'As a polemical construct, the Bengal School came to represent a break from the prevailing norms of western academic naturalism, and espoused alternate subjective and spiritual standards of aesthetics and art-creation. In this, the claims of national authenticity were made for art, and it was appropriated Indian nationalist struggle for liberation from British rule.'[5] But Rabindranath could not accept the idea that art should carry any political agenda like nationalism. He could not follow the trend of old art form that the Bengal School tried to revive. Rather he sought an alternative in the Western modernism. Though he lacked technical skill, his artworks cannot be called an amateur's venture. He successfully devised a form of his own in his naivety. What Shankar Nataranjan, the art critic of Tamilnadu, says in this regard supports the statement:

> The art scene in the 20s was dominated by the traditionalism of the Bengali School and the academicism of Art school trained artists. Perhaps the intellectuals of that period were ignorant about Modern Art and this may be the reason for this art to be misunderstood. The narrow Nationalist ideology of abanindranath and his followers perturbed Rabindranath, And he had long ago rejected academic realism as a progressive art form.[6]

Tagore's Development as an Artist

The way he chose to work on this new creative medium was unprecedented. The *doodle* made for his frequent penning through the manuscript for correction was the beginning of his drawing, and through this playful scribble, he gave the shape and structure of birds, flowers, men and other familiar and unfamiliar objects. Perhaps this was the expression of his subconscious and unconscious state of mind though Binod Bihari finds a close resemblance of tattoos on the bodies of the Africans and Australians with these doodles. The renowned Indian artist Jogen Chowdhury in this regard says that Tagore created the forms of these figures from a sense of abstraction. Making the distortion first through scribbling, he got his desired forms afterwards, and this method is poetic and modern as well. Tagore about his innovative-method of drawing through doodle said,

> The only training which I had from my young days was the training in rhythm in thought, the rhythm in sound. I had come to know that rhythm gives reality to that

> which is desultory, which is insignificant itself. And therefore, when scratches in my manuscript cried, like sinners, for salvation, and assailed my eyes with ugliness of their irrelevance, I often took time in rescuing them into a merciful finality than in carrying on what was my obvious task.[7]

At the preliminary stage of his painting career, Tagore preferred linear design, and he was prolific in this method. He drew a lot – faces, flowers, snakes, birds, self-portrait, landscapes etc. Art-critic Satyandranath Dutta traced his weakness in drawing, anatomy and forms though a distinctive quality of rhythm, facility and vivacity is discernible in his works. Those are not imitations but completely his own creations. Anatomy is not very important for paintings. Jamini Roy in this context said that Photographic fidelity is not the aim of art. Art becomes lifeless if it becomes realism-ridden. Tagore infused life in the Indian art liberating it from the chain of realism which was the main impediment on the way of expressing inherent characteristics and beauty of the subjects. Tagore was deeply influenced by the European art after watching it and the influence was gradually visible in his artworks when he started painting. His forms, styles and novelty of themes enchanted the renowned German art critic Stella Kramrish.

> When Rabindranath himself suddenly started to painting in 1928, at the age of sixty seven, Stella was fascinated by the means he found to express impulses that were absent in his writings. In her articles on his drawings and paintings, she compares the mood of his curvilinear forms to art nouveau and to expressionism, particularly that of Edvard Munch.[8]

In fact, Tagore planted European forms on the traditional ground of Indian art. The touch of expressionism is frequent in his works. He also experimented with cubic form. Even some of his portraits resemble the African mask. Most of the critics are unanimous on the point that the influence of expressionism was great on Tagore. The feelings in individuals – fear, excitement, uneasiness, gloom, mockery, laughter, love or affection which are expressed in his works through form, color or the distortion of lines are the characteristics of expressionism. Tagore's works contain these aspects though his works are full of life and vivacity. Based on simple lines, patches of ink or colours, some of his works represent typical characters, some lead to grotesque, and expressionism supports this grotesqueness. When an artist fails to express any feeling through any visual image, he deliberately chooses the way of grotesqueness which is seemingly meaningless though it is not. Tagore made some plates which are considered fine examples of expressionism. In using colour, he did not reject the Indian or the oriental trend but attached more importance to his own preference and thought. He used colour-ink, water-color, pastel, extracts of flowers, leaves and stems as his colours as a result of which his paintings lack the quality of excellence though it did not impede to express the context of his paintings.

Conclusion

Rabindranath thought that art is not merely a skillful physical representation of form and theme. Even the quest of tradition is not the only goal, but its expression must include the self and personality of the artist. Tagore said in his Hibbert Lectures:

> For man by nature is an artist; he never receives passively and accurately in his mind a physical representation of things around him. There goes on a continual adaptation, a transformation of facts into human imagery, through constant touches of his sentiments and imagination. The animal has the geography of its birthplace; man has his country, the geography of his personal self. The vision of it is not merely physical; it has its artistic unity, it is a perpetual creation. In his country, his consciousness being unobstructed, man extends his relationship, which is of his own creative personality.[9]

Tagore experimented a lot with the forms, but what he painted was his own. Those were modern and original as well. His vision was clear, seeing Indian art with the touch of twentieth century modernism, but for a long time, he was an unsung hero and his contribution was not recognized. 'Since Indian modernism had no open dialogue, could not provide a place for Tagore, his was an unrecognized format. Tagore offers us to view an art tradition that has no antecedents in the society.'[10] Artist Jogen Chowdhury said that what Tagore painted in the thirties was not only modern in that period but also modern today, in this new century. The visual quality that we notice in his works is universal. In fact, Tagore revolting and ignoring the tradition of the oriental art paved a new way for the Indian art and created a new form which can claim the crown of modernism in a true sense.

References

1. https://eprints.soas.ac.uk/17278/1/2007/578/578_rakhi_sarkar.htm
2. Ibid.
3. https://www.academia.edu/6218673/Journey of a Painter Rabindranath Tagore
4. Ibid.
5. Debashis Banerji, *The Alternate Nation of Abanindranath Tagore*, Sage Publication, New Delhi, India, 2009, pp-xvii
6. https:// www.chennaionline.com/artscene/history/rabindranath.asp
7. Indrani Ghosh, *Pandulipi Kheya: Kichu Lipichitran*, Paschimbanga, Rabindra Shonkhya, 1402, pp-85
8. Martin Kampchen, *Rabindranath Tagore and Germany : A Documentation,* Goethe Institut, Calcutta, 1991, pp-102
9. Rabindranath Tagore, *The Religion of Man (The Hibbert Lectures for 1930)*, George Allen & Unwin, London, 1931 / 1958, pp. 132-133.
10. https://www.academia.edu/6218673/Journey of a Painter Rabindranath Tagore

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 167-181

Substantiating the 'Female' Sexuality as well as Prostitution beyond the Mere Sexual 'Thing'

Rupsa Mukherjee Banerjee
State Appointed College Teacher (Category II) of Ranaghat College, Nadia & Ph.D. Scholar of St. Xavier's University, New Town, Kolkata
E-mail : rupsarmail@gmail.com

Abstract

Women do not have bodies of their own. Ever since they have become part of the symbolic world, they have to learn that each and every sign of this symbolic world is hegemonized to go against the 'female' body as a subject and portray the 'female' as an object in the hands of the hegemonic male sexuality that is born to dominate and enjoy the female body. Be it the wife as a 'legal prostitute' or the soiled woman on the street as a 'sex-worker' into prostitution — everywhere comes the aspect of manhood conquering the female desire and aspiration of enjoyment and fulfillment. My endeavor in this paper is to go through this historical truth and throw light on an alternative 'real' truth for women (female). It is time for making the women of the Third World countries realize that they, too, can think like women of the advanced countries, the so-called advanced regions of the world (the West) who has theorized that a woman, if she wants to, can enjoy independent identity through the light of her 'plurality' of sexuality (Irigaray's concept) in contrast with the singularity of the phallus. In fact, ancient Indian society, harboring the rich history (read Her-story) of *ganikas* and *vesyas* reveals that 'Being' a *vesya* is actually a symbol of status. Now this sounds interesting. Though the courtesans also have to tolerate the enraging subjugation of patriarchal criticism, there exists a sort of 'female' power within the courtesan's game of sex-love who knew the manners of enticement to which the singular phallus fell prey to. The semiotic 'chora' (Kristeva's term) being the site of female power can only connect with the 'female' soul if the 'female' body as a hegemonic discursive element sets herself free from the hegemonic discourse analysis of female body. Now this very post-structural feminist discourse somewhere submerges within the Her-story of *ganikas* in *Kama Sutra*. I have

tried to do justice with the concept of female sexuality as a complete entity within itself that once, enacted and reenacted can subvert the hegemonic structuralist subject/object dichotomy.

Keywords

prostitution, female, sexuality, patriarchy, body, self, subject, object

Introduction

Women's sexuality has always played a vital role in constructing the society as a whole. Think of the powerful sexuality of Menaka who seduced the penance-sojourner Maharshi Vishvamitra to forget his penance and fall prey to Menaka's sexual thirst. Now this myth has shown the mighty power of female sexuality and what a 'female' body can do, if the body strives, at all, to do something. Here comes the fear of patriarchy. Patriarchy jolly-well knows this fact of over powering female sexuality. So it induces the lengthy and fearful State Apparatus to control the ever-powerful and overpowering 'female' body. Ideologically women are to retain their desires of their bodies and suppress all that relates to sex and sexuality. So, in short, women have no sexuality. 18th and 19th century women of the Third World countries have struggled with this. In fact, contemporary Third World women are also struggling with this. Albeit to Western feminism, we, the Third World women are getting more responsive about the existence of our sexual 'beings', but we need go further and think further.

"One is not born but becomes a woman" — Biology as Patriarchal Data

A post-Foucauldian analysis would enable feminists to say that a woman's body needs to get disciplined by the patriarchal norms of preening and pruning for enticing men and giving them sensory satisfaction that consequently may lead to women's sole fate of getting married. But here also lies the male conspiracy of subjugating women's sexuality before and after marriage---women are to prune and preen themselves to be the objects of desire; they can never be the subject for desire; their vaginas are to be used by and for men; their wombs are to be used for generating more and more hands for the ever-growing capitalist agenda. Even the socialist feminist of the first wave feminism of the West, Mary Wollstonecraft clearly states in her 1792 book *A Vindication of the Rights of Woman* talks about this issue of disciplining women's minds and bodies for being better wives to their husbands. (Wollstonecraft 6-10) Now with the further advancement the feminist historiography and feminist movements, the idea of 'self' of a woman gradually becomes more and more enlightened with the thought of a matured 'being'

that exists for only the self and that her biology or mind can never be the puppets in the hands of patriarchy. The idea of feminism with the body and the self in a theoretical plane has been brought forward by Simone de Beauvoir in her The Second Sex where she talks about the female self that exists with and within the data called 'biology'. (Beauvoir 33-64) The body and the self always go with each other. (Ibid.) This clearly means that a woman first, has to understand or has to realize that a 'female' body is a separate entity or 'being' that does not or cannot go by the terms of patriarchy. (Lennon) The female body as an independent entity can only construct and independent female 'self'. Without negating the corporeal body a woman can never be the being who is in constant search for the self. (Ibid.) A woman needs to know the body, the 'female' body in order to know herself. Now the body is not a mere physiological object---the flesh and blood; anatomical structure is not what a body actually is. The body is what the society creates out of the anatomical structure of flesh and blood. The making of the self contains within the prejudices of the society and societal constrains permeates into the self through the body. Beauvoir's *The Second Sex* has done a path breaking role in assessing a female body through the temporality and spatiality of patriarchy. According to Beauvoir a 'female' body is what patriarchy makes out of his discursive apparatuses. (Ibid.) The body is judged with the soil of reproductive ability and here comes Beauvoir's much acclaimed feminist line:

> "One is not born but becomes a woman" (Beauvoir 267)
>
> So body is an experience lived by a woman and not just a physiological entity. (Lennon)

"Fuck" — Theory of Patriarchal Dominance

In the fuck, the man expresses the geography of his dominance: her sex, her insides are part of his domain as a male. He can possess her as an individual — be her lord and master — and thus be expressing a private right of ownership [...]; or he can possess her by fucking her impersonally and thus be expressing a collective right of ownership without masquerade or manners.

Andrea Dworkin (Mottier 68-69)

According to Andrea Dworkin's *Pornography,* the word 'whore', its meaning and implication has been created by patriarchy. The word 'whore' is signifier of the concept of male dominance; the discursive implication is to describe a type or the trade of women to suffice a man's body (Dworkin 326). A woman's body is always subject to suppression and oppression and is an object to male sexual domination. Force is used

against women's docile bodies, and they, due to lack of female power and domination, succumbs to male power (Ibid.). Women's sexuality has always been debased and women's genitals have always been devalued as dirty and wet, invisible due to lack of phallus that is considered to be the source of power, energy and purity in male dominated society. That is why pornography is also considered to be dirty, an offshoot coming up directly from the idea of woman's genitalia being dirty. The male sexual system exploits the idea of female sexuality being dirty and thus the depiction of female sexuality is set under the sole valuation of women beings as whorish and low (Ibid.). This happens to be the politics of male sexuality. Pornographic texts (graphic depiction) depicts women as being slaves of the master man/men who can even beat and bite a female body to extract a sadistic pleasure out of it. The female bodies there seem to become too docile to revolt and doesn't have any option but to give the male whipping and biting the name of sexual enjoyment. A sadistic pleasure seems to satisfy many patriarchal minds and pornography industries gain a lot in being able to titillate the male society with hardcore brutality enthralled upon women's bodies. As Dworkin nicely says, the big bang market of pornography considers one of the primary human motivations called sex as being directly evolved from the male thought of women as filthy whores, whose dirty genitals inflict a sexual pleasure to thousands of male bodies (Ibid. 327). Here lies the danger of women's sexuality. There seems to have a little difference between the sexual pleasure of women and the sexual danger of women. A woman's sexuality always gets subjugated and used as an object by masculinity due to the lack that a woman's body carries in her body; her body does not have a full-bloomed penis but only a clitoris, a mere false representation of the powerful male penis that has the power to inject and rupture the hymen of female body. The menstrual cycle, the breaking of the hymen — all are considered as dirty and proofs of timidity of woman's body. This is the point from where male body gathers pleasure and power; a man's body is stainless and can cause bleeding from a woman's vagina. Here lies male sexual pleasure. Male sexuality derives pleasure from coition and the ultimate injury the penis gives to the vagina by breaking the vagina wall or the hymen of female body. The aim of male sexuality is, then, not physical love but the damage caused to the female body by the penis due to coition. This is the politics of sex and male sexual pleasure. Patriarchal structure bars women to talk about sexual pleasure and enjoy sex; the system engulfs woman in such a way that she is allowed to experience only sexual violence and oppression as her agency and the whole pleasurable agency is for the man. The idea that women's virginity can be robbed out gives men the sword of sexual violence against women. Sexual harassment,

rape and sexual attacks serve as a powerful and unique route to gratify male sexual privilege and depict the uncontrollable and intrinsic male lust and sexual desire.

"Sexuality" as a Patriarchal Concept

Sexual desire, sexual pleasure and sexual energy are being coded as male and sexual violence and atrocities are being coded as female (Vance 330). This leads to polarization of the concept of sexuality (Ibid. 328); one is bold and unnerving (male sexuality) and other is timid, follower of codes and conduct, and blind maintainer of social constrictions (female sexuality). The horrifying effect of sexual inequality lies not only in sexual oppression of the timid and body of female through certain constricted sexual identities (Ibid. 329). Patriarchy constantly rules out and tames female sexuality, sexual passion and desire through the discourse of maintaining virginity. The ideology set forward by patriarchy is to maintain virginity and offer it only to that man for whom the woman's body should always succumb and open up her lips to let the penis pass through her and in due course, breed children, one after another, for that man. And, woman who does not accept this ideology of the society are to be damned as whores, slut and pimps whose movements are restricted to certain red-light areas only. So, for patriarchy, virginity is an instrument (ideology) for maintaining the status-quo of patriarchy. This ideology gives to the horrifying concept of sexuality in the mind of a woman who takes up rape as a rape and not simply as another version of sexual affair that has only enjoyment at the end of the line. It falls under the patriarchal prejudice to blame women for the pleasure and lust-seeking mind of men. It is said that it is women who instigate men to lose control over them and fall prey of women --- women are eaters of men; they use their bodies to capture men and use them for their benefit. It is a patriarchal saying that a woman is woe to man whose company directs man's life towards hell. This is an easy patriarchal method of chiding women and hanging them with the charge of wooing men till death. Here also the body of a woman becomes docile where they have no other option but to represent their bodies as agents of seduction for men. Patriarchy forgets about women's *jouissance* and the way female bodies are powerful all by themselves to provide satisfaction to their own selves.

"Whore" as "Bitch" — Blame it on Patriarchy

Patriarchy says that woman uses her body to grasp men. The whorish attitude of a woman generates from beauty and sexuality that have been dispersed in every nook and corner of her body. She is whore because she has got beauty; she has got beauty,

and so she uses it to kill and munch man; she has beauty, lust and thirst that cannot be quenched by any one man, and so she is a whore, a bitch who exposes her beauty to hypnotize men whom she can exploit and enjoy. A typical patriarchal slogan would go like this. In actuality, men always want to grasp women's beauty and concretize it for their own benefit; they capture women's beauty, hence body, create sexual slaves out of the woman's body and enjoy their bodies for actualizing their bodily power and sexuality. They suppress and curb women's sexuality for actualizing their sexualities and exert power and pressure on women (whores). Patriarchy says that girls deck themselves up with revealing and transparent dresses only to provoke and seduce men; girls themselves titillate men to go for physical relationships even at the cost of their precious virginity. But from a humanist and psychological ground this flaunting of physicality and beauty is absolutely normal for women of seventeen to twenty-five years. Women of this age group remain at the zenith of their feminine beauty, passion and fertility. It is very common for young women to wear dresses that partly reveal and partly conceal traits and notion of voluptuousness. Young women flaunt and advertise their immensely passionate bodies only to establish the supremacy of the sexual appeal of feminine body; it is present throughout in contrary to a male body that focuses only on penis. It is true that exposure and flaunting of female sexuality (whorish attitude) can only grasp a man and make him timid and obedient towards the female navel whereby, an angel in the house image of a woman is strictly restricted to gain overwhelming patriarchal societal appreciation and familial charisma outside bedroom (Bhaduri 5).

This might be an exaggerated comment. In actuality, an angel in the house can never be a whore only at night in the bedroom and vice versa (Ibid.). In ancient times, women who have got wit and talent and knowledge about art and culture were never to be regarded as angels in houses. Women endowed with beauty and passion mixed with wit and artistic knowledge was considered as courtesans.

Time for Subverting the Patriarchal Hegemony

Prostitution called for merging together the two primary principles of human life that are known to be freedom and love. Radical feminists of the West uncoupled sexuality and reproduction and thus hails to the occurrence of sex and sexuality as a bread and butter phenomenon. Men and women were to liberate their natural sexual desires and talk freely about sex and bodily desires in order to subvert the repression of sex and consequently subvert the political and social authority of the capitalists and stop repression of the bourgeois. This sexual permissiveness and freedom of sexual desire

lead to gender neutrality --- women became as much grand lovers of sex as men. During the 1960s there emerged some consciousness raising groups that asked women to explore their bodies, bodily powers and capacities as unique in contrast to men. Women were encouraged in masturbating through vibrators (Mottier 57).

The slogan 'personal is political' problematized the notion of sexuality by saying that all the private and personal bedroom matters between men and women are not personal as behind this sex lies the political matter of power. Oppression and suppression of female bodies, and thus female minds become the sole notion of male sexuality. Sex is used only as a tool of curbing women and taking away all her power. There emerged the powerful feminist books by Kate Millet *(Sexual Politics)* and Germaine Greer *(The Female Eunuch)*. Thus, we come to hear the famous statement by Anne Koedt ('The Myth of the Vaginal Orgasm'):

The concept of vaginal orgasm has been analyzed from the standpoint of male oppression and exercise of power on women. Second-wave feminism talked about sexual liberation as the key door for women for experiencing sociopolitical liberation.

"This Sex Which Is Not One" — Subverting the "Natural"

Feminists campaign against heterosexuality and criticized the institution for giving more privilege to men than women. Here comes the issue of plurality of women's sexuality as put forward by Irigaray in her essay, "This Sex Which Is Not One". In the essay Irigaray talked about the sexuality of women being plural as opposed to the single male phallus. Women have sex diffused everywhere in her body. Her breasts, thighs, clitoris, and labia — all submit to sexual feelings and induce pleasure in women. According to Irigaray, the constant rubbing of the lips of vagina itself gives women a sexual sensuality that a man cannot provide. Thus ushers in the era of the celebration of clitoris as opposed to the patriarchal notion of sexual satisfaction of the vagina only. Lesbianism is a political version of female sexuality that identified woman as complete in herself as opposed to the patriarchal notion of female sexuality attaining completeness only when the penis ruptures and fucks vagina. The voice of female sisterhood emerged through Radical lesbians who said that women's energies must flow for their sisters and not for their oppressors (Ibid. 65). Adrienne Rich and Sheila Jeffreys considered lesbianism as a mode of resistance against patriarchy. A radical form of 'lesbian separatism' developed from lesbianism that talks of exclusion of not only men but also heterosexual women and form a group that consists solely of lesbians.

The liberation and understanding of the self becomes the crux of all philosophical learning (Mukherjee 203). It is true that female prostitution is the effect of advertisement for male power and rape is a form of sexual violence to negate all forms of pleasure of woman's body and mind (Ibid.). The artistic representation of female nudity also falls under the purview of male domination of female body. Contemporary liberalism does not distinguish between man and woman and claim that Rousseau's saying that all men are equal in the eyes of god is justified for men and women to be treated alike. From this viewpoint, we can say that women can liberally possess themselves as individuals and can freely display/use their bodies to ensure self-preservation and well-being (Ibid. 204). The implication is, a woman can sell her body and earn livelihood. Her sexual services should not be treated as malign but something productive in society; sexual service of a woman needs to be treated just like a man's labor that he renders for productivity. Thus, the claw of marriage that dictates that a woman's (wife's) body is only for her husband faces a big question. Carol Pateman argues that the social contract of Rousseau was strictly a fraternal contract, completely negates the need and condition of women folks (Ibid. 209). The social contract only presupposed men's exclusive control over women's bodies and making the self of a woman totally non-existent. This exclusive right of men over women's bodies guarantees women's subordination and women being the private property of men. But prostitution questions this very unproductive role of women and makes women highly productive bodies in patriarchal society through good money and precious gifts. Prostitution claimed women's independence. For this reason prostitution was excluded from patriarchy and prostitutes were regarded as witches and downtrodden beings in patriarchal society. But selling body or rendering sexual service becomes as simple as any other normal transaction in the marketplace, just like buying and selling of goods from grocer shops (Ibid. 208). For this reason prostitutes claimed to get distinguished not as flesh traders but as sex workers. A prostitute would say that she has a body, and she is using it for maintaining herself and her family. Degas emphasized the curvature and sensuality of young women in his paintings where men try to control a women's garden of beauty and passion. Degas' paintings *The Dancing Class* (1874) and *The Dance Foyer at the Opera* (1872) give the images of dancing girls in their full bloom, but they are controlled by a master with a long stick in his hand (Ibid.). The long stick is a signifier of the phallus that controls and directs the sensuality and passion of young women dancers who have to listen to the master and cannot go beyond his dictated terms (Ibid.). Control of body induces control of mind (Ibid.). Patriarchy uses this discourse of the control of body to grab control over all the socio-politico-economic aspects of society.

Prostitution as a Concept of Buying Masculinity

Prostitution, given a negative intonation by patriarchy turns out to be a positive feminist approach when a woman wants to buy and enjoy masculinity through her multiple sexual body parts by rejecting all images of the angel in the house concept that only tells a woman to be a reproductive sex-toy in the hands of only one man. Marriage is a social contract that justifies men's orderly and smooth access to women's bodies and minds (Ibid. 209). Marriage ensures the body of woman as a private property to a man, guarantees sexual oppression and nullifies the concept of rape. Thus, prostitution claims rendering service through physical labor. Patriarchy powerfully condemns prostitution and creates Ideological State Apparatus (Althusser's concept) that makes women feel guilty of going into an extra-marital relationship. Patriarchy thinks that woman's hole is the only identity she holds that can be equated easily with a man's soul (Ibid. 210). It is said that a man has a mind and a soul while a woman has only a hole. The hole seems to be an essence of a woman (Ibid.). This is a political statement of patriarchy that is thrown into the society only to condemn prostitution; once the hole is gone, the essence of a woman is gone. But only a hole can never be an essential part of a woman. Ancient *ganikas* and modern geishas hold every sort of aesthetic sense besides having multiple sexual organs (every woman has this multiplicity).

Prostitutes as Superiors in the Art of Love, Sex and Sexuality and Wealth

Ancient Indian society harbors the history of courtesans and prostitutes. They were skilled in classical art and artistry, were literate and admirably beautiful to offer pleasurable sexual services to men. *Rigveda* mentions prostitutions, about illegitimate lovers. *Rigveda* talks about spouses enjoying the company of male and female lovers. But the only difference between illicit lovers and prostitutes is that, prostitutes favor love of flesh and whatever they do, do it in lieu of money. Male partners going to prostitutes' houses and presenting costly gifts and money to them in exchange for physical love is not something very uncommon during the Vedic period. Prostitution as a profession is not something new in the society. Women who are widowed, or unable to get a suitable husband, or experienced unhappiness in wedlock often join flesh trade to make a maligned identity out of their womanhood just for mere sustenance. Women in the houses — daughters, sisters, wives, maidservants and widows — all have to depend on men for their livelihood. From this perspective prostitutes enjoy independent identities in society, living solely as givers of physical satisfaction to men and men have to present them money or gifts to make their independence a viable reason for them to live life.

Women became prostitutes from many sources; women who were prostitutes' daughters, women who were sold out by wicked mothers in lieu of money, women who had been grabbed when war ended or women who had been punished for adultery (Bhattacharji199). In fact there were women who were offered as gifts to temples and whose job was apparently to serve god but actually they became prey of priests in the temples. They were also considered under the category of prostitutes but a different name was ascribed to them for serving god. They were known as *Devdasis*. Women were used as ingredients who, in many times were allured by men to have sex with them. Vatsayana, in his book *Kama Sutra* gives information on how a virgin or a woman with chastity was seduced by a man and eventually she fell into his trap for having sex with him. Different methods were adopted by men to make a woman fall into his trap so that he didn't have to rape her but can get her easily and enjoy her body. Eventually, when he abandons her, she didn't have any options left but to adopt prostitution as the only means of survival. (Ibid.). *Kama Sutra* gives account of different types of courtesans and different categories to which they belong. There were *kumbhadasi* or *paricharika* (maid servants) who had to succumb to the master's will; *kulata* were wanton in nature; the actresses *(nati)* were also considered under the category of prostitutes. But the most famous skilled performers in the artistry of love and seduction where *ganikas* or courtesans. They held a superior status in society not only for their beauty but also due to the erudite culture they receive by nurturing knowledge in classical music and dance. She has that marketability to charge a price for the service she rendered to men. This is a sort of power that she used to get a position with the society. Foucault said that knowledge is power. *Ganikas* were knowledgeable enough to attend power over men's minds and bodies and they considered their service productive enough to charge prices from their customers. Their service was considered productive even by the state as they had to pay regular taxes. *Ganika* has the right to choose her own partner and claim charges according to her need and will. But it is also true that *ganikas* didn't have property rights, nor could they go against the wish of the royal power. *Ganikas* and *vesyas* were the status symbols of the ancient times (Ibid. 206). A man in hold of a *ganika* or *vesya* is considered to be a real man in the society. Extra-marital affairs for men were considered common. Thus, though *ganikas* were knowledgeable and educated enough, they could not go beyond the established bodily subjugation that patriarchy unleashes for women.

Commodification of women happened in extensive forms and in extensive ways in ancient India. She is sometimes a *dakshina*, fees or offering to a priest in order to show

respect and gratitude to the priest (Ibid. 206). *Mahabharata* says that in Yudhisthir's *asyamedha yajna* women as offerings were given by other kings to Yudhisthira. Women were mandatory for entertainment from time immemorial. A courtesan's association with wealth and knowledge is what gives her a distinctive role in society in relation to other women. Courtesans and their historical delineation become clear in three ancient texts in India: one is Kama Sutra by Vatsayana, the second is MṛcchaKatikai and the third one is the Jataka stories (Roy 112). My concern over here is Vatsayana's *Kama Sutra.*

Decoding the Derogatory Norms Associated with Courtesan Culture

The sixth section of Kama Sutra deals with courtesans. Here Vatsayana gives account of the *nāgaraka* (urbane man) who acted as a main figure of the society. The book talks about the hierarchical position where man (king) held the highest rank and could sleep with as many women as he wanted to. The concepts of *vannadasi* and *nagarashobhani* of *Jatakas* coincide with the concepts of *kumbhadasi* and *ganika* of *Kama Sutra* respectively. The work of these two categories of women is flexible and interchangeable as a *nagarashobhani* can act as a *kumbhadasi* and charge a fee for her service. Courtesans were even accounted for emotional blackmail and extortion of money from their customers. They do have the power to pretend to have sold all jewels due to their livelihood and extort money from their clients by adopting womanly finesse. Unlike the angels in the houses they had wealth and costly goods that they could claim to be their own property. In the age when women were deprived of property rights courtesans acted in a revolutionary manner to earn property and spend their lives according to their own terms. The property gave them *jouissance* (Barthes' concept) that was not experienced by angels in the households. Women's bodily beauty matters a lot to men. Women were expected to be beautiful, ideally from a good family, without any physical disability and completely untouched and virgin to get married to their respective partners. All the knowledge and skill of physical union were expected from men. They need to be desirous for bodily union and female bodies should be docile enough to succumb to the will of men. But *ganikas* were not that subordinate to men. They had to learn the skill of using the plural and diffusive sexuality to grab men's body and thus money. They were skilled and trained enough to use men's bodies for their own purpose of earning wealth and money. Thus, they combat the traditional female notion of docility and utilize men for their own purpose. They formulate the power for domesticating men and making men's minds and bodies susceptible to women's

beauty and emotional blackmailing. Desire forms the basis of human life, and is as important as food. Courtesans channelize this basic need of men for their favor and this is highly revolutionary in the field of power struggle. Men do not themselves know as to when they will succumb and admit completely to woman's trap of beauty, wit and knowledge and consider the world outside as highly infamous and unimportant in comparison to the woman (courtesan). Women, like other species, do not have particular mating seasons. Thus, they regulate men's sexual and emotional desires for their own social need.Vatsayana tells that even women in the household should know the tricks of controlling their respective man's sexuality by following certain procedures (norms) of sexual intercourse if they aimed to have full control over households.

Upturning the Hegemony with *Kama Sutra*

Different sexual positions have been described by Vatsayana in his book. One of the interesting positions is the *vadavaka* or the mare-like position where the woman is said to have full control over the man's penis. It is she who will hold the penis firmly in between her labia minora and direct it inside her vagina and can even rub the glans penis against her clitoris. This position claims the most active participation for women in her sexual activities. *Kama Sutra* talked explicitly about the enjoyment of female self in terms of sex and sexuality and that a woman can even take the position of a man and conceive power in her hands. A total upside-down of the power structure will happen when a woman tries this *vadavaka* position with her partner. She becomes the power here. Patriarchy says that the man is the doer and female counter part is the base (missionary position in sex). But *vadavaka* subjectivizes female as the doer and male as the base. There is the reference of lesbian relationship in *Kama Sutra*. Lesbianism has been ascribed under the basis of normality and it is synonymous to heterosexual relationship, where, it is said that one woman gains/performs the status of a man (Ibid. 328). There has been reference of a woman having sex with more than one young man. This is to be considered as the play of power between the woman and the young men where the woman plays the powerful role of a protagonist controlling the sexuality of more than one young man, but this has been ascribed as a derogatory act. The woman is known to be a *vesya* (prostitute) getting in contact with more than one man (Ibid. 329). In actuality these sorts of women do not have any sexual freedom. Patriarchal power plays in such a way that women's position gets maligned as being available for everyone, anywhere and anytime. The issue of patriarchal sadist atrocities of men with women has also been described in the text. There is reference to incidents of forcibly

pulling a virgin towards a man and kissing her passionately; there is example of beating and biting a woman by man at the time of sexual intercourse. All these signify sadism. These were given patriarchal justification as common affair in the game of sex which is nothing but a sort of combat — *kalahapurām* (Ibid.). It is also said that women should shriek and project their voices loudly while men will continue with their eight different types of beatings. Patriarchy instructs women when to shriek and shout and women were expected not to deviate from this sort of patriarchal performance. Even her cries should not be seen as pain but as expressions of sexual pleasure she is thought to be experiencing with the man. It is obvious that the violence forms an intrinsic part of man's sexuality and women, in order to maintain their existence, should retaliate positively in response to those violence. Violence against women was considered as the part of the sex game. This patriarchal code of sexual conduct (shouting and shrieking) for women was adopted by *ganikas*. They shouted and shrieked for satisfying the man's sadistic ego. The protagonist of sexual intercourse is not the *nayaka* but the ganika who at first conforms to all patriarchal sexual codes of conduct only to ensure her productivity of earning profits. The prostitute behaves like wife for her customer only to extract coins. The main difference is that a wife cannot make her sexual activity with her husband productive enough by extorting money that a prostitute can do. Moreover, she doesn't have the power of expelling her ailed husband that a prostitute can jolly well do. *Kama Sutra* advocates sexual freedom for female that, to some extent, appalled Manu. Kautilya also didn't show interest in the codes of sexual conduct of *Kama Sutra*. Laws of Manu says that a woman should always consider her husband as her god. She would never try to leave him even if he abuses her physically and mentally. *Kama Sutra*, by acknowledging that women can use their magic wands for controlling husbands, goes sharply against the anti-feminist stance of *Manusmriti* and talks in favor of women folks. *Kama Sutra* can be regarded as the first ancient Hindu feminist text that doesn't deprive women of attaining sexual pleasure.

Conclusion

It has been high time for the women of the Third World countries to establish and re-establish within themselves that they are not the passive sexual objects. 'Female' sexuality can never be a doll for the hegemony. 'Female' sexuality itself plays the existential role of 'being' when it becomes a didactic process of encountering with the self — that 'self' that Julia Kristeva always has talked about lying under the semiotic phase of the '*chora*'. (Kristeva 6-12) This search for the female self that the '*chora*' can

never be complete without knowing the constrains a female body passes by; Once the body knows what the constrains are there levied upon her (and not 'it'), then, only then can she break the shackles of the symbolic discourse for her dynamic bodily experience that can eventually lead the way to her dormant '*chora*' that is always and already there for her to complete her journey of 'being'. Descartes has already talked about the rational unification of the body with the mind (read the soul) for pure and pristine ethical conclusions. (Heinämaa 137) He didn't talk about any other rational philosophical rule for women as a race/creature that are unlike men. So, if we go by Descartes, women, as human (huWoman) beings do justice in demanding rationality of huWoman reason. In his book *The Passions of the Soul*, Descartes wisely comments that the body has to remain united with the soul. (Rodis-lewis 23) If this is true, then the true soul of female can only be discovered or, better to say, invented if the body gets freed from the hegemonic discourse. Woman needs to change her patriarchal perception of her body as a passive sexual object. Only then can she found her archaic self from within the couch of '*chora*'.

Works Cited

Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*. Translated by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier, Vintage Books, 2011.

Bhaduri, Nrisinghaprasad. *Mahabharater Ashtadashi*. Ananda Publishers, 2013.

Bhattacharji, Sukumari. "Prostitution in Ancient India". *Women in Early Indian Societies*, edited by Kumkum Roy, Manohar, 1999, pp. 169-228.

Brown, Wendy. "The Mirror of Pornography". *Feminisms,* edited by Sandra Kemp and Judith Squires, Oxford UP, 1997, pp. 379-381.

Burton, Sir Richard. *The Kama Sutra of Vatsayana*. The Modern Library, 2002.

Doniger, Wendy. *The Mare's Trap: Nature and Culture in The Kamasutra.* 1st ed., Speaking Tiger, 2015.

Dworkin, Andrea. "Pornography". *Feminisms,* edited by Sandra Kemp and Judith Squires, Oxford UP, 1997, pp. 325-326.

Heinämaa, Sara. "The Soul-Body Union and Sexual Difference from Descartes to Merleau-Ponty and Beauvoir". *Toward a Phenomenology of Sexual Difference: Husserl, MerleauPonty, Beauvoir.* Sara Heinämaa, Rowman & Littlefield Publishers, 2003, pp. 137-151.

Irigaray, Luce. "This Sex Which Is Not One". *Feminist Literary Theory and Criticism: A Norton Reader,* edited by Sandra M. Gilbert and Susan Gubar, W.W. Norton and Company, 2007, pp. 437-442.

Kristeva, Julia. *Powers of Horror: An Essay on Abjection.* Translated by Leon S. Roudiez, Columbia University Press, 1982.

Lennon, Kathleen. "Feminist Perspectives on the Body". *Stanford Encyclopedia of Philosophy,* 2 Aug. 2019, https://plato.stanford.edu/entries/feminist-body/Accessed 18 September 2019.

Mottier, Véronique. *Sexuality: A Very Short Introduction.* 1st ed., Oxford UP, 2008.

Mukherjee, Sanjib. "The Female Body and the Liberal Self". *From the Margins: Of Bodies Beings and Genders,* edited by Anirban Das et. al., Vol. 2. No.1, Margins Collective, 2002, pp. 201-213.

Rodis-lewis, Genevieve. "Descartes Life and the Development of his Philosophy". *The Cambridge Companion to Descartes,* edited by John Cottingham, Cambridge University Press, pp. 21-57.

Roy, Kumkum. *The Power of Gender and the Gender of Power: Explorations in Early Indian History.* Oxford UP, 2010.

Vance, Carole. "Pleasure and Danger: Toward a Politics of Sexuality".*Feminisms,* edited by Sandra Kemp and Judith Squires, Oxford UP, 1997, pp. 327-334.

Wittig, Monique. "One is not Born a Woman". *Feminisms,* edited by Sandra Kemp and Judith Squires, Oxford UP, 1997, pp. 220-226.

Wollstonecraft, Mary. *A Vindication of the Rights of Woman*. Dover Publications, 1996.

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 182-193

Demystification of Islamic Fundamentalism and Patriarchy in Tahmima Anam's Novels from a South Asian Feminist Perspective

Dr. Sabreen Ahmed
Assistant Professor, Department of English
Nowgong College (A Post-Graduate College affiliated to Gauhati University) Nagaon (Assam), India, PIN-782001

Abstract

Religion is a potent denominator in formulating the inner space of a Bangladeshi woman and the women writers in Bangladesh have been coming forth courageously despite the stifling patriarchal traditions against the female voice. The paper, proposes to address the determining role of the South Asian Muslim women in dismantling Islamic patriarchy and combating a fanatic Islamic faith as represented in the novels A Golden Age and The Good Muslim by Tahmima Anam, a writer from the Bangladeshi diaspora. Zenana as an Islamic institution in South Asia that segregates the sexes is not present in Anam's first novel as a physical entity but all the nuances of the spatial dimensions of a purdah society is evident in the lives of the women characters in their psycho-political journey towards self-expression . Juxtaposed between tradition and modernity they still adhere to the spatial confines of the imaginary zenana through transference of coded values, more elaborately reinforced in her sequel The Good Muslim. The Golden Age captures the language crisis aptly in the central protagonist Rehana's moaning over the loss of Urdu, in spite of her acceptance of Bengali while in its sequel The Good Muslim the issue of keeping a secular identity and an uncensored language in a growing fundamentalist Muslim State works as an agency to counter violence and repression. The Good Muslim seeks to question the reader about the notion of integrity in Islamic faith by setting the binary between the devout Muslim Sohail the fundamentalist leader of Tablighi Jamat and his blasphemous sister Maya, a progressive physician fighting her own "gender jihad" in catering to the basic gynecological needs of the poor women

of her country. The paper aims to establish through Anam that Islamic fundamentalism and patriarchy operating through the Zenana and purdah-system is a stringent apparatus of gender-discrimination and crime against women, and there is a need to counter the "Puritanical" view of Islam from a South Asian feminist perspective.

Keywords

Patriarchy, Islam, Bangladeshi Women, Zenana, South Asia, Fundamentalism

The South Asian New Woman

The South Asian New Muslim Woman bears the spatial and cultural constraints of tradition and modernity in her journey towards liberty and identity which is both political as well as psychological. South Asian feminist agenda questions the subordinate position of women in relation to male-centered dictates of religious and non-religious institutions. As mentioned in the edited version *South Asian Feminism*, feminist interventions in India, Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh address feminist responses to religious fundamentalism and secularism; globalization, labor, and migration; militarization and state repression; public representations of sexuality; and the politics of sex work while also demonstrating how feminist engagements in the region can enrich and advance feminist theorizing globally. On the other hand, Islamic Feminism doesn't touch the political foundations or the organization muscle which underlie the fundamentalist project nor can it affect substantially the economic, social and the cultural crisis of the Muslim women as a whole like the South Asian feminism. The lived experience of Tahmima Anam's heroines in her trilogy- Rehana, Maya and Zubaida portray this very crisis of a Muslim woman who is no longer tied to the idea of *izzat* or *honour* in the seclusions of the zenana but rather makes a move towards personal independence in disjunction with the "Puritanical" Islamic faith.

About the Central Character's Ideological Zenana

Zenana as a physical institution is not present in the first novel but all the nuances of the spatial dimensions of a purdah society is evident in the lives of the women discussed here who still adhere to the spatial confines of the imaginary zenana through transference of coded values. The spatially constructed ideological zenana or a wall of self-confining thoughts, works in terms of the self-retrospections in Rehana who eventually moves out of her cloistered familial space to take part in the freedom struggle. Tahmima Anam's maiden attempt is a delicate symbiosis of political and

personal issues represented through the central protagonist Rehana in her struggle to gain both selfhood and nationhood. The freedom struggle of Bangladesh, the erstwhile East Pakistan from Pakistan is juxtaposed with the personal struggle of Rehana, a young widow who bears all odds to get the legal custody of her children from her brother-in law Faiz and keep them safe with her. The novel bears a strong autobiographical lineage. Rehana is not unlike Tahmima herself, at least in her sense of identity. Rehana comes to Dhaka from Calcutta and speaks only Urdu, nonetheless she has a deep sense of affiliation for the land and its people. Rehana loves Bangladesh and those who fight for the cause of its freedom because of her emotional affinity to this land of her loved ones. Her widowhood left her all alone in Dhaka after her children were taken to Lahore by Faiz and his wife Parveen. Moreover her parents were dead and her sisters were in Karachi. Yet she struggled alone to find cure for her maladies just as the country moved towards troubled years looking for a peaceful solution.

Gender relation can only be successful when women can secure the space they need to articulate oppositional discourses and counter cultural politics which is very much seen in Rehana's condition in coping with her widowhood and the newly formed fanatic norms of the Islamic state of Bangladesh. In an Islamic patriarchal set-up it was not easy for a lone woman to secure loan, especially when the assets left by her husband were insufficient. Going against convention she even takes the bold decision to remarry to come out of her financial crisis. But instead of remaining bonded as wife to a rich blind man who offered to marry her she committed a most unethical task of stealing some of the man's dead wife's precious jewels. Although what she did was wrong if judged from a religious or moral point of view it gave her practical solution. The money attained solved her monetary crisis and within a year she built a house and subsequently got back the custody of her children. The house which she named *Shona* was given on rent which paved a way for regular source of income for Rehana to rear her children comfortably. Rehana's character inverts the feminine stereotype of a weeping and helpless widow but rather brings to light a strong female subject who can go to any extent to secure her individuality and that of her children, even to the heights of committing a crime like theft. In this regards she conforms to the ideal of 'survival of the fittest' in being practical enough to rear her children without any male support. Nancy Fraser talks about a subaltern counter-public sphere which would permit women along with the other subordinate social groups to formulate oppositional interpretation of their identities interests and needs. (Fraser, 67) By definition a religious

state prohibits such developments. By monopolizing the discursive arena for inventing, circulating, and promoting, cultural, social and political values, the religious state also shrinks the chances for women to formulate 'counterdiscourses', re-encoding and subordinating any political dissent, narrowing women's options, preaching what it takes to be a singular 'truth'.(Moghissi 148) Rehana's secular mindset and counter- discursive action against religious monopoly is reflected in the fact that she rents *Shona* to a Hindu Family the Senguptas. Life goes on for the time being with a sense of normalcy, the years punctuated by Rehana's annual celebrations that remember the day she got back her children from Lahore. Gradually the revolutionary fervor that starts sweeping the city in the early 70's finds its way into the Haque household and Rehana is incapable of protecting her children from it. Both of them as students of Dhaka University get fully absorbed in the tempo of the moment and Rehana finds herself making all kinds of small allowances just to have her children safe. During the days of turmoil when the Senguptas leave for India, Rehana's son Sohail along with his comrades persuade her to convert Shona into a guerilla hideout by offering shelter to a wounded defense personal one who had fought for the Bangladeshi cause. Rehana is at first reluctant to make a commitment but the needs of her children soon force her to be involved in the conflict. This can also be seen as another counter-discouse adopted by Rehana in gaining a subversive agency against the hegemonic Islamic state of Pakistan.

Ever since '48, the Pakistani authorities had ruled the eastern wing of the country like a colony. First they tried to force everyone to speak Urdu instead of Bengali in an attempt of absorption of a secular language into a religious one and thereby silence the secular voice to develop a monolithic religious jargon of fundamentalist overtones. The Dhaka University students took active part in protests from the very beginning so naturally Sohail and Maya too got caught up. Trapped amidst this chaotic situation Rehana's motherly instinct as Anam narrates could only hope for safety and take comfort in the mundane :

> ...the country would go on being her home and the children would go on being her children. In no time at all the world would right itself, and they would go on living ordinary, unexceptional lives. (50)

The Feminist Maya

Rehana's daughter Maya had all the potential for a young feminist leader, the young face of a New Muslim Woman- bold, educated, and spirited and an aspiring journalist. As a

student activist she believed in communism and in her zeal had donated all her clothes to the cyclone victims and began wearing only white saris. Her way of dressing and her unruly behavior were something which her mother detested. There was some kind of an inexplicable breach between mother and daughter which hindered each of them to fully reach out to the other, a common tendency among south Asian Muslim woman which highlights their pull between tradition and modernity as well as in gaining superiority in the family power nexus. The narrative content in *The Golden Age* reveals that with Sohail, Rehana could express all her sentiments, perhaps because of the fascination for a son which she inherited traditionally but couldn't reach out openly towards her daughter. Rehana was never bound in purdah and lived an independent life yet it is seen in the narrative that most of her decisions were influenced by her son Sohail more forcefully reinforced in the sequel *The Good Muslim*. Thus in some way the ideological zenana always binds her because of which she looks up to her son for legitimization while took her daughter Maya for granted. As a mother she couldn't accept the liberal ways of Maya and her outspoken attitude which defied all the norms for a traditional Muslim girl. Rehana herself didn't strictly follow the religious abides although she couldn't accept the idea of complete freedom for her daughter. Much later in the novel when Maya worked as a journalist in Calcutta and Rehana too joined her for sometime in social service, the tensions between mother and daughter relaxed to a great extent. It was the fight for the cause of liberty and identity that brought together these two women closer more than their blood ties.

L. Shannon Jung in her article "Feminism and Spatiality: Ethics and Recovery of a Hidden Dimension" indentifies three structures of spatiality of the human self--embodiment, sociality and symbolization (56). First is living through the bodies, second is the possibility of face to face relations while the third level dwells in the realm of consciousness that depends upon spatiality through symbols. There is a correlation between the hidden spatial dimensions of the body self and the still less than fully visible status of women in Islamic culture. Women's experience to spatiality involves the accentuation of the limitedness of human life (Jung 62). Spatial limitation is a central feature in the lived experience of Muslim women. The narrative shows that although Rehana embodies the figure of a New Muslim woman, still all the decisions and new developments that she adapted regarding her children, had to be approved by her dead husband. It was a routine with Rehana to communicate everything to her husband through her regular visits to the graveyard. This exhibits the nature of a dutiful

wife who even in his absence would never transgress her demarcated boundary. Thus in spite of her independence she confined herself in a coded space specified for women, thereby spontaneously creating an ideological zenana or a wall of self-confining thoughts around her. For a certain period in the narrative this ideological boundary breaks as a counter- narrative when Rehana falls in love with the Major who takes refuge in *Shona* and gets physically involved with him. The secrecy of the counter-narrative is maintained by the author as this was the only thing in Rehana's life which she didn't share with her dead husband. The way Rehana observed the Major exposes a young widow's latent sexuality and her repressed physical desires. Through her relationship with the Major she wanted to rediscover her feminine *jouissance*. In his company she felt free and could be herself without any pretentions of propriety. But when she took her decision to chalk out a plan of rescuing Sabeer, the Major seemed to be alarmed for her safety. Initially Rehana had integrated herself with the war because of her children but gradually she began to identify herself with the cause and wished to assert her own independent space in politics. Thus when the Major showed concern for her safety and behaved like her husband as if he was the permissible authority she became agitated. Finally when she manipulated Faiz to get the release order of Sabeer and was on her way to police station all alone, she crossed the boundaries of wifehood and set her foot towards the difficult terrain of politics independently. Had her husband been alive she knew she would never have been allowed to endeavor such a task. Symbolically thus, she not only fought for Sabeer's release but also her own release from a long saga of dominance traditionally inherited by women mostly in non- secular societies.

The only female character who observes purdah in the novel is Rehana's neighbor Silvi, a girl whom Sohail loves passionately but couldn't marry initially. Silvi willingly accepts all the rigorous tenets of Islam after her forced marriage with an army personnel Sabeer, thereby abiding by the consensus generating apparatus created by the zenana sub-culture. Moreover even the emergence of the new country Bangladesh was not acceptable for Silvi because she believed in the unification of all Muslims not their division. There was a strange kind of reticence in her subjectivity, even the death of her husband Sabeer for freedom left her untouched. Tahmima Anam touches upon the idea of fundamentalism and religious fanaticism through Silvi who believed that even sacrifice is necessary to keep the *Ummah* unified which is later reflected in the activities of the Tabliqi Jamat intiated by Silvi and her second husband Sohail in the sequel *The Good Muslim* .

All other women in Rehana's coterie of friends and relations, like Mrs. Rahman, Mrs. Chowdhary, Mrs. Akram, her sister–in-law Parveen had a commonplace existence with no separate identity of their own except the social position as wives of their husbands. These women never even felt the need for an individual identity. The only exception to this line was Rehana's tenant Mrs. Sengupta whose dream was to become a writer. She in her first meeting with Rehana talked about the influential ideals of Rokeya Shakhawat Hossein's *Sultana's Dream* which the later had not heard about but was ashamed to confess because of the zeal of the speaker. Later in the novel when Rehana met her in a refugee camp in Calcutta she had lost her memory and there was no trace of her son and husband. But the latent desire to write was still in some way sustained in her as she could respond to Rehana's queries only through incomplete phrases and ideas.

Tahmima Anam within the political backdrop put forward the figure of the New Muslim Woman in a newly emerging nation Bangladesh who establishes an identity for herself in a traditionally male- dominated Islamic set-up. Within Britain, the New Woman as a term emerged in the late 19th century and depicted the changing image of women from the established and accepted role model to a more radical figure. Initially the newness marked her as a modern figure, committed to change and therefore the label was applied to women writers in literature and in particular, proto-feminists. For a large body of feminists, the New Woman was a literary means of highlighting specific issues (Ledger, 1997). Novelists considered the rise of New Women in her relationship with other social and cultural movements of the period. Therefore, textual configurations of women in history became a political agent. Although Rehana is not directly a political agent the narrative offers her enough political agencies in her involvement in the struggle. She can be considered as a New South Asian Woman in an emerging nation because she recognizes herself as an individual and chooses a strategy of subverting convention and tradition that defines and confines widowhood. In the concluding letter to her dead husband Rehana confesses all her deeds including her affair with the Major and her independent ventures during the struggle. Metaphorically, thus she breaks out of the ideological restrictions and spatially limited concerns of the imaginary zenana and instead resurrects a belief in her own self for an independent and fulfilling life representing the New Woman.

The Sequel

Anam in her sequel *The Good Muslim* takes up the story of Maya and Sohail Haque after Bangladesh's war of independence in 1971. The narrative at many instances

confirms the worst suspicions about Muslims for a western audience through Maya's consciousness, nonetheless her struggle for an independent female space in a post-war, newly-independent Bangladesh that had emerged out of one of the darkest periods of the Indian subcontinent is challenging. Islamic resurgence in Bangladesh is a major focus of Anam's second novel, but it is not synonymous with Islamic militancy. Islamic resurgence was deliberated for political and social stability in the nascent country. Islamic resurgence in Bangladesh dates from the mid-1970s while Islamic militancy emerged about two decades later. The issue of concern is whether this Islamic resurgence shown in the facelift of the Haque family should be characterized as Islamic 'revivalism' for peace or 'fundamentalism' as an operative tool for the fanatic forces within patriarchy. Bangladeshi-Muslim nationalism with deep fundamentalist sutures emerged as a robust alternative to Bengali nationalism-secularism and the Islamist leader Sohail was a product of the same while Maya is the consistent feminist dissenter against fundamental restrictions in the inner circle of the Haque family as well as in the public sphere of her medical tours. The motif of a modern woman in a traditional society reiterates in this novel. The siblings follow diverging paths: Sohail, haunted by the horrors of the conflict, finds solace in traditional Islamic practices whereas Maya becomes involved in medicine and progressive politics in fighting her own 'gender jihad' in providing succor to the distressed women in her community. When Sohail's wife Silvi dies they argue over the upbringing of his troubled son, Zaid, whose uncertain future seems symbolic of the nation itself. The protagonist, Maya, is a doctor and a fiercely independent woman who left home after her war veteran brother Sohail became so distant and deeply religious that she knew their relationship would never return to its happier, easy state as in the first novel again.

Maya's strong intellect and resistance to restrictive Islamic norms brought her in conflict with her environment: she writes for an underground radical publication, she is banished from a village for defending a pregnant woman, and she alone pleads with her brother to not send his son to the local madrassa. Maya's religious position is even more precarious because she probes into the intricate feminine space of the womb which traditionally acts as a perennial instrument of women's confinement. Her introduction of birth control measures is a rejection of the spatial boundaries biologically received by women in being both willing and unwilling agents of reproduction. *The Good Muslim* is sort of asking the reader to challenge that notion of what constitutes in becoming a good Muslim-is it the practicing Muslim Sohail the fundamentalist leader of *Tablighi Jamat*

or Maya who's very progressive and irreligious yet fighting her own "gender jihad" for the community in catering to the basic gynecological needs of the poor women of her country :

Anyone could become a surgeon, but a doctor for women, a doctor who could deliver their babies and stitch their wounds afterwards and teach them about birth control—that is what they needed. She didn't think of the debt she was repaying, that each of the babies she brought into the world might someday be counted against the babies that had died, by her hand, after the war. (11)

Yet ironically Maya finds it hard to deal with her own mother's ovarian cancer because her brother stressed on purification of the aftermath of life through religion rather than finding a clinical solution to realistic ailments through chemotherapy..

Before and After War

Anam uses Islam as a lexical marker to delineate stark "before" and "after" scenarios in Maya's household. Prior to the war, Maya, her brother, and their college friends lived in a carefree, open world where they attended debates, music recitals, and poetry readings without giving a thought to religion and its place in their lives (and it is Maya's insistence upon holding on to this distant past that later alienates her from her family and community). In short there was no conventional binding, but after the war however, Sohail returns home so haunted by the atrocities he both witnessed and committed that he completely disavows his older self, finding sole refuge in the rules and absolutes of religion. He along with his wife Silvi become active members of *Tablighi Jamat* a forum holding prayer meetings and sermonic lectures on Qur'anic dictates for both the sexes. These prayer meetings held in their house turned it to a literal zenana for veiled women like Khadija and the others who were absent in her previous novel.

The gendered aspect of political Islam is a matter of global interest for feminist activists because of the anxieties generated by "war on terror" (Jamal 15). Moreover, Muslim feminists like Amina Wadud, Riffat Hassan, Mohja Kahf and so on are also said to run a "gender jihad" or a jihad for equality within Islam which can be seen as symptomatic in Maya's medical activism for peace. The plight of rape victims like Pia and many others in *The Good Muslim* reaffirm the fact that state violence mooted by war is patriarchal violence, regardless of the gender of those who enact it while human values like gender equality and gender justice having little importance in a patriarchal Islamic

state cannot be achieved in times of war. Anam's implication that Sohail becomes a neglectful father, distant brother, and absent son because religion—rather than war—left him psychologically damaged is essentiality reductive, because Sohail was also the savior and spiritual healer of rape victims or the euphemistic *Birangonas* of the war like Pia, nonetheless the gender divide produced by fundamentalist forces with the reinforcement of the zenana system in post war Bangladesh relevantly interrogates the question of South Asian Muslim women's space in a globalized world. *The Good Muslim* places the dichotomous choice for a Bangladeshi woman- either to be a New Women in a liberal, postmodern globalized context like Maya or to conform blindly to faith without a logically sound rationale in being a staunch practicing Muslim like the remarried Silvi whose stark faith and consequent death was chiefly instrumental in the conversion of Sohail in becoming a Godman along with the war.

The theme of searching for liberty, identity and a secular language for expression is predominant in Anam's novels reflecting the tension between practicing Muslims and political Muslims that still exists in Bangladeshi society or the Indian Subcontinent as a whole. As a doctor and an activist serving the rape victims of war, by offering gynecological knowledge at remote villages Maya's performative agency strain against the traditionally domesticated roles of women — and not just women in the Muslim world. But even Maya, the non-conformist agreed to pray once a day at least during the evening to give solace to her dying mother but could not concede to her mother's advice of getting married and fall prey to Rehana's stocked patriarchal concerns about the singleness of a young independent woman like her. Nevertheless she adopts a daughter whom she names Zubaida, the eventual protagonist of Anam's third novel in the trilogy captioned *The Bones of Grace* which deals with the consciousness of a young Bangladeshi researcher in the diaspora conceding to the feelings of the writer herself where the novel's central concern is a humanist condition in a postmodern cosmopolitan space rather than a feminist one in conforming and combating the fanatic fabrics of fundamentalism in the soil of Bangladesh. Just as the last few decades have witnessed an effort by the "puritanical" view of Islam from the Arabian heartland to penetrate the syncretistic Asian periphery, there is now a need to reverse the flow of Islamic ideas from Asia to the Middle East. And the South Asian Muslim women writers like Tahmina Anam from Bangladesh and many emerging others from Pakistan and India as well with their secular ideals can be instrumental in leading the path towards framing a discourse of liberal Islam on the global map.

Works Cited

Akhand Akhtar Hossain, *Journal of Islamic Studies*, Volume 23, Issue 2, 1 May 2012, Pages 165–198, https://doi.org/10.1093/jis/ets042

Anam, Tahmina, *AGolden Age*, London: JohnMurray Publishers, 2007, Print

— *The Good Muslim*, London: Harper Collins, 2011, Print

Azim, Firdaus et al. Editorial, "Negotiating new terrains: South

Asian feminisms" *Feminist Review 91* (2009): 9-28, Print

Badran, Magraot, Islamic Feminism : What's in a Name? *Al-Ahram*

Weekly Online 17 - 23 January 2002 Issue No.569, Web 12

July2012,<http//www.weekly.ahram.org.eg/2002/569/html>

Field, Ophelia, "*The Good Muslim* by Tahmima Anam: A Dark Tale of Post-war Idealism in Bangladesh" Web.3July.2012<http://www.telegraph.co.uk/culture/8478508/The-Good-Muslim-by- Tahmima-Anam-review.html>

Fraser, Nancy, "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy"in *Social Text*, vol. no. 25/26, New York: DukeUniversityPress,1990, Web9septemper2013<http://www.jstor.org/stable60

Lerner, Gerda, *The Creation of Patriarchy*, New York: OUP, 1986, Print

Ledger, Sally, *The New Woman: Fiction and Feminism at the Fin de Siècle*

Manchester, UK: Manchester University Press, 1997, Print

Jamal, Amina, "Gendered Islam and Modernity in the Nation

Space: Women's Modernism in the Jamaat-e-Islami of Pakistan", *Feminist Review 91* (2009): 9-28, Print

Jung, L Shanon,"Feminism and Spatiality: Ethics and the recovery of a Hidden

Dimension" *Journal of Feminist Studies in Religion* Vol 4, No 1,(Spring 1988):28-42, *JSTOR,* Web 18 May 2012

Moghissi, Haiden, *Feminism and Islamic Fundamentalism-The Limits of Postmodern Analysis,* London: Zed Books, 1999, Print

Pyle, Christine, "Symbolism in *A Golden Age*: Rehana as Bangladesh" *English 3080* Essay 1 February 26, 2010

Roy, Asim, *Islam in South Asia, A Regional Perspective*, New Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999, Print

— *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Michigan : Oneworld Oxford 2006, Print

"zenana", *Oxford Dictionaries*, April 2010, Oxford University Press, Web, 25

April 2012 <http://oxforddictionaries.com/definition/zenana>

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 194-213

Challenges of Mental Wellbeing of Digital Native Adolescent : Promotion of Mental Health

Dr. Mrinal Mukherjee

Assistant Professor
Department of Teacher Education
The West Bengal University of
Teachers' Training, Education Planning and Administration (WBUTTEPA)
Kolkata-700019, India
E-mail: dr.mmrinal@gmail.com

Abstract

The death of adolescent being trapped in Blue Whale Game is a recent pastand such deadly games became contagious for teenagers. Asper (WHO, 018) Mental health conditions is responsible for 16% of the disease and injury for the people aged 10-19 years and suicide is the third leading cause of death in 15-19 year olds. The social life of a teenager has radically shifted with the onslaught of digital media. They are digital natives growing up in an era of a massive influx of technology. In recent years, mental disorders and psychosocial disabilities have been increasingly recognised as global development issues. Deviation of an individual's mental well-being can adversely compromise the capacities and choices, leading not only to diminish functioning at the individual level but also broader welfare losses at the household and societal level. (WHO, 2012). 'Internet addiction' has become regarded as a novel psychopathology that may well impact on a large number of individuals. Therefore, the need of the time is to device a policy frame work for promotion of Mental Health which could mitigate the unique challenges faced by digital adolescent and to promote their mental wellbeing. In this paper after in-depth study of literature, especially policy instruments, it has been tried to throw light to the policy frame work of Mental Health Promotion. The study might have implications on restructuring Adolescent Mental Health Promotion Policy in South-East Asian countries in the present global context.

Keywords

Digital Natives, Social Media, Adolescent, Internet addiction, Mental Health Promotion

Introduction

The generations that have grown up with easy access to digital information and communication technologies are considered as the 'digital natives'. Teenagers who live in a ubiquitous digital environment wherein socialization through and with digital gadgetry is now exhibiting atypical teenage behavior, it is of utmost importance to try to understand what social processes are going on resulting from their digital consumption[1]. Study found that adolescents exposed heavily in digital world are impaired in real life social interactions[2]. Several studies have begun to address whether an association exists between rates of internet use, including social media, and population suicide rates[3]. So the status of mental health of adolescent is in question.

In recent years, mental disorders and psychosocial disabilities have been increasingly recognised as global development issues[4]. Mental health or psychological well-being makes up an integral part of an individual's capacity to lead a fulfilling life. Deviation of an individual's mental well-being can adversely compromise these capacities and choices, leading not only to diminish functioning at the individual level but also broader welfare losses at the household and societal level[5]. Therefore, there is a need of education which can foster core social and emotional competencies, such as self-awareness, self-regulation, initiating and maintaining healthy relationships, and treating others with respect and care[6]. This kind of digital exposure creating new challenges to the academic community to inculcate the necessary skills among adolescent learners relevant for leading a meaningful life in the 21st century.

In this context, the global academic community must consider the significance of policy framework for Mental Health Promotion in restoring the mental wellbeing of the adolescent. There is an urgent need of acceptable Policy Framework for Mental Health Promotion for adolescent. Therefore, the approach, strategic design for Mental Health Promotion framework should be discussed, debated and conceptualised.

Socio-Emotional Attributes of Digital Natives

Blue screens, download, bandwidth and data speed-these words define how adolescents in the 21st century are used to interacting with the world around. This community of learners, sometimes referred to as the 'digital generation' are those who are growing

up constantly connected to the world around them through electronic gadgets and remain engrossed in this hyper-connectivity. The term 'digital native' was coined by Prensky (2001)[7] in the article entitled 'Digital Natives, Digital Immigrants', to indicate the needs of modern students.The concept of a digital generation comprised of students who have grown-up exposed to and using digital computing technologies[8]. By virtue of this experiential background, members of this generation are said to have developed a level of comfort with and expertise in using those technologies that prior generations do not have[9]. Those who were born and raised in the age of computers and online communication, today's teens share self-created content, post their opinions, and link to other content online more than any other demographic group[10].

A number of common characteristics are ascribed to these digital natives who comprise the digital generation[11, 12] are Tech Savvy, Remain Connected, Screen Based New literacy, Multi-taskers, Information Rich, Self-Controlled Learner and Digital Consumers. Despite their efficiency and advantages as learning community, they are also at risk being early exposed unguided digital consumer. It is important to understand developmentally how digital technology is affecting this generation's brain development. There growing evidence of imbalance of human brains, wherein left brain hemisphere stimulation is far more dominant than right brain hemisphere stimulation, due to over attachment of digital technology & consumption of digital content[13]. Digital adolescents have a limited capacity for self-regulation, susceptible to peer pressure and they are at some risk as they remain excited to experimentation in digital space. They can find themselves on sites and in situations that are not age-appropriate, and research suggests that the content of some social media sites can influence youth to engage in risky behaviours[14].

The rise of digital media use and the ability to be in almost constant connection to the internet has raised a number of concerns about how internet use could impact cognitive abilities of adolescent. Mills (2016), after an in-depth literature study identified some area, as noted below, of concern of effect of digital exposure on cognitive development of adolescent learners which might challenge their skills needed for 21st century[15].

Analytical Thinking : Those individuals who are part of a highly connected network are less likely to adopt the kind of cognitive strategy needed to reach a solution when the solution is readily available.

Multitasking : These results suggest that the natural pace of social interactions could be disrupted when adolescents are simultaneously keeping track of extraneous information—as is often done when using digital devices in social situations.

Processing Social Cues : Interpersonal cues were lower in communications through digital media and that this decline was associated with decreased feelings of bonding and nonverbal affiliation cues.

Social Competence : In a longitudinal study of adolescents, use of social net-working sites to compensate for weak social cognitive skills was associated with increased peer-related loneliness, but using social networking sites to form new relationships was associated with decreased peer-related loneliness

Social Evaluation : the participants that reacted most strongly to the rejection feedback during the task were more likely to report feelings of social disconnectedness in daily life. These findings suggest that online interactions have real–world consequences for the cognitive processes of adolescents, although it is unclear if this relationship is limited to online peer interactions.

Mental Wellbeing : A Conceptual Framework

The extensive research data showed that mental health has become a major prevalent issues for adolescent[16] and the percentage of adolescent population is nearly reaching 20 % who are affected[17]. The worst side of the fact is that many of such adolescent are not receiving the specialized interventions as needed[18].

According to WHO, mental health is understood not as a mere absence of illness, but rather, in a broader sense, as a state of well-being in which individuals develop their abilities, face the stress of daily life, perform productive and fruitful work, and contribute to the betterment of their community[19]. This definition served as the basis for WHO Mental Health Action Plan, 2013–2020, which incorporates the concepts of mental health promotion, mental illness prevention and treatment, and rehabilitation. Particularly, developmental aspects of children and young people, including, for instance, the ability to manage thoughts, emotions, as well as to build social relationships, and the aptitude to learn, are emphasized in the plan as critical facets to be tackled inmental health interventions.

According to the WHO, mental health includes "subjective well-being, perceived self-efficacy, autonomy, competence, inter-generational dependence, and self-actualization

of one's intellectual and emotional potential, among others." The WHO further states that the well-being of an individual is encompassed in the realization of their abilities, coping with normal stresses of life, productive work and contribution to their community. Cultural differences, subjective assessments, and competing professional theories all affect how "mental health" is defined. A widely accepted definition of health by mental health specialists is psychoanalyst Sigmund Freud's definition: the capacity "to work and to love"

Although definitions vary, mental health isgenerally seen as including:

- ► emotion (affect/feeling);
- ► cognition (perception, thinking, reasoning);
- ► social functioning (relations with othersand society);
- ► coherence (sense of meaning and purposein life).

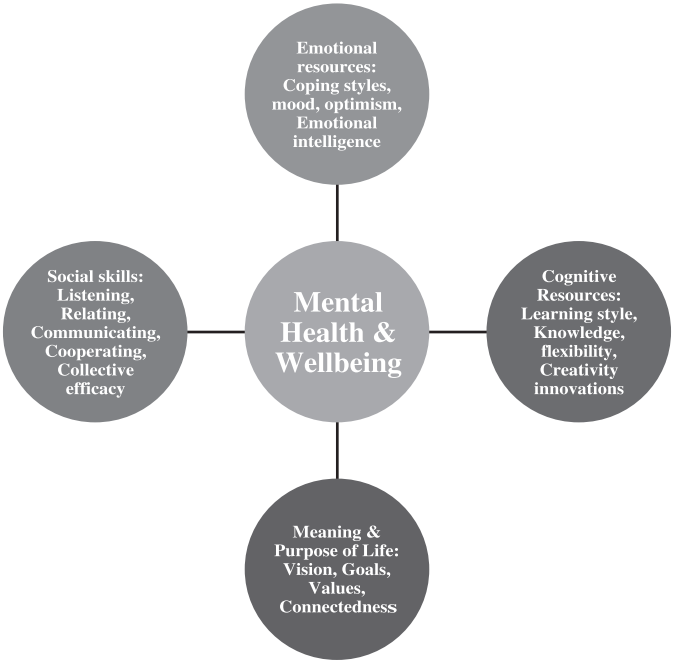

Dimensions of Mental Health

Mental health is an essential part of holistic wellbeing. The general well-being of adolescents has been the topic of considerable debate in recent years. Evidence has suggested that the current level of behavioral and emotional problems in teenagers is higher than in the past.

Mental wellbeing which is a reflection of social and emotional wellbeing, and such state of wellbeing according to Anuradha *et. al.* (2012)[20] is associated with:

- Feeling happy and positive about yourself and enjoying life
- Healthy relationships with family and friends
- Participation in physical activity and eating a healthy diet
- The ability to relax and to get a good night's sleep
- Community participation and belonging.

The Mental Wellbeing Model as advocated by Anuradha *et. al.* (2012)[20] takes into account existing and new research and suggests the following model by adding value and belief as essential core components to wellbeing. They stressed on Value as value is a set of rules which governs one's personal life, hence regarded as very core of one's being. Value does not only determine the pattern of our response towards a situations we experience but also guide us in our choice from the possibilities and decisions making. They used the term belief to mean that beliefs is something that people believe to be true about themselves about the world they live in. Actually beliefs are something that either promote or make hindrances in accomplishing what people want from life.

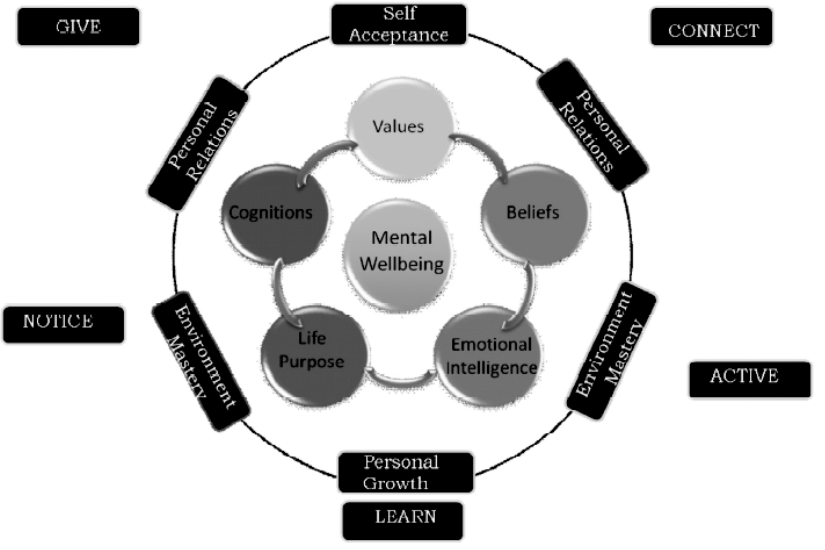

Fig : Mental Wellbeing Model- Improving Positive Mental Wellbeing among Adolescents : Current need (Anuradha*et. al.*, 2012)[20]

Ryff (2014)[21] revisited wellbeing from psychological perspectives and identified the following six dimensions in conceptualising the wellbeing of an individual

- purpose of life-Feeling of an individual that his / her life has meaning, purpose and direction
- Autonomy- Living in accord with their own personal convictions
- Personal growth- How far an individual is making use of his/her personal talents and potential
- Environmental mastery- managing own life situations
- Positive relationship- depth of connection of an individual with significant others
- Self-acceptance- knowledge and acceptance within oneself, including awareness of personal limitations

Source : Wellbeing in terms of Psychological Perspectives after Ryff (2014)[21]

Impact of Internet Addiction on Mental Wellbeing of Adolescent

Digital adolescents throughout the world use the internet, cell phones, to collect and curate information on regular basis and communicate with each other. Apart from gaming Social Media is a major attraction which fuses technology with social interaction via Internet-based applications that allow the creation and exchange of user-generated content[3] and thus provides powerful new ways for teens to create and navigate their social environments.Social media "build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and thus allow the creation and exchange of user-generated content"[22]. They interact in social media with their identification of developing self, sexuality and their evolving moral consciousness. Several studies have revealed that internet have certain advantages in many ways and more over engagement with social networking site in guided manner might be beneficial in to some extent.

Social networking sites provide a way for teens to experience connectedness and opportunities to learn from each other and online socialization platform might provide supportive environment to explore friendship, social status and also provide adolescent an opportunity to share and discuss their choice, preference, critical appreciation about literature, music, movies, online videos, games, and other aspects of teen culture[23]. Virtual connectivity and socialization might provide adolescent to find support online that they may usually lack in traditional relationships, especially for teens who are often marginalized, such as lesbian, gay, bi and transgendered, those who are living with an illness or disability, or those who may feel physically unattractive or socially reticent[24]. Teens explored such virtual space for key source of information and advice in a critical developmental period[25]. As revealed by Lenhart[26] that adolescent use online platform and resources to satisfy their quires about their health concerns like dieting, physical fitness and many of them also used such scope about the sexual health too.

Teens are generally engaged mostly in virtual space for text messaging, interacting in social networking sites, blogging online video sites, online gaming. Teens who are the heaviest media users report being less content and are more likely to report that they get into trouble a lot, are often sad or unhappy, and are often bored[27] . Mostlysuch engagement in unguided and uncontrolled fashion leads to internet addiction which might be characterized as a maladaptive pattern of internet use leading to clinically significant impairment or distress[28]. Such addiction may include obsession for remain connected in internet, recurrent failure to resist the impulse to use the internet and remain connected for a period of time longer than intended, excessive effort spent

on activities necessary to obtain access to the internet, and continued heavy internet use despite knowledge of having a persistent or recurrent physical or psychological problem likely to have been caused or exacerbated by internet use[29]. Research has already revealed that adolescents with internet addiction have a higher level of attention deficit hyperactivity disorder symptoms, depression, and hostility, and an increased risk of engaging in aggressive behaviours[30, 31]. Excess use of cell phone and adolescent's mental health and quality of life while investigated it was found that excessive use of mobile leads to common mental symptoms included lack of concentration and poor academic performance, insomnia, anxiety etc. Among physical symptoms- body aches, eye strain, digital thumb were found to be frequently in both sexes[32, 33].

Lack of experience, limited ability of self-regulation, and susceptibility to peer pressure, adolescents might not fully understand the possible negative outcome of internet use and are mostly at risk as they navigate and experiment with social media[34]. Frequent social comparisons in virtual media can negatively impact one's mental well-being and individuals with low self-esteem may end up feeling worse due to the effects of social comparison on social networking sites[35]. Research revealed that longer the teens are exposed in virtual social media, more they believe that others are living happier lives that their own and thus social media exposure is correlated with psychological distress and reduced of self-esteem[36]. Unguided exposer may lead to risky behaviour such as sexting, cyberbullying, exposure to inappropriate content, body shaming, comparing one's own appearance to that of others, negative commenting & others form of harassmentscan have serious injurious psychosocial consequences. Moreover, in social media can lead to feelings of inadequacy and depression[37, 34].

Cyberbullying is a major cause higher levels of depression and anxiety for victims and has also been connected to cases of youth suicide with teens known to engage in reading hurtful comments days before their suicide attempts and research studies confirmed that marginal including females are most susceptible[38,39,34]. Teens are engaged in sexting where they used to send or receive sexually suggestive nude or nearly nude images or messages and in turn sexting is a misdemeanor offense for teens which has been used to bully or humiliate people and in relationship abuse[40, 34]. Online sexual predation occurs when an adult makes contact with a minor with intent to engage in sexual activities that would result in statutory rape, but student sexual solicitation between same-age youth too is common[41, 42] and such risky engagements culminates in anxiety to sever depression impacting wellbeing.

Few research has shown that videogame playing in many ways might be detrimental for the wellbeing of the adolescent associated with lower self-worth. Excessive engagement with video gaming led to behavioural disorder in young adulthood including abuse of drug, alcohol addiction, and poorer relationships with friends and family and on the other video gaming having interactive nature of the violence provoke sensation seeking, neuroticism, aggression, and state and trait anxiety[43, 44].

Though it yet to established the exact degree of association, but social scientist are agreed upon that there is convincing relationship in between self-harm and internet addiction. Internet search activity was positively correlated to both intentional self-injury and completed suicides among youths[45]. Preventive strategies may include education to increase social awareness, identification of those exposed to the risk, and provision of ready structured help[46].

Approach of Promotion of Mental Health- Policy Perspectives

Mental health is considered as an integral part of health and well-being, as reflected in the definition of health inthe Constitution of the World Health Organization: "health is a state of complete physical, mental andsocial well-being and not merely the absence of disease or infirmity". Mental health, like other aspects ofhealth, can be impacted by a range of socioeconomic factors that need to be addressedthrough comprehensive strategies for promotion, prevention, treatment and recovery in a whole-ofgovernmentapproach. The World Health Organization[47] estimated that, worldwide, 20% of adolescents in any given year may experience a mental health problem.

The mental health programs developed in schools and communities include specific strategies that have an emphasis on enacting peer support, partnerships and dialogic spaces for the children and adolescents to engage in supportive interactions with other relevant peers or adults[48].

Understanding of the concept of 'Mental Health Promotion' requires a clarity of concept of mental health. Key components of mental health generally include the capacity to: enjoy life, use abilities and achieve goals, contribute to community, deal with life's inevitable challenges and bounce back from adversity, and form and sustain relationships with others. This notion of mental health and mental illness as two separate constructs, first articulated by Health and Welfare Canada in 1988, is fundamental to our understanding of how mental health promotion principles apply to people with

mental illnesses. Mental health promotion refers to the actions taken to strengthen mental health.

From the analysis of the policy of comprehensive mental health action plan 2013-2020 (WHO, 2013)[47], in the context of digital native adolescent, mental health promotion might be include –

- Enhance capacity of adolescents to take charge of the circumstances that may affect their life and could able to take decisions about their life and health.
- Promote resilience to mitigate the difficulties by strengthening protective factors and reducing risk factors
- Need inter-sectoral linkage to linked policies and programmees connecting all stake holders including children, teachers & parents in school context
- Need to strengthen positive perspectives of mental by empowering them to recognize their strength and determine their own destinies.

European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing : Advocacy of European Union (2016)[49]

There is a growing evidence base for the effectiveness of school based mental health promotion, mentaldisorder prevention and early recognition for treatment.Early school leaving is related to the mental health of an individual. Pupils spend more than 6 hours per day at school, making this setting an excellent opportunity to implement evidence based interventions to promote mental health, prevent mental disorder, and facilitate early recognition and signposting for treatment of mental disorders. Therefore the Joint Action for Mental Health and Well-being, under this framework recommends:

- Promote schools as a setting where promotion of mental health, prevention of mental and behavioral disorders and early identification of mental disorders can reach all children and young people;
- Strengthen information about the levels of wellbeing and different mental disorders as well as coverage and outcomes of effective school based public mental health intervention;
- Enhance training for all school staff on mental health and consider schools as part of a wider network with other stakeholders and institutions involved in mental health of children and adolescents in local communities.

OECD Policy Framework (2015)[50]

In "Mental Health: The New Frontier for Labour Economics", Richard Layard wrote that improving mental health is vital to both economic growth and happiness and "could be the most important single step forwards in the 21st century"[51]. The report emphasizes the need to take action across a range of policy arenas and specially focused on **'**Education policy to achieve optimal outcomes and robust school-to-work transitions'. The policy also recommends the 'actions to ensure a good school-to-work transition':More than one-half of all mental illnesses have their onset in childhood and adolescence. Education systems thus have a key role to play in ensuring good educational outcomes and successful labour market transitions for children with mental health problems. Schools should seek to foster mental health resilience and help students with their social and emotional problems, especially when families cannot provide the necessary support. To avoid stigmatization of young people struggling with mental health issues, schools should, as far as possible, promote general mental wellbeing and offer help that is easily available to all students and teachers.

Moving towards better policy : The OECD mental health and work policy framework advocated in helping young people through mental health awareness and education policies. Major advocacies are as follows :

- Develop mental health competence among teachers and education authorities.
- Include mental health competence in the teacher-training curriculum.
- Invest in preventive mental health programmes in schools (coping skills, emotional learning, etc.).
- Assure an adequate number of professionals with psychological training in schools.
- Assure students' timely access to coordinated support for mental ill-health.
- Ensure waiting times are short in the mental health care sector for children and adolescents.
- Have in place a support structure linked to schools and other youth services that offers integrated services free of charge to all young people and has a special focus on common mental illness.
- Invest in the prevention of early school leaving and support for school leavers, with mental health problems.

- Provide a solid evidence base on the link between school leaving and mental ill-health.
- Monitor early school leaving, watch for signs of mental health problems among early school leavers and provide support in all such cases.
- Provide effective support for the transition from school to work.
- Ensure proper higher education and work transitions for people with common mental illness through career advice and access to treatment.
- Require all school leavers to register with the local PES office, build PES capacity to deal with youth with mental health issues and reinforce the links between schools and the PES.
- Prevent young people with mental health issues from becoming permanently dependent on disability benefit through effective and well-resourced multidisciplinary rehabilitation.

United Nations (2015): The global strategy for women's, children's and adolescents' health (2016-2030)

This global strategy was launched in 2015 by United Nations[52]. This policy instrument is meant for fulfilling the global strategy and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Strikingly the updated Global Strategy includes adolescents because they are central to everything we want to achieve, and to the overall success of the 2030 Agenda. By helping adolescents to realize their rights to health, well-being, education and full and equal participation in society, we are equipping them to attain their full potential as adults. The three overarching objectives of the updated Global Strategy are Survive, Thrive and Transform. (Ban Ki-moon, UN Secretary General, 2015). By 2030, adolescent along with child and women in every setting realizes their rights to physical and mental health and well-being, has social and economic opportunities, and is able to participate fully in shaping prosperous and sustainable societies.

In recommendation of implementation of strategies for promotion and prevention in mental health, the policy asserted thatmental health evolves throughout the life-cycle. Therefore, governments have an important role in using information on risk and protective factors for mental health to put in place actions to prevent mental disorders and to protect and promote mental health at all stages of life. The early stages of life present a particularly important opportunity to promote mental health and prevent

mental disorders, as up to 50% of mental disorders in adults begin before the age of 14 years. Children and adolescents with mental disorders should be provided with early intervention through evidence-based psychosocial and other non-pharmacological interventions based in the community, avoiding institutionalization and medicalization. Furthermore, interventions should respect the rights of children in line with the United Nations Convention on the Rights of the Child and other international and regional human rights instruments.

Discussion

The research finding from the empirical studies has indicate that it is high time to respond, reflect and act on the issue of challenges of mental wellbeing of digital natives and thus it should be of interest to parents, educators, and policy makers deals with digital issues. The growing body of research on the nature of association-ship between internet use pattern and mental wellbeing gaining attention of academician from interdisciplinary field. Though parental awareness and involvement with their children's internet use have been increasing compared with earlier decades of digital-illiterate adults, but the degree of awareness is still inadequate. Adults can help teens think about online presence in moral and ethical ways, specifically to help teens in understanding the consequences for themselves and others of participation in the socially networked world. A multipronged approach that utilizes multiple social media platforms, as well as in-person contact, has the potential to reach teens with accurate health information, resources, and support[53].

Though the major policy advocacies in global level has emphasizes the importance of protection and promotion of mental health of digital adolescent, but are inadequate & nonspecific towards the issue of internet toxicity mediated fragility of mental wellbeing. The mental health programs developed in schools and communities include specific strategies that have an emphasis on enacting peer support, partnerships and dialogic spaces for the children and adolescents to engage in supportive interactions with other relevant peers or adults[48]. There is growing need a comprehensive plan to promote mental health of digital adolescent involving school, guardian and community.

Collaborative interactions among Children, Teachersand Parents in the School Context is the primary concern. Referring the contemporary research findings[48] suggested that tutoring, interviews, consultation meetings, peer-assisted learning strategies, interactive games, cooperative non-competitive building games are few ways through which teacher might interact with adolescent learners in their need mental anxiety and stress. Moreover,

collaborative interactions between parents, teachers, and mental health professionals has been found more effective[54, 55]. Home-school communication promoted interaction between parents and teachers through interaction and collaboration has been found fruitful in many ways to support and promote mental health of adolescent learners. Engaging in dialogue with community members and social groups by building social networks, might effective fostering solidarity and collective efficacy, or by promoting a shared commitment to the collective well-being[56].

article may be concluded with the recommendation for all nations, especially South East Asian developing countries to initiate comprehensive multilayered consultation with stake holders to review exiting policy guideline for using internet by appropriate age group and there should be stringent guideline to control the agencies regarding the nature of content in available in virtual space. There also emerging demands of coordination with policy of school education with policy of mental health promotion and national digital policy to develop framework to address the challenges of mental wellbeing of digital adolescent. The body of research about the impact internet addiction on mental wellbeing in the South East Asian context is still inadequate and in-depth empirical studies also are in demand to identify the specific challenges along with the positive influence of virtual medium in building social and emotional wellbeing of adolescent.

Reference

Ives, E. A., (2013), "iGeneration: The Social Cognitive Effects of Digital Technology on Teenagers", Master's Theses and Capstone Projects. Paper 92. Dominican University of California, Retrieved May 20, 2020 from scholar.dominican.edu

Mills, K. L., Dumontheil, I., Speekenbrink, M., & Blake-more, S.-J. (2015). Multitasking during social interactions in adolescence and early adulthood, *Royal Society Open Science*, pp 1-11, https://doi.org/10.1098/rsos.150117

Luxton, D. D., June, J. D., & Fairall, J. M. (2012). Social media and suicide: a public health perspective, *American journal of public health*, *102*(S2), S195-S200. https://doi.org/10.2105/AJPH.2011.300608

Eaton, J., Kakuma, R., Wright, A., & Minas, H. (2014), A position statement on mental health in the post-2015 development agenda, *International journal of mental health systems*, *8*(1), 28. https://doi.org/10.1186/1752-4458-8-28

WHO. (2012, August), Risks To Mental Health: An Overview of Vulnerabilities and Risk Factors, Background Paper by WHO Secretariat for The Development of A Comprehensive

Mental Health Action Plan, Retrieved 12 May, 2020 from https://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_EN_27_08_12.pdf

Maloney, J. E., Lawlor, M. S., Schonert-Reichl, K. A., & Whitehead, J. (2016). A mindfulness-based social and emotional learning curriculum for school-aged children: the MindUP program. In *Handbook of mindfulness in education* (pp. 313-334). Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3506-2_20

Prensky, M. (2001), "Digital Natives, Digital Immigrants Part 1", *On the Horizon*, Vol. 9 No. 5, pp. 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Carlson, S. (2005), Carlson, S. (2005), The Net Generation goes to college: tech savvy "Millenials" have lots of gadgets, like to multitask, and expect to control what, when and how they learn, Should we cater to them, *The Chronicle of Higher Education* A, 34, Retrieved May 14, 2017 from http://chronicle.com/free/v52/i07/07a03401.htm HYPERLINK "http://chronicle.com/free/v52/i07/07a03401.html"l

Gibbons, S. (2007, July), Redefining the Roles of Information Professionals in Higher Education to Engage the Net Generation." EDUCASE Australasia, In *Annual Conference. Melbourne Convention Centre. Melbourne, Australia* (Vol. 23), Retrieved May 11, 2017 from http://www.caudit.edu.au/educauseaustralasia07/authors_papers/Gibbons2.pdf

Lenhart A, Purcell K, Smith A., &Zickuhr K. (2010), Social media & mobile internet use amongteens and young adults, Retrieved May 30, 2011 from Pew Internet & American Life Projectwebsite:http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults.aspx

Gros, B. (2003), The impact of digital games in education, *First Monday*, *8*(7), 6-26. Retrieved May 17, 2017 from http://www.firstmonday.org/issues/issue8_7/xyzgros/index.html

Prensky, M. (2006), *Don't bother me, Mom, I'm learning!: How computer and video games are preparing your kids for 21st century success and how you can help!*, St. Paul: Paragon house.

Siegel, D. (2011, September 17), The brain, mindfulness, and youth: Supporting well-being and connection in young people, Paper presented at The Wisdom 2.0 Youth Conference, Computer Science Museum; Mountain View, CA.

American Academy of Pediatrics. (2011), Social media and kids: Some benefits and some worries, Retrieved May 15, 2017, from http://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap

Mills, K. L. (2016), Possible effects of internet use on cognitive development in adolescence, *Media and Communication*, *4*(3), 4-12. http://dx.doi.org/10.17645/mac.v4i3.516

de la Barra M, F. (2009), Epidemiology of psychiatric disorders in children and adolescents: Prevalence studies, Rev. Chil. Neuro Psiquiatr, 47, 303–314. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272009000400007

WHO (2016). "WHO | Child and Adolescent Mental Health." WHO. World Health Organization. Retrieved 12 May, 2017 from http://www.who.int/mental_health/maternal-child/child_adolescent/en/

Green, J. G., McLaughlin, K. A., Alegría, M., Costello, E. J., Gruber, M. J., Hoagwood, K., & Kessler, R. C. (2013), School mental health resources and adolescent mental health service use, *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, *52*(5), 501-510. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.03.002

WHO. (2004), Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice:Summary Report. Geneva,World Health Organization, Retrieved, March 10, 2018 from http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf.

Anuradha, L. R., Yagnik, V. S., & Sharma, V. (2012), Improving positive mental wellbeing among adolescents: Current need, *Delhi Psychiatry Journal*, 15, 22-27.

Ryff, C. D., & Singer, B. (1996). Psychological well-being: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research, *Psychotherapy and psychosomatics*, *65*(1), 14-23. https://doi.org/10.1159/000289026

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business horizons*, *53*(1), 59-68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Ito, M., Horst, H. A., Bittanti, M., Herr Stephenson, B., Lange, P. G., Pascoe, C. J., & Robinson, L. (2009), *Living and learning with new media: Summary of findings from the digital youth project* (p. 128), The MIT Press. http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26078

McKenna, K. Y., & Bargh, J. A. (2000). Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet for personality and social psychology, *Personality and social psychology review*, *4*(1), 57-75, https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0401_6

The Nielsen Company. (2009), How Teens Use Media: A Nielsen report on the myths and realities of teen media trends, Retrieved on May 30, 2011 from http://www.nielsen.com/content/corporate/us/en/search.html?q=How+Teens+Use+Media

Lenhart, A., Ling, R., Campbell, S., & Purcell, K. (2010), Teens & mobile phones, Retrieved May 30, 2011 from Pew Internet & American Life Project website: http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Teens-and-Mobile-Phones.aspx

Rideout, V.J., Foehr, U.G., & Roberts, D.F. (2010), Generation M2: Media in the lives of 8-18year olds, Kaiser Family Foundation, Retrieved on May 15, 2011 from Kaiser Family Foundation website:http HYPERLINK "http://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf" HYPERLINK "http://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf" HYPERLINK "http://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf":://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf

Young, K. S. (2004), Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences, *American behavioral scientist*, *48*(4), 402-415, https://doi.org/10.1177/0002764204270278

Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. C., Chen, S. H., & Yen, C. F. (2005), Proposed diagnostic criteria of Internet addiction for adolescents, *The Journal of nervous and mental disease*, *193*(11), 728-733. https:// HYPERLINK "https://10.0.4.73/01.nmd.0000185891.13719.54" HYPERLINK "https://10.0.4.73/01.nmd.0000185891.13719.54" HYPERLINK "https://10.0.4.73/01.nmd.0000185891.13719.54"10.1097/01.nmd.0000185891.13719.54

Yen, J. Y., Ko, C. H., Yen, C. F., Wu, H. Y., & Yang, M. J. (2007), The comorbid psychiatric symptoms of Internet addiction: attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), depression, social phobia, and hostility, *Journal of adolescent health*, *41*(1), 93-98. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.02.002

Ko, C. H., Yen, J. Y., Liu, S. C., Huang, C. F., & Yen, C. F. (2009), The associations between aggressive behaviors and Internet addiction and online activities in adolescents. *Journal of Adolescent Health*, *44*(6), 598-605. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.11.011

Srivastava, A., & Tiwari, R. P. (2013), Effect of excess use of cell phone on adolescent's mental health and quality of life, *International Multidisciplinary e-Journal*, *2*(1), 1-10.

Acharya, J. P., Acharya, I., & Waghrey, D. (2013). A study on some of the common health effects of cell-phones amongst college students. *Journal of Community Medicine & Health Education*, *3*(4), 1-4.

O'Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. *Pediatrics*, *127*(4), 800-804. https://doi.org/10.1542/peds.2011-0054

Steers, M. L. N., Wickham, R. E., & Acitelli, L. K. (2014), Seeing everyone else's highlight reels: How Facebook usage is linked to depressive symptoms, *Journal of Social and Clinical Psychology*, *33*(8), 701-731. https://doi.org/10.1521/jscp.2014.33.8.701

Chen, W., & Lee, K. H. (2013), Sharing, liking, commenting, and distressed? The pathway between Facebook interaction and psychological distress, *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, *16*(10), 728-734. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0272

Kowalski, R.N. (2010). Alexis Pilkington Facebook Horror: Cyber bullies harass even after suicide, Retrieved on June 3, 2011 from http://www.huffingtonpost.com/2010/03/24/alexis-pilkington-faceboo_n_512482.html

Berkman Center for Internet and Society, Harvard Law School, Internet Safety Technical TaskForce. (2008), Enhancing Safety and Online Technologies: Final Report of the Internet SafetyTask Force to the Multi-State Working Group on Social Networking for the State Attorneys General of the United States, Retrieved on May 30, 2011 from http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ISTTF_Final_Report.pdf

Blumenfeld, W.J. and Cooper, R.M. (2010), LGBT and Allied Youth Responses to Cyberbullying: Policy Implications, *The International Journal of Critical Pedagogy*, 3(1), 114-133. Retrievedon June 3, 2011 from http://freireproject.org/images/2321/IJCPv3_7.pdf

Clifford, S. (2009) Straight talk on digital harassment for teenagers, The New York Times, Retrieved on May 30, 2011 from http://www.nytimes.com/2009/01/27/technology/27iht-adco.1.19705877.html

Wolak, J. Mitchell, K., Finkelhor D. (2006), Online Victimization of Youth, Five Years Later, Retrieved on June 3, 2011 from http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC167.pdf

Collins, R.L., Martino, S.C., & Shaw, R. (2011), Influence of New Media on Adolescent SexualHealth: Evidence and Opportunities, Working Paper WR-761, Retrieved on June 3, 2011 fromU. S. Department of Health and Human services http://aspe.hhs.gov/hsp/11/adolescentsexualactivity/newmedialitrev/index.pdf

Staude-Müller, F., Bliesener, T., & Luthman, S. (2008), Hostile and hardened? An experimental study on (de-) sensitization to violence and suffering through playing video games, *Swiss journal of psychology*, *67*(1), 41-50. https://doi.org/10.1024/1421-0185.67.1.41

Mehroof, M., & Griffiths, M. D. (2010), Online gaming addiction: the role of sensation seeking, self-control, neuroticism, aggression, state anxiety, and trait anxiety. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, *13*(3), 313-316. https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0229

Mejía, O. L., & McCarthy, C. J. (2010). Acculturative stress, depression, and anxiety in migrant farmwork college students of Mexican heritage, *International Journal of stress management*, *17*(1), 1. https://doi.org/10.1037/a0018119

Liu, H. C., Liu, S. I., Tjung, J. J., Sun, F. J., Huang, H. C., & Fang, C. K. (2017), Self-harm and its association with internet addiction and internet exposure to suicidal thought in adolescents, *Journal of the Formosan Medical Association*, *116*(3), 153-160, https://doi.org/10.1016/j.jfma.2016.03.010

WHO. (2013), Comprehensive mental health action plan 2013–2020, Geneva, Switzerland. Retrieved 12 May, 2017 from https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/

Rocío García-Carrión1, Beatriz Villarejo-Carballido and Lourdes Villardón-Gallego, (2019), Children and Adolescents MentalHealth: A Systematic Review of Interaction-Based Interventions inSchools and Communities, *Frontiers in Psychology*.

European Union. (2016, January), European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing, *EU Joint Action on Mental Health, Final Conference*, Brussels, Retrieved 12 May, 2017 from https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-SC1-BHC-22-2019-framework-for-action_en.pdf

OECD (2015) High-Level Policy Forum on Mental Health and Work Bridging Employment and Health Policies, OECD Policy Framework, Retrieved 12 May, 2017 from https://www.oecd.org/mental-health-and-work-forum/documents/OECD-POLICY-FRAMEWORK.pdf

Layard, R. (2013), Mental health: the new frontier for labour economics, *IZA Journal of Labor Policy*, *2*(1), 2. https://doi.org/10.1186/2193-9004-2-2

U.N.O. (2015), The Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents Health. Sustainable Development Goals *New York.*

Carroll, J.A. & Kirkpatrick, R.L. (2011). Impact of social media on adolescent behavioral health. Oakland, CA: CaliforniaAdolescent Health Collaborative,

McWhirter, P. T., & McWhirter, J. J. (2010), Community and school violence and risk reduction: Empirically supported prevention, *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, *14*(3), 242-256. https://doi.org/10.1037/a0020056

Atkins, M. S., Shernoff, E. S., Frazier, S. L., Schoenwald, S. K., Cappella, E., Marinez-Lora, A., & Bhaumik, D. (2015), Redesigning community mental health services for urban children: Supporting schooling to promote mental health, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *83*(5), 839-852. https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0039661

Puffer, E. S., Green, E. P., Sikkema, K. J., Broverman, S. A., Ogwang-Odhiambo, R. A., and Pian, J. (2016), A church-based intervention for families to promote mental health and prevent HIV among adolescents in rural Kenya: results of a randomized trial. J. Consult. Clin. Psychol, 84, 511–525, https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fccp0000076

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 214-219

Study of Socioeconomic Status of Fishermen by the Riverside Areas of River Nabaganga and Kaliganga at Jhenidah of Bangladesh

Dr. Bidhan Chandra Biswas

Associate Professor, Department of Zoology
Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh.
e-mail : bidhan.biswas67@gmail.com

Abstract

The study was conducted in three locations of Jhenidah where the fishermen reside by the side of the rivers. The socioeconomic pattern of the fishermen were largely affected due to the degradation of the aquatic environments. They are lagging behind in all parameters of the socioeconomic profile. Prority should be given to enhance their status.

Keywords

Socioeconomics, Fishermen, Water bodies, Bangladesh

Introduction

Socioeconomic study was considered as an important step in identifying and planning successful interventions. It is possible to understand the economic position of the rural areas as well as help to the relationship of rural communities to the land and natural wealth.

It also reselects the their perceptions of necessities and nature of problems and their tendency toward the conservation of biota. Baseline information also was necessary for monitoring the impact of the project on socioeconomic variables significant to the status of the communities in riverside areas.

The people living by the water bodies include both professional and non professional fishermen and catches huge amount of fishes round the year and maintain their livelihood by selling fishes. The socio economic aspects manifests present status, income expenditure, housing pattern, standard of living, sanitation occupation, education and

economic condition of the people. for the well planned development ,planning and implementation of fisheries and fishing community, there is a need to gather base line information regarding the base line information of fishers. well documented research work had been done by Abdullah etal 2013,Ahmed N1999 the socioeconomic aspects fishermen in several water bodies. .Attempt has been made to identify the socioeconomic condition of fishers residing by the side of the river Nabaganga and Kaliganga.

Materials and Methods

Selection of villages of Nabaganga riverside areas

The areas were selected for thr purpose of study socioeconomic status of fishing communities along the bank of the river Jhenidah proper,Hatgopalpur and Kumiradah by the side of the river Nabaganga and also the villages of Harora and Fulhari by the side of the river Kaliganga in Jhenidah south western part of Bangladesh.

Methods of Data Collection

Data were collected using by questionnaires and Focus Group Discussion (FGO) with the fishermen and the women in the study areas.

Pre-tested discussion program was used for the collection of information from the fishermen communities after conducting a preliminary survey to suit the neighborhood circumstances. The data were collected directly from the fishermen families through personal discussions and interviews regarding the various aspects of the socio-economic conditions like age composition of sex, employment and housing pattern, occupational status, fishing intensity, income source and possessions. Simple percentages were calculated and tabular analysis was made for arriving at the results. The information was collected on sources of fish, problem of fishing or trading, daily retail price and number of family members, sex composition, types of fishing gears and crafts used during fishing , age structure, income pattern, educational status and sanitation, sources of fund and technical appraisal.

Result and Discussion

The survey was carried out during the study period among the fishermen in Jhenidah south western part of Bangladesh. The results of different parameter were noted below. The results showed the resembles with many workers like Dey etal 2014, Alam S (2003) , Hasan J and Mahmud SM (2002) , Ahmed N (1999) Apu etal 1997,Ahmed NU (1996), According to the findings, male members are slightly ahead than female in numbers.

1. Sex composition

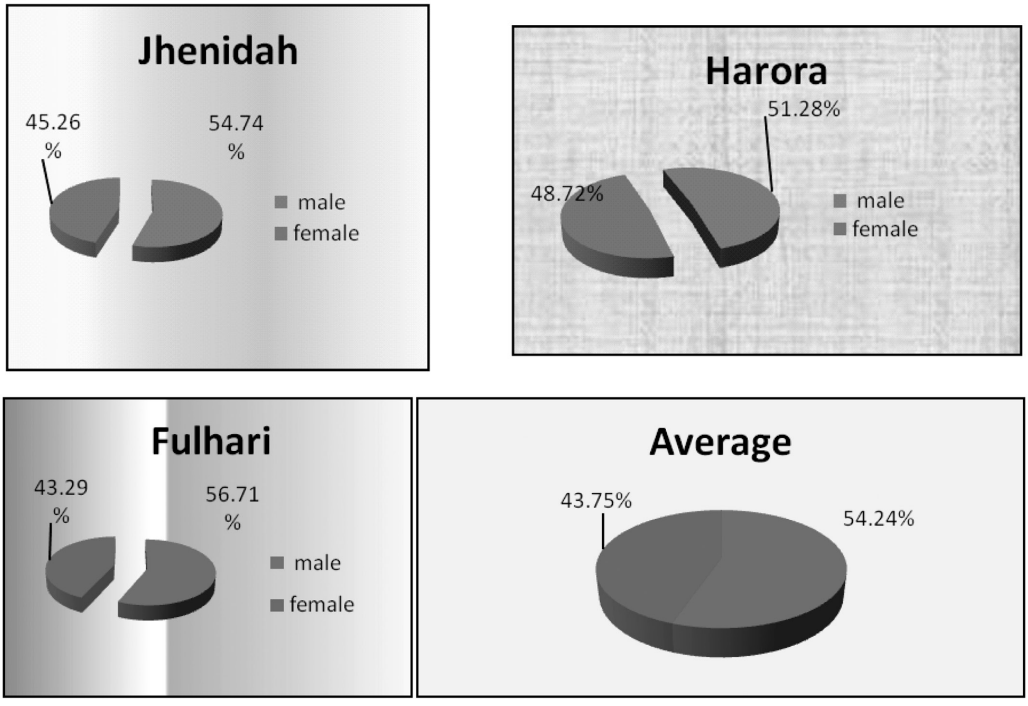

Figure- Graphical presentation of sex composition.

Occupation from the study it was estimated that fishermen engaged in full time fishing activities covering 18.23% to 25.68% in different investigation sites . 32.68% to 34.67% fishermen involved in part time fishing and 33.12% to 38.32% fishermen shifting their occupation as day labourer and rest of the fishermen took their profession as other activities apart from fishing.

Annual income was divided into Different catagories which ware depicted in. majority of the fishermen belong to the income category 10000 to 30000 BDT

Esucation Status

Major percentage of the population received no education followed by primary and secondary level and rest of the fishers received SSC or above

Income Majority of the respondents were under the monthly income level of 3000-6000 taka.

Sanitation it was revealed that sanitation is improving by adopting special sanitation programme by the government and non government organization.only few used earthen latrines ranging 9% to 11%. Financial support it was investigated that that 28.8% to 33.5%fishers did not get any financial support but 26.8% to 30.4% received loan from mahajon.

Occupation Status : Majoty of ftshers engaged in part time activities followed by fulltime ,business and others.

Drinking Water Facilities : it was revealed from the study that majority of the population used shard tubewel for drinking water.12.2% to 15.9% of the fishermen in different survey areas have used their own tubewel for drinking water. Beside these fishermen used their sources of water from pond,canals and rivers.

Fishing Gears : fishermen used their traditional system for catching fish using different nets, traps and hooks or lines.Among nets,caste nets,gill nets and scoupnets were popular among the fishermen.

Housing Pattern : From the study it was revealed that housing condition was very poor made up of mud or mud with tin shed and bamboo.few percentages owned semi pacca or building reflecting the solvency of the fishermen.

Marital status through the survey it was estimated that married population ranging from 77.89% to 91.95% and rests were unmarried from 8.05 % to 22.11%.

Caste from the study it was estimated that most of the fishermen belong to the Hindu(87.42 to 93.21%) and rest of the fisher belong to Muslin covering a range of 3.67% to12.58%.

From the above results obtained from the study it is very clear that most of the fishers were poor and deprived of amenities Islam etal 2013,(Lack of opportunities Mahbubullah M (1986) they depend on the productivity of the water bodies for whole year but the ecology of the water bodies were degraded(DoF1996,1999,2013) due to pollution, water abstraction, unplanned deployments, use of agrochemicals and mass collection of fishes during winter as because shortage of water in the rivers.

Conclusion

From the study it was revealed that the socioeconomic condition of the riverside areas were mot satisfactory because river productivity has lost due to pollution, overfishing, flow modification, water shortage etc. they are deprived amenities in life and remain

illiterate years for years. Lack of knowledge about fishery technology hampered their life style and income levels. Government should provide support financially (Imam 1997, Rabbani and Sarkar MS,1997) and technically to improve their life standard. NGOs and civil societies have to come forward in solving this national crisis.

References

Abdullah-Bin-Farid BMS, Mondal S, Satu KA, Adhikary RK and Saha D (2013) Management and socio-economic conditions of fishermen of the Baluhar Baor, Jhenaidah, Bangladesh, Journal of Fisheries 1(1): 30-36. DOI: 10.17017/jfish.v1i1.2013.7

Ahmed N (1999) A Study on socio-economic aspects of coastal fishermen in Bangladesh, Bangladesh Journal of Zoology 24 (1-2): 20-26.

Ahmed NU (1996) Report of the fishermen's socio-economic survey, Fisheries survey and monitoring program, Department of fisheries, Tangail, 4 pp.

Alam S (2003) The Oxbow Lake Management and its Impact of on the Livelihood of Fisheries, A Comparative Study (A Research Report with SUPER-DFID Research Award Support), pp. 10-30.

Apu NA, Nathan D and Satter MA (1997) Establishing a common property regime in oxbow lakes in Bangladesh by ensuring long term security of Tenure and by providing incentives for cooperation between fishers, Oxbow lake project, Bangladesh. 28 pp.

Dey BK, Hossain MMM, Bappa SB, Akter S and Khondoker S (2014) Impact of diseases on fish production of baors in Jessore, Bangladesh, Journal of Fisheries 2(1): 70-75.

DoF (1996) Establishing a Common Prospering Regime, Experience of an Inland Fisheries Project in Bangladesh and Some Case Studies of Baor Fishermen.

DoF (2005) National fish fortnight compendium 2005, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, The People's Republic of Bangladesh.

DoF (2013) National fish week compendium 2013, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, The People's Republic of Bangladesh, p. 130.

Hasan J and Mahmud SM (2002) Study of the coastal fishing community of the Kalaipara village: acts and observation. A project thesis in Fisheries and Marine Resources Technology Discipline, Khulna University, Khulna, Bangladesh.

Imam A (1997) Legal entity of fishers groups necessary for security of tenure of the fishers groups in semi-closed water bodies in Bangladesh, Proceedings of ICLARM/Danida National Workshop on Policy for Sustainable Inland Fisheries Management, Dhaka, Bangladesh.

Islam MR, Hoque MN, Galib SM and Rahman MA (2013) Livelihood of the fishermen in Monirampur Upazila of Jessore district, Bangladesh, Journal of Fisheries 1(1): 37-41. DOI: 10.17017/jfish.v1i1.2013.8

Mahbubullah M (1986) Case study of polder and estuarine fisheries community in Bangladesh. In Socio-economic Study of Tropical Fishing Community in Bangladesh, A report for Food and Agricultural Organization (FAO), Rome. pp. 12-14.

Rabbani and Sarkar MS (1997) Study on the current status of the fish extraction and revenue collection from the Sundarbans Reserve Forest, A project thesis in Fisheries and Marine Resource Technology Discipline, Khulna University, Khulna, Bangladesh.

BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -2, Issue-1, 2020
pp. 220-246

Usage of ICT in Medical Libraries of Bangladesh with Special Reference to icddr,b Library: An Investigation

Authors

Md. Harun-Or-Rashid Khandaker
International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), Library and Information Services Section (LISS), Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh
Email: harunban@icddrb.org

Md. Shafiur Rahman
International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), Library and Information Services Section (LISS), Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh
Email: shafi@icddrb.org

Muhammad Hossam Haider Chowdhury
Independent University, Bangladesh (IUB), Dhaka 1229, Bangladesh
Email: mhhc@iub.edu.bd

Farzana Sultana
Bangladesh College of Physicians and Surgeons (BCPS), Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh
Email: fzana2001@yahoo.com

Dr. Md. Nazim Uddin
International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), Library and Information Services Section (LISS), Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh
Email: nazimuddin@icddrb.org

Abstract

Information and Communication Technology (ICT) plays an important role to disseminate information worldwide, particularly, when ICT connects with library systems and services. Library website is very important and significant to represent any library services to domestic users, remote users or off-campus users using ICT. In this connection, a comparative study is made based on six major medical libraries of

Bangladesh. These libraries are compared in terms of ICT facilities and use to provide library services to its users community. This study focuses the benefits of library websites. Collected data are analyzed in quantitative as well as qualitative method to explore better results. Results are shown in the form of tables and figures. This paper gives a snapshot of ICT use in medical libraries of Bangladesh.

Keywords

Information Communication Technology, Intranet, Internet, Digital library, Medical library, Bangladesh

Introduction

In Bangladesh, libraries are available throughout the country that include Public libraries, National libraries, academic libraries, and special libraries considering medical libraries are part of academic and special libraries. The information systems, both in the public and private sectors of Bangladesh, are not effective due to lack of understanding the values of libraries and information services to the authorities and therefore, inadequate allocation of financial resources by respective authorities to build modern libraries (Chowdhury, Uddin, Afroz, & Sameni, 2011) in Bangladesh. During the last two and half decades, ICT has significantly contributed to open the door to the hidden knowledge of information system in an efficient manner. In the beginning, the ICT was used in automating and developing databases of information resources in the library. The purpose of developing database is to store, preserve, retrieve, disseminate and organize different types of publications and information resources. The existing facilities of ICT have placed us in an electronic environment to help organize modern digital library as per the need of specific requirements of an organization or an individual. The application of information technology in libraries has enhanced efficiency and effectiveness in all aspects of information acquisition, preservation and dissemination. In keeping pace with the new technologies, the traditional libraries have been modernized to make these as digital libraries in terms of dissemination of information (Md. Nazim Uddin, 2012). The surveyed libraries are confined with the renowned major medical libraries are available in Dhaka. This survey was made with the structured questionnaire developed on the use of ICT in major medical libraries and accordingly, data were collected from six medical libraries.

ICT literacy is an important issue globally for the librarians and specially the library professionals of Bangladesh in responding to the change of digital scenario. Nevertheless,

apart from the International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) library, no medical library in Bangladesh has website using intranet and Content Management Software (CMS) for library services. Library websites are very significant to disseminate information locally, nationally, and internationally. A very few medical libraries from universities and research institutions are using ICT properly during digital era in Bangladesh. ICT use can expedite library services through website; i.e. Intranet and Internet are useful tools for delivery of effective library services. According to World Stats, dated June 20, 2020, in Bangladesh, 96,199,000 peoples approximately are using Internet out of total population 164,689,383 i.e. about 58.41% peoples are somehow using Internet (Internet World Stats, 2020). So, medical libraries of Bangladesh should not stay back in using ICT in this digital era.

Literature Review

An exclusive literature review has been carried out related to modern library facilities and services rendered through using ICT technology in worldwide as well as Bangladesh with a special emphasis on medical libraries. The authors found that a good number of investigations have been carried out to study the technology used in the medical libraries worldwide but a very few have been focused to explore the usage of ICT in the medical libraries of Bangladesh. Windows is the most popular OS software that is used in most of the libraries of Bangladesh. Besides, Integrated Library System (ILS) software like KOHA, Slim, and Liberty are widely used in the major academic, public and special libraries for library automation purposes. Digital Library System is a relatively new field in medical libraries of Bangladesh which has gained considerable attention in recent years. In order to manage, preserve, and disseminate digital resources, various Digital Library Software and Institutional Repository Software are practiced in the libraries of Bangladesh, most notably DSpace and Green Stone.

Mphidi & Snyman mentioned that Intranet is an effective way of sharing information and knowledge of libraries and can be used for many purposes depending on the type of libraries and it served as a repository of explicit knowledge and original documents could be placed on the Intranet, allowing the same information to be viewed by any employee. He concluded that the awareness of Intranet among the libraries of South Africa is well understood (Mphidi & Snyman, 2004).

A study titled "Computerization of Libraries in Bangladesh" was conducted by Ahmed, Munshi and Ahmed (1997). The paper investigated the initiatives of library

computerization in Bangladesh and also presented various activities taken by different organizations and institutions in the country to automate their library activities and described problems faced by the libraries (Ahmed, Munshi, & Ahmed, 1997).

Hossain and Mostofa carried out a study on "Present Status of Health Libraries in Bangladesh: a paradigm shift" in which the authors focused the present status of surveyed health libraries and the responsibilities to provide health information services for the health professionals. This paper mainly explored the current status of private health libraries in Dhaka city that are facing challenges like IT infrastructure, inadequate trained manpower, lack of managerial skills, and financial constraints (Hossain & Mostofa, 2015).

Siddike, Munshi and Sayeed (2011) pointed out in their article the adoption of ICT in university libraries in Bangladesh. Form the survey, they found some challenges in the adoption of ICT in Bangladesh according to feedback of the respondents and they recommended some suggestions to overcome the problems (Siddike, Munshi, & Sayeed, 2011).

In 2015, Uddin et al. showed in their research study that how web-based library services of icddr,b are provided to its research community. They found that icddr,b library is in the advanced level in Bangladesh for adapting modern ICT tools and technologies in order to meet the ever changing needs and expectations of its researchers. This study highlighted the e-resources usage status of icddr,b and shared the problems and prospects of developing modern library management system (M N Uddin, Rahman, Mamun, & Khandaker, 2015).

Bottazzo carried out a study exclusively on Intranet based from library perspectives. He mentioned that "Librarians could be important promoters of Intranet use in the organization as a platform for acquisition and submission of library materials, bibliographies, and news and other activities, performed by library. The Intranet is probably one of the best possibilities for librarians to start talking with other departments inside organization to build modern and effective electronic library considering Intranet a useful and efficient "tool" for submission of information" (Bottazzo, 2005).

Islam focused on digitalization initiatives of private and public universities libraries and examined different constraints of digitalization in Bangladesh in terms of IT-based infrastructural facilities, i.e. scanner, computer, printer, hardware, software, OCR, output media, access points, Internet, Intranet, and network support (Islam, 2013).

Ahmed highlighted in his study the scenario of public universities in Bangladesh in terms of library automation, IT infrastructure and training needs for implementing a networked electronic library for the universities in the country. His result showed that the public universities in the country are not well-equipped to deliver proper IT-based information services, mostly due to the absence of appropriate IT infrastructure and trained manpower and inadequate access to electronic resources. Ahmed also stated that developing countries like Bangladesh are not benefiting much from the rapid advancement of IT applications in libraries (Zabed Ahmed, 2014).

Hossain et al. explored in his study that the challenges are being faced by libraries, i.e. lack of IT infrastructure, adequately trained manpower, managerial skills among the existing manpower, short of goodwill within the institutions where the libraries serve and financial constraints along with many others. Finally, the study suggested a model for the improvement of health libraries in Bangladesh (Hossain & Mostofa, 2015).

Methodology

This study is prepared based on survey method with the structured questionnaire and interview with librarians of six major medical libraries in Bangladesh. Quantitative and qualitative data were obtained from the Libraries in 2017. The questionnaire was used for collection of data regarding the use of technology, library web pages depending on Intranet and Internet, and software use in the libraries. A well-structured questionnaire was administered to the scientists, doctors, students, researchers and faculty members of 6 Medical Libraries to get required data. A total of 380 questionnaires were distributed, out of which 296 questionnaires were returned with a response rate of 77.89%. Aside this, face-to-face interview through a structured questionnaire with the heads of selected medical libraries were also carried out for collecting library data. The websites of those libraries were also reviewed. These libraries are selected as they are operated by reputed medical university, college, and research institutions. Google, Google Scholar, Scopus, Emerald search engines and databases have been utilized for literature review. This study attempted to look for the present situation of technology use in medical libraries through quantitative and qualitative method. Microsoft Excel is used for data analysis and creation the tables and figures in order to explore the results. EndnoteX9 software is also used for managing the references used in this study.

Objectives of the Study

The two main objectives of the study are mentioned below:

1. To discover the technology use in medical libraries of Bangladesh particularly focused on the use of ICT facilities and library websites based on Intranet and Internet in organizing library resources and services.
2. To explore the existing library resources and services use in the medical libraries of Bangladesh in order to draw the attention of the respective authorities for developing required ICT infrastructure in libraries.

Library Website and Intranet : an Overview

Library Website

Library website is an important tool for disseminating/sharing e-resources using Internet and Intranet in the recent digital era. Library professionals should organize their digital library using ICT facilities and web pages to provide services to users and allowing users' access to e-resources and databases. As a matter of fact, use of modern technologies can help to organize the library web sites.

Intranet

An Intranet may be defined as an internal Internet that uses Internet protocols such as TCP/IP, HTTP, HTML (Hyper Text Markup Language) SMTP (Small Message Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), and AAA (Access, Authorization, and Authentication) which can be adopted for a library or its parent body (Boss, 2018). If a library has web page using Intranet, users can get access on-campus but for getting off-campus access, Virtual Private Network (VPN) is required to provide the access facilities based on login. VPN services ensure seamless access to e-resources to the academic community at off-campus departments and study centre libraries. Method of sharing e-resources through VPN and IP-based access will be cost-effective and convenience if any library has its own good IT infrastructure, in-house manpower and have experiences in managing open source software (Kumar & K.C., 2018).

Benefits of Intranet from Library Point of View

"The library or information centre has to take all advantages of the Intranet for the promotion of its services and to include itself into the structure of the Intranet as a digital library, although it partially functions as a traditional library (hybrid library model).

Technology enables integration of traditional, reference and information services, which should become a part of a digital library, included into the information system of the parent organization and managed by a dynamic research-information specialist" (Bottazzo, 2005).

The main and significant benefits of using Intranet are usually sharing information resources of library among the users and researchers in a cost-effective way. Mphidi & Snyman mentioned some benefits of using Intranet that are given below (Mphidi & Snyman, 2004) :

- *to obtain information about other library sections,*
- *to get basic information such as a roster for weekends, conferences announcements, marketing news and training material,*
- *to gain access to databases via Intranet,*
- *to get the latest news about staff,*
- *to download cataloguing and classification manuals,*
- *to clarify some policies, e.g. acquisitions policy, and*
- *to download application forms for conference attendance.*

Medical Libraries of Bangladesh in Digital Era

Medical library is a type of special library maintained by a university medical school, hospital, medical research institute, public health agency, or medical association to serve the information needs of students, researchers, and practitioners in health sciences discipline (medicine, nursing, dentistry, pharmacy, etc.), with collections that include print and online resources related to medicine and allied health (Reitz, 2018). Medical university and Colleges are maintaining library web pages integrated with the homepage of the respective institutions. It is observed that a separate library webpage is not available for sharing e-resources and library services in our country. Apart from icddr,b library, no medical libraries of university and colleges are maintaining library website using Intranet according to our survey. Most of the libraries have Internet access and the users are using e-resources. But overall scenario of the ICT infrastructure of medical colleges and university libraries in Bangladesh are not satisfactory at all.

At present in Bangladesh, a good number of medical libraries have been registered to Research4Life program. Research4Life is the collective name of the five programmes – Hinari, AGORA, OARE, ARDI and GOALI that provides access to e-resources to developing countries with free or low cost. More than 8,700 institutions in more

than 115 low-and middle-income countries registered globally as of January 2019 (Research4Life, 2019). Registered libraries of medical colleges and university, public and private universities, and medical research institutions in Bangladesh are now using e-resources of Research4Life.

Program for Enhancement of Research Information (PERI) was a flagship program of International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP) from 2001 to 2013 for strengthening research and knowledge systems in developing countries (INASP, 2018). An initiative was taken from Bangladesh Academy of Sciences (BAS) in association with the INASP making a consortium known as Bangladesh-INASP-PERI Consortium (BIPC) for accessing large number of journals from world renowned publishers to the Bangladeshi stakeholders and more than 40 organizations and institutions registered themselves in this consortium (BAS, 2018). Now, this consortium BIPC is renamed as Library Consortium of Bangladesh (LiCoB) and running in association with the BAS that includes accessing e-resources of 29 renowned publishers.

Furthermore, University Grants Commission (UGC) is running UGC Digital Library (UDL) from June 2012 with an aim to subscribe electronic resources for the member institutions at lower rates and as of Oct 2018. Ninety members were registered in this consortium for getting access to scholarly writings (UGC, 2018). From this initiative, members of universities'/institutions' libraries are getting online access to resources of international renowned publishers.

In addition, Bangladesh Journals OnLine (BanglaJOL) is an another initiative regarding open access journals. BanglaJOL is an online database of Bangladeshi journals (www.banglajol.info) that offers accessing major Bangladeshi academic journals. This program is supported by INASP which was initiated in June 2007 and officially launched in September 2007 (BanglaJOL, 2018).

Short Profile of Surveyed Medical Libraries

icddr,b Library

It was established in 1962 and now the name of the icddr,b library is Library and Information Services Section (LISS). The icddr,b library has grown over the years to be one of the best medical libraries in the region. The library has rich collections, particularly; a broad range collection of journals that includes e-journals also has enriched the library. icddr,b library is committed to deliver world-class library and information services to meet the information needs of scientists and researchers. icddr,b

library is now using web-based commercial software Liberty for automation purpose and maintaining modern digitized library using other ICT tools like Intranet, Internet, WiFi, webpages databases, Radio-frequency Identification (RFID), cyber corner, and Enterprise Resource Planning (ERP) software system with the help of IT department. At present, Joomla (CMS) is being used for developing library webpage through Intranet.

The library Intranet URL is (**http://shetu.icddrb.org/index.php?option=com_content&view=article &id= 82&Itemid=541**) captured in figure 1 mentioned below.

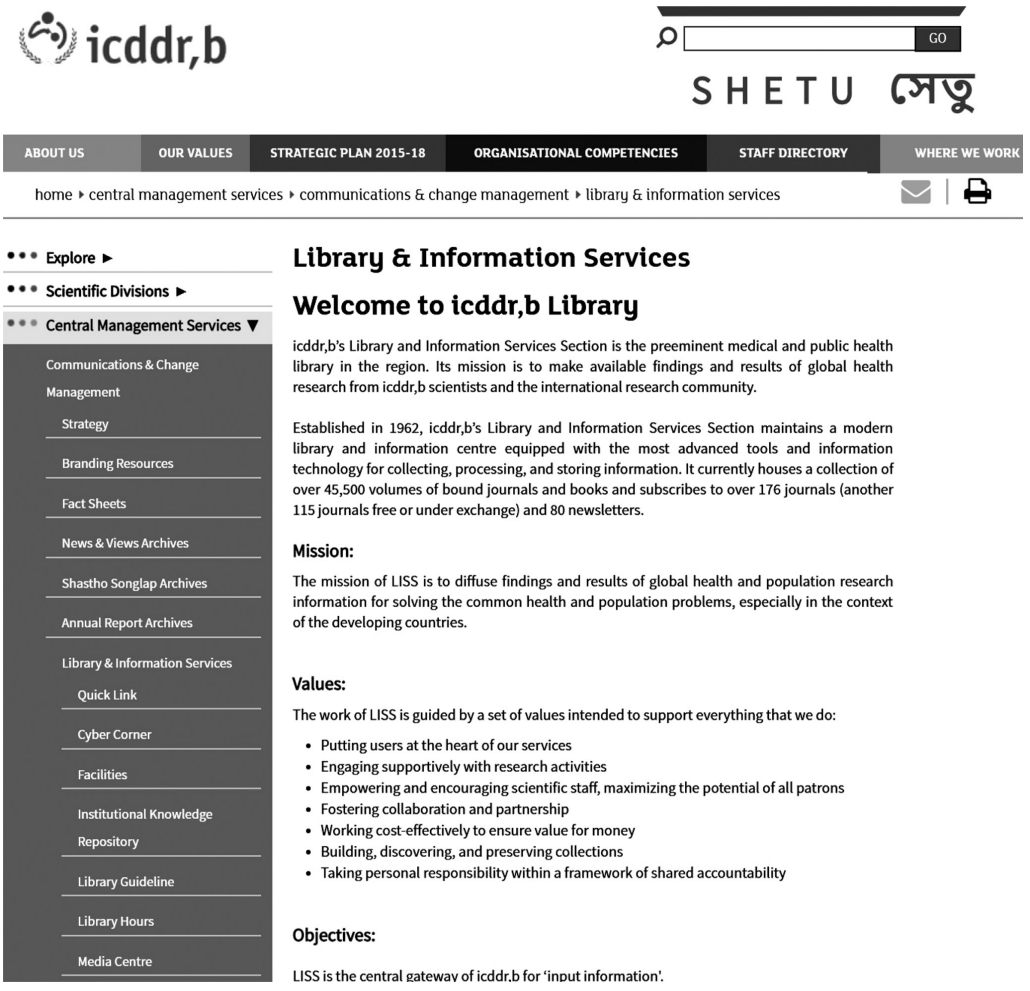

Figure 1 : icddr,b library website on the Intranet

In Bangladesh, the first Institutional Repository (IR) is established by icddr,b Library in 2005 by using Dspace software—a digital repository system (Chowdhury et al., 2011). Finally, Institutional Repository of icddr,b is renamed as Institutional Knowledge Repository (IKR) (**http://dspace.icddrb.org/jspui/**). Icddr,b library is a registered member of Research4Life programme, Library Consortium of Bangladesh (LiCoB), UGC Digital Library (UDL), and subscriber of Web of Science, Journal Citation Reports, Ulrichsweb, JSTOR, UpToDate, ProQuest, EndNote, and iThenticate. From icddr,b domain, all these resources are accessible through library web pages available on the Intranet. Besides, library web page on the Intranet, icddr,b IT department is maintaining various operations known as Suchona – enterprise resources planning for requisitions, human resources management, accounting, staffs information, and leave management; Sheba – Hospital Management System; Meeting Room Booking System (MRBS); Mail and Laundry System (MLS); Integrated Management System (ICMS); Laboratory Information Management System (LIMS), Kronos (time management system), and many more systems for running all sort of activities smoothly and efficiently (icddrb, 2018b).

icddr,b library continues resource sharing programmes with Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU), National Health Library and Documentation Centre (NHLDC), Bangladesh College of Physicians & Surgeons (BCPS), East West University (EWU), and Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation of Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders (BIRDEM) libraries.

Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) Central Library

In 1965, it is established as Institute of Postgraduate Medical Research (IPGMR) and afterward, in the year 1998 it is renamed as BSMMU through an Act by National Parliament of Bangladesh. The central library has space of 22,000 sq ft. and has capacity of 750 users at a time. Twelve officers and seventeen staffs are working at three shifts in the library. The library has notable digital collection of books and journals along with printed copies. Being a registered member of Research4Life, it has online access to electronic journals. Sixty computers are connected to the Internet for browsing purpose. In addition, library has reference section, photocopy/scan service, Liberation War Corner, Selective Dissemination of Information (SDI) service, and Audio-Visual Section. It is a depository library of the World Health Organization (WHO) with more than 1000 copies of publications. The library is automated by System of Library and Information Management (SLIM) software. Institutional Repository (IR) and Intranet based services

are not available at this moment in BSMMU Library (BSMMU, 2018). The library web address is **(http://www.bsmmu.edu.bd/?page=menu&content=139020395538)** and it is integrated with the homepage of BSMMU **(http://www.bsmmu.edu.bd)**. BSMMU library has collaboration programme with icddr,b.

BCPS Library

BCPS Library is established in 1972. The library looks wonderful and being a registered member of Research4Life and LiCoB, it has online access to electronic journals. Library provides the services like information retrieval service, electronic library service, Medline service, reference and bibliographic service, and reading room facilities with individual carrel for each physician that considers one of the important library facilities at BCPS library. This library has seven computers connected to the internet with radio-link and equipped with auto access control system. It has a good collection of printed reading materials (BCPS, 2018). Institutional Repository (IR) and library automation are planned to build at BCPS library. The library web address is **(https://www.bcpsbd.org/library.htm)** and it is integrated with the homepage of BCPS **(https://www.bcpsbd.org/index.php).** BCPS library has collaboration with icddr,b library.

National Health Library and Documentation Centre (NHLDC) Library

It is established in 1974 with the financial assistance of World Health Organization (WHO). Library organizes various training progrmmes for librarians, physicians, and teachers. Librarian prepares national bibliography on health science publications and publication of a directory of health science libraries. Library has 34 staffs and floor space of 10,000 sq. ft. The library equipped with 50 PCs and 10 Laptops (connected to Internet), one Tab (for collecting users' information), five scanners, three digital cameras, three digital photocopiers, five printers, five routers, and a document camera. It has a good collection of printed reading materials. The web address of the library is **www.nhldc.gov.bd** but it shows "server not found" on the Internet. Library is partially automated by PHP my Library (not in use) and now using WINISIS software. Library has digital database contained published thesis and dissertation from all medical colleges of Bangladesh. Being a registered member of Research4Life, this library has online access to electronic journals. But the Library doesn't have any institutional repository and Intranet based service. But NHLDC maintains a unique resource sharing programme with icddr,b Library under collaboration in Bangladesh, which considers an excellent and only resource sharing programme in Bangladesh.

DMC Library

It is established in July 1946 during the British colonial rule. This government medical college played a vital role for medical education for under graduate program. DMC library has collection of printed reading materials. Textbook based DMC library basically provides services for the students of under graduate program. Though this library big in size, it has only a computer with Internet access. Library is running in manual process for providing all types of services and it is in planning phase for automation. The library web page is available in the medical college homepage **(http://www.dmc.gov.bd)** through a library tab but that link is not displaying any information of library (DMC, 2018). They do not have IR and Intranet based service.

Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation for Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders (BIRDEM) Library

The library is established in 1986 and it has a good collection of printed reading materials and provides various services to students and teachers. The library floor space is 52,00 sq. ft. with 96 seating capacity, 2278 library members, and 12 staffs. Library has been using Internet from 2001. Average users of Internet are 12 connected to Internet through eight Personal Computers. Library has photocopy services, guiding service, SDI services, on-line literature Search, and lending services. Being a registered member of Research4Life and LiCoB, it has online access to electronic journals. In the 2018, the library installed Senayan Library Management System (SLiMS)—a web based free open source software for their library management. They exported 3020 data from WINISIS database to SLiMS. This library database is not yet available on the Internet. The library webpage **(http://birdembd.org/birdem-library)** is integrated with the organization's (BIRDEM General Hospital) homepage **(http://birdembd.org/).** Web page of the library is now in under construction and they organize their library and information system in a new way (BIRDEM, 2018). The library has no IR and Intranet based service.

Findings and Analysis of Surveyed Medical Libraries

The six medical libraries are using ICT and we examined the ICT in terms of application of IT, security system, number of PCs, communication technologies, use of Internet and Intranet, use of automation software, digitalization equipment, and capability of libraries accessing online e-resources. Data are collected through questionnaire and informal interview. Out of six surveyed libraries, icddr,b is the only one international organization, i.e. 17%, three are government organizations (DMC, BCPS, NHLDC), i.e. 50%, and two are autonomous (BIRDEM AND BSMMU), bodies i.e. 33%.

Categories of Library Users

From the Figure 2, we found that teachers, students, doctors, and researchers (100%), scientists (83%), and staffs (67%) are using these six libraries.

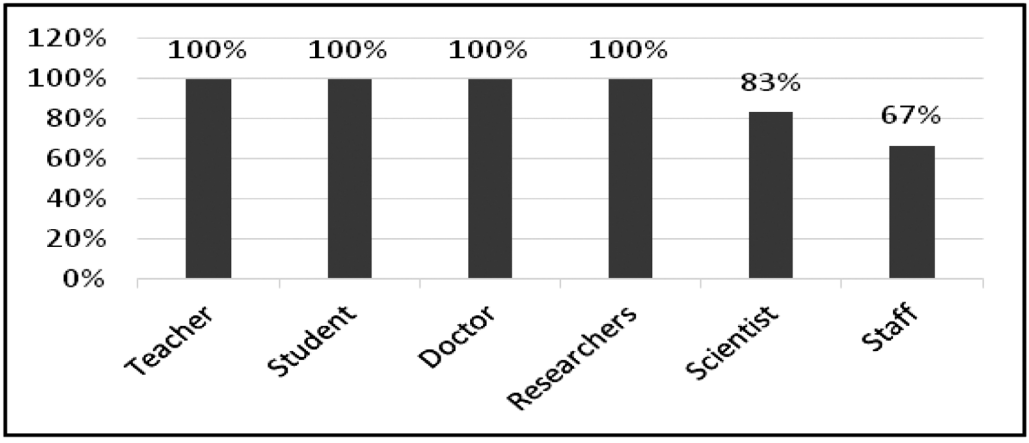

Figure 2: Categories of users in the six medical libraries

Average Number of Library Users

The Figure 3 shows that highest members are found in the BCPS library and the lowest are in the DMC Library. Average highest users of the BSMMU Central Library are 50% and lowest are less than 1% in the BIRDEM Library.

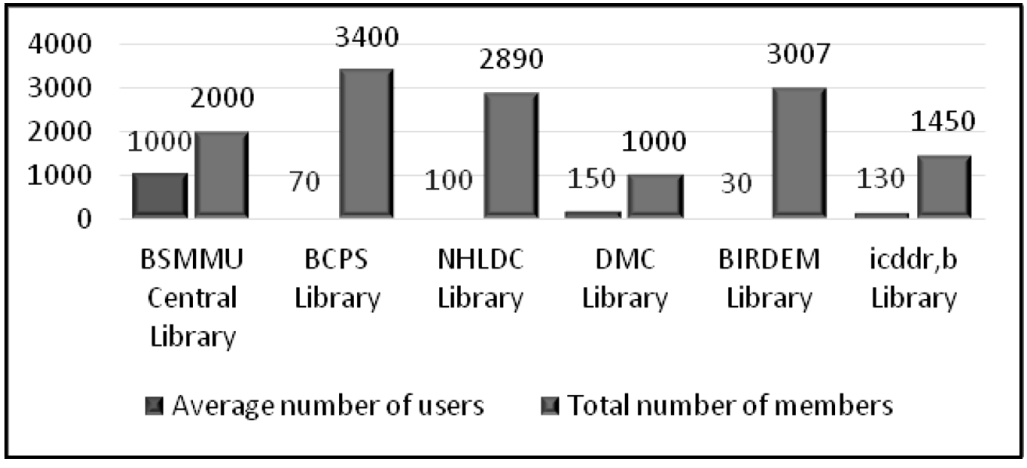

Figure 3: Library member and its average users

Library Print Resources

Table 1 depicts the scenario of libraries collections like books, thesis, dissertations, loose journals, and bound journals etc. Three libraries have audio-visual materials and interestingly atlases, maps, microfilms, and microfiches are not available in these six libraries.

Table 1: Library resources of six medical libraries

Library Resources	BSMMU Central Library	BCPS Library	NHLDC Library	DMC Library	BIRDEM Library	icddr,b Library
Books	26867	5000	18300	33557	7759	19450
Thesis/Dissertations	3537	5500	0	1600	305	350
Report	0	0	0	0	0	1905
Loose Journals	2353		60	500	21	463
Magazines	2333	0	5	0	0	7
Bound Journals/ Magazines	4630	2500	14500	0	2865	29200
Audio-Visual materials	800	2000	0	0	0	450
Atlases	0	0	0	0	0	0
Maps	0	0	0	0	0	0
Microfilms	0	0	0	0	0	0
Microfiches	0	0	0	0	0	0
News clippings	690	0	0	0	0	0

ICT and Automation Facilities

Table 2 is arranged chronologically on the basis of ICT inception. icddr,b Library is started to use ICT in 1985 and DMC Library has no data. Automation of four libraries are done partially, but icddr,b Library is fully automated. Commercial, Open Source Software, and in-house developed software are used in these libraries.

Table 2: ICT and automation Facilities

Name of Libraries	ICT and automation Facilities	Year of ICT inception	Status of Automation	Type of Automation Soft	Software for Integrated Library System
icddr,b Library	yes	1985	Full	Commercial & Open Source Software	Liberty, Dspace, RFID
BIRDEM Library	yes	1991	Partial	Open Source Software	Winisis
NHLDC Library	yes	2003	Partial	Open Source Software	PHP my Lilbrary, Winisis
BCPS Library	yes	2004	Partial	In-house developed	
BSMMU Central Library	yes	2010	Partial	Open Source Software	KOHA, Dspace
DMC Library	No	No	No	No	No

Computers Connected to the Internet

BSMMU Central Library has 80 PCs (highest) i.e. 51% and DMC Library have one PC (lowest) i.e. 1% shown in Figure 4. NHLDC Library has 25 PCs i.e. 22% followed by icddr,b library 27 PCs i.e. 17%.

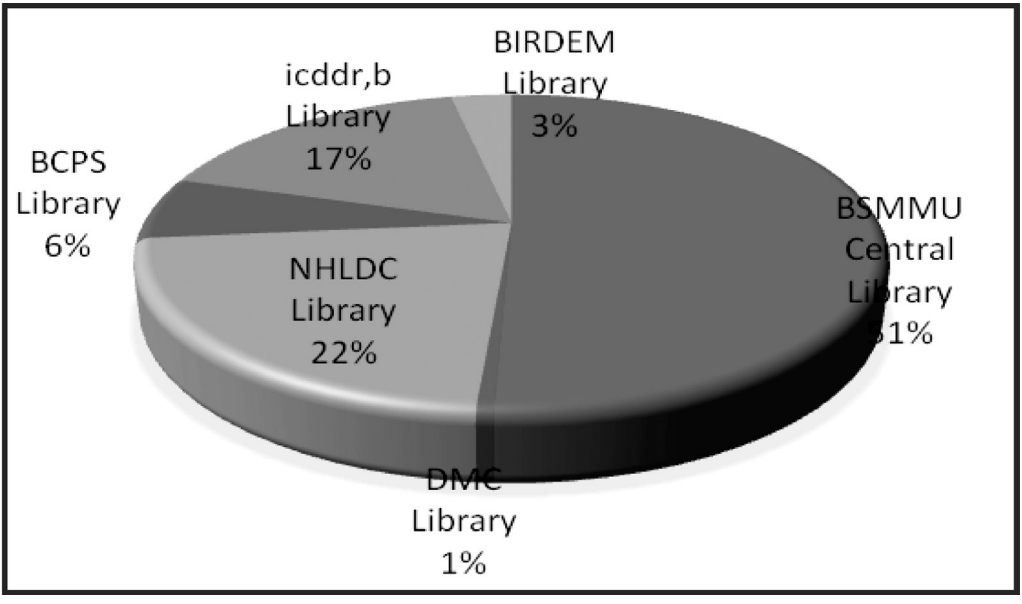

Figure 4 : Number of computers connected to the Internet

Average Users of the Internet

Highest number of average users of Internet are 370 i.e. 80% at BSMMU Central Library and lowest users are 5 i.e. 1% at BCPS Library shown in Figure 5. icddr,b Library has average number of users 60 i.e. 13% and BIRDEM Library average users are 12 i.e. 3%.

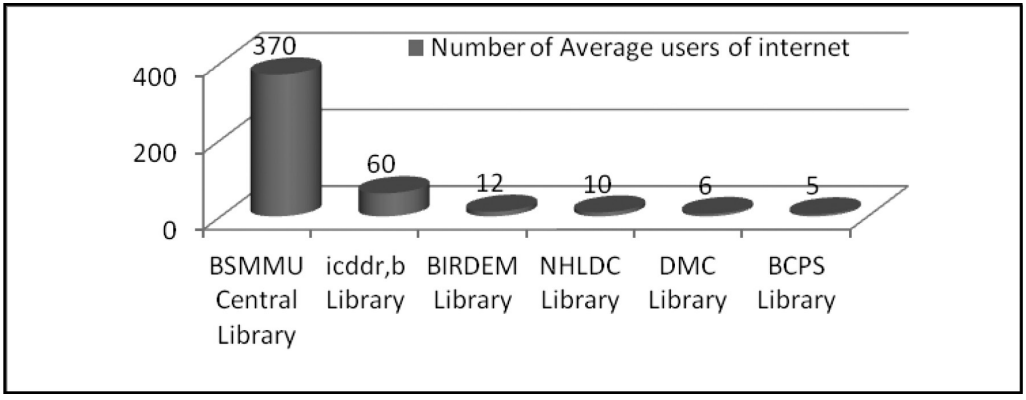

Figure 5: Number of average users of the Internet

Cost of the Internet Use and Connectivity

The Internet connectivity on the surveyed libraries are using broadband and Wi-Fi but icddr,b library is using LAN and Wi-Fi shown in Table 3. No charge for browsing Internet in three libraries i.e. 50% and charge is imposed by other three libraries i.e. 50%.

Table 3 : Internet Connectivity and Cost of Internet use

University/Institution	Charge of Internet browsing	Internet Connectivity
BSMMU Central Library	No	Broadband, Wifi
DMC Library	No	wifi
NHLDC Library	Yes	Broadband, Wifi
BCPS Library	Yes	Broadband, Wifi
icddr,b Library	No	LAN, Wifi
BIRDEM Library	Yes	Broadband, Wifi

Distribution of Browsing Software

Browsing software Opera is found lowest i.e. 33.3% and Firefox is highest i.e. 100% using in these libraries shown in Figure 6. Netscape Navigator and Netscape Gold are not in use.

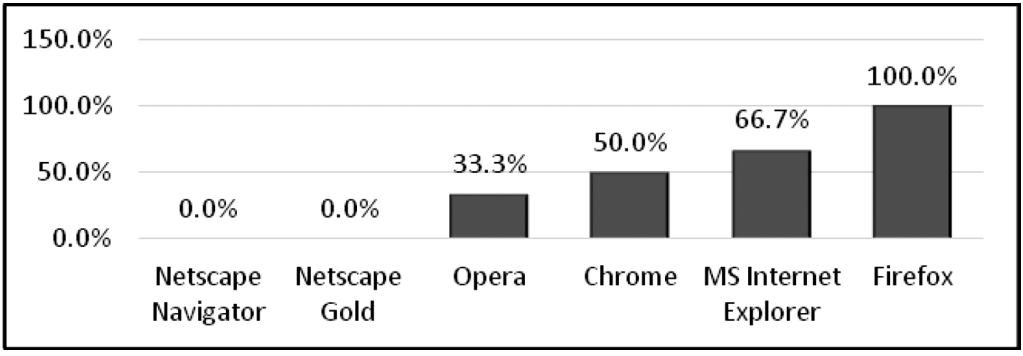

Figure 6: Distribution of browsing software in the six medical libraries.

Distribution of Search Engine

Medical libraries are using five search engines shown in the figure 7. Google search engine is used 100% and AltaVista and Lycos are less i.e. 17%.

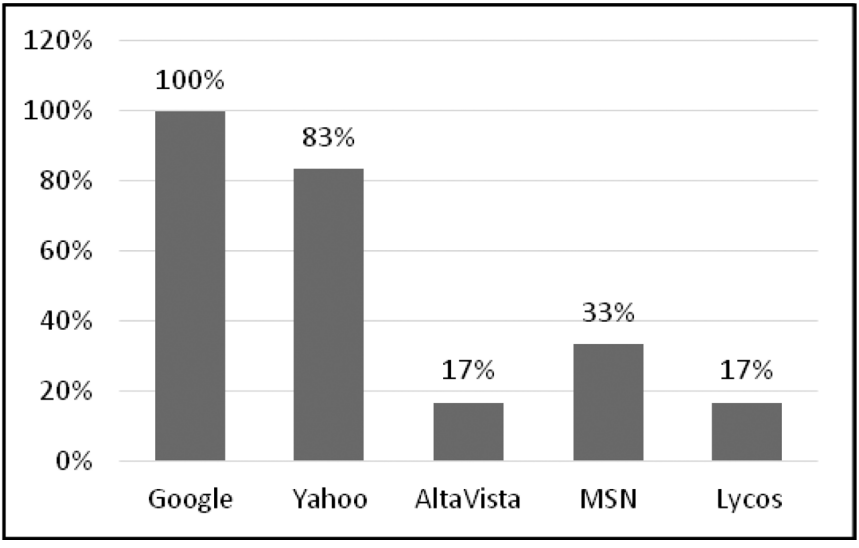

Figure 7: Distribution of search engine in the six medical libraries.

Availability of Library Website on the Internet and its Contents

In the Table 4, (✓) represent the present and (–) represent the absent of the website and web contents on the Internet. Except DMC library, every library has website and NHLDC Library website has found inactive. General information of libraries is incorporated on their website. DMC Library is absent in all aspect. icddr,b Library website provides only general information.

Table 4 : Library website and web contents on the Internet

Website and Web Contents	BSMMU Central Library	BCPS Library	NHLDC Library	DMC Library	BIRDEM Library	icddr,b Library
Library Website	√	√	√	–	√	√
General information on the library, Staff, contact numbers, opening hours, services, collections, rules and regulation	√	√	√	–	√	√
Web OPAC	–	–	–	–	–	–
Access to -book & e-journals	√	–	–	–	–	–
Access to commercial online databases	–	–	–	–	–	–
Access to open Access database	√	–	–	–	–	√
Link to Institutional Repository	√	–	–	–	–	√
New book list	–	√	–	–	–	–
FAQ	–	–	–	–	–	–
Suggestion Page	–	–	–	–	–	–
Feedback & comments	–	–	–	–	–	–
Others	–	–	–	–	–	√

Availability of Library Website on the Intranet and its Contents

In the Table 5, (✓) represent the present and (–) represent the absent of the website and web contents on the intranet. Only icddr,b library has website on the intranet **(http://shetu.icddrb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=541)** and all library resources are incorporated here and not accessible from outside of the organization.

Table 5: Library website and web contents on the Intranet

Website and Web Contents	BSMMU Central Library	BCPS Library	NHLDC Library	DMC Library	BIRDEM Library	icddr,b Library
Library Website	–	–	–	–	–	√
General information on the library, Staff, contact numbers, opening hours, services, collections, rules and regulation	–	–	–	–	–	√
Web OPAC	–	–	–	–	–	√
Access to -book & e-journals	–	–	–	–	–	√
Access to commercial online databases	–	–	–	–	–	√
Access to open Access database	–	–	–	–	–	√
Link to Institutional Repository	–	–	–	–	–	√
New book list	–	–	–	–	–	√
FAQ	–	–	–	–	–	√
Suggestion Page	–	–	–	–	–	–
Feedback & comments	–	–	–	–	–	–
Others	–	–	–	–	–	√

Availability of Institutional Repository

IKR (**http://dspace.icddrb.org/jspui/)** i.e. IR is only available in icddr,b library used for preservation of scholarly materials in digital format shown in Table 6. Other five libraries do not have IR.

Table 6: Visibility of Institutional Repository (IR).

University/Institution	Yes/No	Types of Items in IR
BSMMU Central Library	No	No
BCPS Library	No	No
NHLDC Library	No	No

DMC Library	No	No
BIRDEM Library	No	No
icddr,b Library	Yes	Capture and preserve research and related contents and to make it available online.

Uploaded Documents on the IKR

Uploaded digital documents on the IKR from icddr,b library are shown in the Figure 8. In the twenty one communities, highest uploaded documents are 5479 (icddr,b external publications) and the lowest is 0 (non-communicable disease).

Figure 8: Communities-wise uploaded documents on the IKR of icddr,b Library

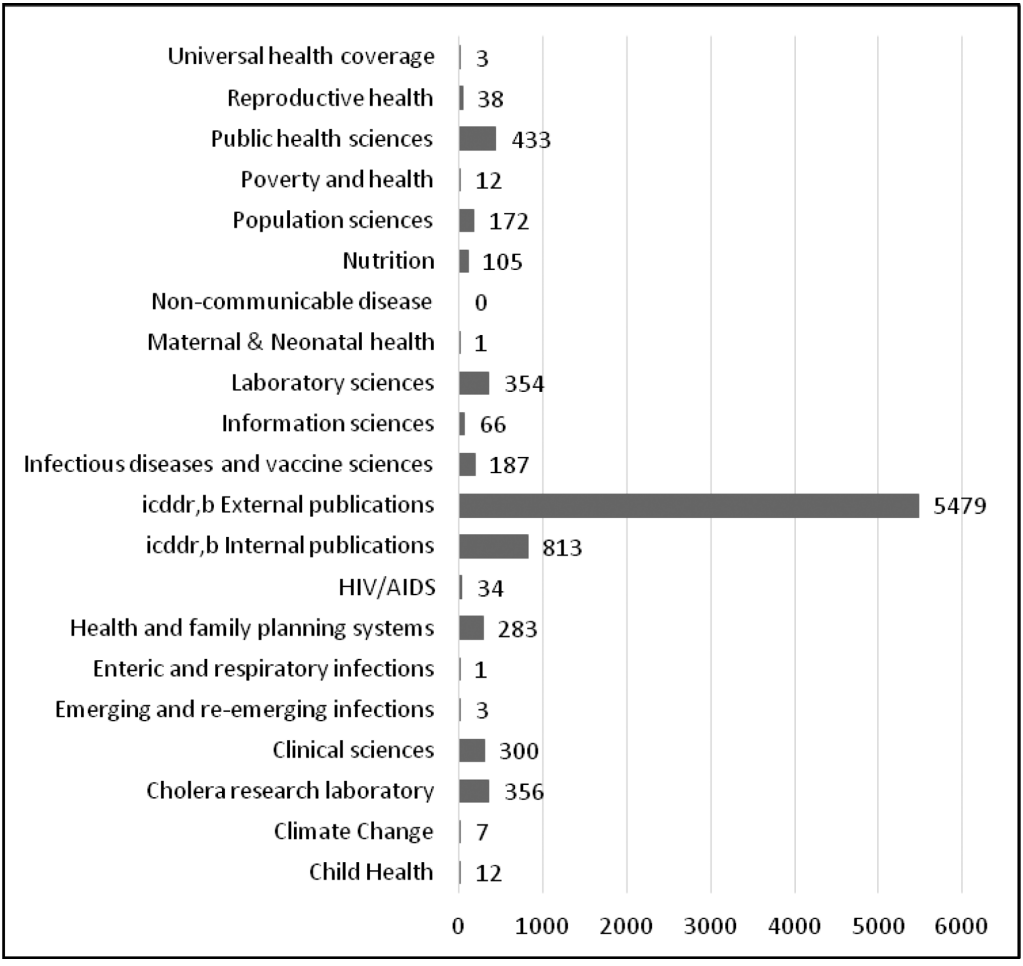

Available Digital/Web based library services

Eighteen web-based library services are taken in account that shows in the Table 7. Except the icddr,b Library, OPAC, Web OPAC, online renewal services, IR, online SDI services, and online reservation services are not offered by the other libraries. Internet services are common and distance learning service is provided by the BIRDEM library only.

Table 7: Digital/Web based library services available among the six medical libraries

Digital/Web based library services	BSMMU Central Library	BCPS Library	NHLDC Library	DMC Library	BIRDEM Library	icddr,b Library
OPAC	–	–	–	–	–	√
Web OPAC	–	–	–	–	–	√
Online renewal services	–	–	–	–	–	√
IR/Digital Repository services	–	–	–	–	–	√
Online SDI services	–	–	–	–	–	√
Online reservation	–	–	–	–	–	√
Online reference query	–	–	–	–	√	√
Web 2.0	–	–	–	–	–	√
Electronic document delivery	–	√	–	–	√	√
Mobile based services	–	–	–	–	–	√
Remote access services	–	–	–	–	–	√
RFID based services	√	–	–	–	–	√
Wi-Fi services	√	√	√	–	√	√
Virtual reference service	–	–	–	–	–	√
Distance learning services	–	–	–	–	√	–

Internet Services	√	√	√	√	√	√
E-bulletin board service	–	–	–	–	–	√
E-indexing and abstracting service	–	–	–	–	–	√

Discussions

Nevertheless, apart from the icddr,b library, no medical libraries in Bangladesh have websites on Intranet to provide library services. Among these six libraries, DMC library is found poor and icddr,b library is in strong position in terms of using technology in the perspective of Bangladesh. Rest of four libraries are found moderately equal in using technology for managing and disseminating library resources and services. DMC library has no web page and maintaining traditional process for library services but they are planning for automation. Except the icddr,b library, rest of the five medical libraries have no IR and Intranet based library services. In the movement toward digital era, icddr,b library is the pioneer and still ahead in the medical sector libraries in Bangladesh. A study was conducted by icddr,b library on the **"Use and Impact of HINARI: An Observation in Bangladesh with Special Reference to icddr,b"** where HINARI shows a very effective tool for providing health information services at free of cost. It may be noted that Hinari is one of the platforms of Research4Life Programme developed by United Nations (UN) and maintained by World Health Organization (WHO). We found that icddr,b library has the highest number of users of HINARI e-resources in Bangladesh. It works as catalyst to increase scientific publications of icddr,b and Hinari acts as lifeblood for strengthening research activities at cddr,b. Even the scientific community of icddr,b cannot imagine the research work could be done without Hinari (Md. Nazim Uddin et al., 2017). Besides, icddr,b Library Head guides and provides his leadership and experiences to establish a modern digital library of Bangladesh Medical Research Council (BMRC) located in Dhaka. icddr,b Library Head acts as a Convener of the Feasibility Study Committee of the project titled "Establishment of Digital Library, Online Library System and Data Archiving System" (Ministry of Health and Family Welfare, 2019). In addition to that icddr,b Library Head plays some vital role in reshaping the library of BCPS, subscription to Biological Abstracts of Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre (BANSDOC), establishment of Library Cooperation and networking with NHLDC, provide assistance to academic activities with the Department of Information Science and Library Management under

the University of Rajshahi, Noakhali Science and Technology University (NSTU) and the University of Dhaka, and continued efforts has been made to gear up the activities of LiCoB.

The data exposed from this study that the overall scenario of ICT of the surveyed medical libraries excluding icddr,b library are not in satisfactory level. So, it is assuming that the ICT scenario of other medical libraries is not in well advanced level.

Study Limitations

This study is limited to only six major medical libraries in Bangladesh. Other medical libraries were not included due to time and resource constraints. Sufficient literatures on technology/ICT use in medical libraries in Bangladesh are not available. In data collection, all the factors related to technology or ICT use are not considered for this study because existing website of medical libraries in Bangladesh are not adequately designed and well displayed with contents.

Challenges

The main challenges are making aware the library professionals of the medical libraries of Bangladesh about the use of ICT in libraries, library website using Intranet and related technical know-how. Dissemination of library print and e-resources are possible to publish cost-effectively using library web pages on the Intranet which will be totally private network. Medical librarians and their authorities have to understand the benefits of using library Intranet site. Based on this study, the medical libraries and the library professionals are facing following challenges:

- Inadequate ICT facilities and infrastructure
- Lack of qualified ICT knowledgeable library staff
- Budget constraints in terms of developing Intranet/Internet
- Lack of adequate ICT training for library staff
- Building a library automation system for their library (open source or commercial software)
- Negative attitude of higher authorities for modernization of libraries
- Poor attitude of library professionals regarding technological change
- Internet connectivity and bandwidth
- Lack of knowledge of digitalization and modern digital devices

- Design a standard library website
- Lack of standardization of library software
- Sharing of library e-resources through library Internet/Intranet site
- Developing Institutional Repository

Recommendations

The overall scenario of ICT infrastructure of the surveyed medical libraries of Bangladesh is not in a good condition due to financial constraints apart from icddr,b library and BSMMU library. Whatever the resources, a medical library information should be disseminated properly using ICT facilities. Budgetary constraint is the main barrier for all medical libraries. Authorities of the medical universities and medical colleges need to understand the matter. Adequate fund is required in the library for the development of ICT to provide Intranet or Internet based library services. To increase the knowledge on ICT, library professionals are needed to participate in various training programmes and conferences on the use and application of technologies in medical libraries. Mental attitude of the library professionals needs to be changed from their traditional trend and get rid of dependency on IT professionals in near future. Library professionals should have knowledge of hardware and software related to library services which are essential. Initiatives from the government bodies like Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education, Ministry of Science and Technology, and Ministry of ICT should come forward to overcome the challenges of medical libraries in Bangladesh.

Conclusion

The New England Journal of Medicine (NEJM) mentioned that:

"Medical libraries and the role of medical librarians are changing and evolving along with medicine. Medical publishing is changing, too. Roles are being transformed — and even threatened — by technology. At the same time, the 21st century avalanche of biomedical information makes medical librarians and their institutions more important than ever" (NEJM LibraryHub, 2018).

Publishing library webpage using Intranet for library management and services is cost effective and access to all e-resources can be open to users without violating copyright law as it is a private network. Many barriers like technologies adaptation, lack of fund, copyright issues, and finally, the attitude of the authorities and current medical

librarians of Bangladesh. Building awareness and training to the library professionals are essential on the use of ICT, CMS, database management, web page designing, static and dynamic web page, web server management and technical know-how. If the authorities and librarians of concern medical libraries could take initiative to organize their medical library resources using ICT and website; teachers, students, researchers, doctors, clinicians, nurses, medical technologist, and other medical professionals will be more benefited.

Acknowledgement

"The data used for this study was funded by core donors which provide unrestricted support to icddr,b for its operations and research. Current donors providing unrestricted support include: Government of the People's Republic of Bangladesh; Global Affairs Canada (GAC); Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) and the Department for International Development (UK Aid). We gratefully acknowledge these donors for their support and commitment to icddr,b's research efforts."(icddrb, 2018a).

References

Ahmed, S. M. Z., Munshi, M., & Ahmed, M. U. (1997), Computerisation of libraries in Bangladesh, *Malaysian Journal of Library and Information Science*, 37-43.

BanglaJOL. (2018), About the Site, Retrieved from https://www.banglajol.info/index.php/index/about

BAS. (2018), Bangladesh INASP-PERI Consortium, Retrieved from http://www.bas.org.bd/about/inasp-peri-consortium.html

BCPS. (2018), BCPS Library. Retrieved from https://www.bcpsbd.org/library.htm

BIRDEM. (2018), BIRDEM Library. Retrieved from http://birdembd.org/content/birdem-library

Boss, R. W. (2018), Intranets and Extranets. Retrieved from https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/258/Intranets%20and%20Extranets.pdf?sequence=93&isAllowed=y

Bottazzo, V. (2005), Intranet : A medium of internal communication and training. *Information Services & Use, 25*(2), 77-85, doi:https://doi.org/10.1108/07378830610669628

BSMMU. (2018), About library, Retrieved from http://www.bsmmu.edu.bd/?page=menu&content=139020395538

Chowdhury, M. H. H., Uddin, M. N., Afroz, H., & Sameni, A. H. (2011), Building institutional repositories in Bangladesh using DSpace: A new paradigm of scholarly communication, *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, Paper 553.

DMC. (2018), No title. Retrieved from http://www.dmc.gov.bd

Hossain, M. U., & Mostofa, S. M. (2015), Present Status of Health Libraries in Bangladesh- A Paradigm Shift, *International Journal of Library and Information Science, 4*(1), 24-37.

icddrb. (2018a), Donor Acknowledgment Policy, Retrieved from http://shetu.icddrb.org/webroot/uploads/Donor%20Acknowledgment%20Policy/Acknowledging_icddrb_donors_Sept_16_2019.pdf

icddrb. (2018b), Information Technology. Retrieved from http://shetu.icddrb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=419

INASP. (2018), Programme for Enhancement of Research Information (PERI), Retrieved from https://www.inasp.info/project/programme-enhancement-research-information-peri

Internet World Stats. (2020), Internet Usage and Population Statistics, Retrieved from https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia

Islam, S. (2013), Library Digitization in Bangladesh: A Developing Country Perspective. *Research Journal of Library Sciences, 1*(1), 2-9.

Kumar, V. V., & K.C., A. M. (2018), E-resources sharing through Linux based Virtual Private Network (VPN): a case study, *65*(3), 156-159.

Ministry of Health and Family Welfare. (2019), *Development Project Proposal of Establishment of Digital Library, Online Library System and Data Archiving System*, Dhaka: Ministry of Health and Family Welfare

Mphidi, H., & Snyman, R. (2004), The utilisation of an intranet as a knowledge management tool in academic libraries, *The Electronic Library, 22*(5), 393-400, doi:https://doi.org/10.1108/02640470410561901

Nemj LibraryHub. (2018), The 21st Century Medical Librarian: More Vital than Ever, Retrieved from https://libraryhub.nejm.org/article-hub/2017/06/21st-century-medical-librarian-vital-ever/

Reitz, J. M. (2018), Online Dictionary for Library and Information Science, Retrieved from https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx

Research4Life. (2019), About Research4Life, Retrieved from https://www.research4life.org/about/

Siddike, A. K., Munshi, N., & Sayeed, A. (2011). *The adoption of information and communication technology (ICT) in the university libraries of Bangladesh: an exploratory study*. Paper presented at the International Seminar "Vision 2021: the role of libraries for building digital Bangladesh.

Uddin, M. N. (2012), *Application of Information Technology In Major University Libraries: An analytical study of Bangladesh*.

Uddin, M. N., Rahman, M. S., Khandaker, M. H.-O.-R., Mamun, M. A., Mannan, S. M., Sack, J., & Dennehy, C. (2017), Use and Impact of HINARI: An Observation in Bangladesh with Special Reference to icddr,b. *16*(01), 1750003-1750018. doi:10.1142/s0219649217500034

Uddin, M. N., Rahman, M. S., Mamun, M. A., & Khandaker, M. H. R. (2015). *Discovery to Delivery: Web-based library services of icddr,b.* Paper presented at the In: Proceedings of National Seminar on Cross-talk of Digital Resources Management: step towards Digital Bangladesh, Dhaka.

UGC. (2018), UDL Member, Retrieved from http://udl-ugc.gov.bd/udl-member

Zabed Ahmed, S. M. (2014). The use of IT-based information services: An investigation into the current status of public university libraries in Bangladesh, *Program: electronic library and information systems, 48*(2), 167-184. doi:10.1108/PROG-08-2012-0048

Highlights to be noted by the Contributors

1. The Journal

BL College Journal is a bi-lingual (Bangla & English) research journal. The half-yearly publication will accommodate papers written by the contributor (s) bearing the resultants of one's own original thoughts and works having research values and characteristics.

2. The Title and the Author

(a) There must be a title on the top of respective 'Article' which, while written in the respective language, will be precise and self-informative.

(b) The main text of the paper shall not exceed the limit of 4500 words including the abstract of 250 words. This is in exclusion of the Reference and Bibliography.

3. The Manuscript

(a) Separate sheets of A-4 size are to be used in preparation of the manuscript.

(b) Only one side of such sheets shall be used while typing the matter on it with double

space all along leaving margins of 1.5 inches on all four sides.

(c) At least one hard copy shall be submitted along with a soft copy.

(d) Bengali articles shall be typed in SutonnyMJ Font in Bijoy or Avro software.

4. The text

The paper will be an organic whole of any topic, the gradual development of which should be clear right from its demarcated introduction growing through its sections and sub-sections clearly mentioned up to the conclusion.

5. Reference

(a) The main text shall be marked with Arabic numbers in a serial order as super-script wherever there arises any case of reference.

(b) An altogether separate sheet will be used for preparation of the particulars of references furnished exactly in the very order and against the same number as has been marked on the main text.

(c) Against each particular number, the reference will be furnished in the following order : Writer's name, Title of the book in *Italics*, Place and year of publication, Page No.

6. Bibliography

(a) Author's surname followed by the name ending in a comma (,)

(b) Title of the book after the comma in *Italics* with volume and edition.

(c) Place of Publication.

(d) Year of Publication

(e) Page No.

[*Example* : Woolf, Virginia, *Mrs. Dalloway*, the University of Adelaide, Australia, 2015, Page-15]

7. Acceptance of the Paper for Publication

Each of the papers duly received will be placed for review before the experts of the respective area and the same will be accepted for publication only at their approval.

8. The undertaking

An undertaking is to be submitted by the contributor stating that the article submitted by him/her is an original and unpublished work.